হাকিকত কিতাবেভি প্রকাশনা : ৪

মিফতাহুল জান্নাহ

[Booklet for Way to Paradise]

লেখক
মুহাম্মাদ বিন কুতুব উদ্দিন বিন ইয়নিকি

সম্পাদনায়ঃ
আল- ামা হুসাইন হিলমী ইশিক (র.)

Hakîkat Kitâbevi
Darüşşefeka Cad. 53/A P.K.:35
34083 Fatih- ISTANBUL TURKEY
Tel: 90.212.523 4556–532 5843 Fax: 90.212.523 3693
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail:info@hakikatkitabevi.com

মিফতাহুল জান্নাহ কিতাবের পরিচিতি

আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণ আলাইহিস সালামকে তার বান্দাদের কাছে এজন্য পাঠিয়েছেন যাতে করে তার বান্দারা পৃথিবীতে এবং তার পরবর্তী জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, সকলে একসাথে মিলে মিশে বসবাস করে এবং বান্দা হিসেবে তাদের কর্তব্যসমূহ শিখতে পারে। এ সকল মানব শ্রেষ্ঠ নির্দিষ্ট মানুষদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের বেঁচে থাকার উপায় শিখিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের নবী। তিনি তার বিধি নিষেধের পথ প্রদর্শক পবিত্র কিতাব কুরআনে কারিম যা ২৩ বছরে তার প্রিয় নবীর উপর ফেরশতার মাধ্যমে নাযিল করেছেন। যেহেতু কুরআনে কারিম আরবি ভাষায় এবং অত্যন্ত সুক্ষ মানব মনের উপলব্ধির বাইরের বিষয়ে তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দেয় তারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হবে। ইসলামি চিন্তাবিদরা যারা আসহাবে কারিমদের কাছে শুনেছেন এই ব্যাখ্যাগুলো রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, তারা পরিস্কারভাবে সেগুলো তাফসীরের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ সকল চিন্তাবিদ আলেমদেরকে আহলে সুন্নাহর আলেম বলা হয়। পবিত্র কুরআন এবং রাসুলের হাদিসসমুহকে ব্যাখ্যাকে সহজ করার জন্য আহলে সুন্নাহর আলেমরা যে কিতাব লিখেছেন তার নাম ইলমে হাল। যারা ইসলাম ধর্মের সত্য এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদের ইলমে হাল কিতাবটি পড়া উচিত।

বইটির মূল টাইটেল জান্নাতের রাস্তার পথ প্রদর্শক [Booklet for Way to Paradise]। যা এখন আমরা মিফতাহুল জান্নাহ [MIFTAH-UL-JANNA] নামে উপস্থাপন করছি। এর অর্থ জান্নাতের চাবি। এটি লিখেছেন মুহাম্মদ বিন কুতুব উদ্দিন ইয়নিকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি ৮৮৫হিজরি/ ১৪৮০খ্রিস্টাব্দে ইস্তানবুলের এদিরনেতে মৃত্যুবরণ করেন।

বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার আব্দুল হাকিম এফেন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (১২৮১ হিঃ/ ১৮৬৫খ্রিঃ, বাশকালা ভান, ১৩৬২ হিঃ/ ১৯৪৩ খ্রিঃ আঙ্কারা, তুরস্ক) বলেছেন: “মিফাতাহুল জান্নাহ কিতাবের লেখক একজন বিখ্যাত আলেম, এটি পড়ে উপকৃত হবেন।” তারপর আমরা এই পুস্তকটি প্রকাশ করি। এই পুস্তক এবং এর ব্যাখ্যাগুলো যেগুলো বন্ধনীর মাঝে দেয়া হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যাক্তিগত লেখা এবং ব্যাখ্যা দেয়া হইনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সকল প্রকার বিভক্তি এবং দ্বিধামুক্ত রাখুন। যা

অবিশ্বাসী, লামাযহাবি, বুদ্ধিভ্রষ্ট, ইসলামের নামধারি ইসলামের শত্রুদের ফাঁদ। আমরা সবাই একত্রিত হই রাসুলুল্লাহর প্রদর্শিত একমাত্র আহলে সুন্নাহর পথে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে থাকার, একে অপরকে সাহায্য করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

[যখন কোন ব্যক্তি কোন কিছু করার চিন্তা করে, তার হৃদয়ে ধারনা আসে, এতে করে তার কাজটি করার ইচ্ছে জাগে। তার এই ইচ্ছেকে বলা হয় নিয়ত। এরপর এই ব্যক্তি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নির্দেশ করে কাজটি করার জন্য। তার এই নির্দেশকে বলা হয় কাসদ। আর এই কাজটি হওয়াকে বলা হয় কেসব।

হৃদয়ের এই কাজকে বলা হয় আখলাক। এটি ৬ প্রকার, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে তা ওহী। ওহী শুধুমাত্র নবীদের কাছে আসে। ফেরশতাদের মাধ্যমে যা আসে তার নাম ইলহাম। ইলহাম যা নবীদের এবং সহিহ মুসলিমদের কাছে আসে এবং তারা বলেন এটির নাম নসিহত। ওহী, ইলহাম এবং নাসিহত সব সময় ভালো এবং উপকারী। শয়তানের পক্ষ থেকে যা আসে তার নাম ওয়াসওয়াসা, নিজের ভেতর থেকে যা আসে তার নাম নাফস। এটাকে বলা হয় হেওয়া। শয়তান সহচর থেকে যা আসে তা ইগফাল। নসিহত সবাইকে দেয়া যায়।

ওয়াসওয়াসা এবং হেওয়া, অবিশ্বাসী এবং ফাসিকদের কাছে আসে। এদের দুটাই খারাপ এবং ক্ষতিকর। আল্লাহ তায়ালা যে সকল কাজ পছন্দ করেন সে সবই ভালো কাজ আর তিনি যা অপছন্দ করেন তা ফেনা বা খারাপ কাজ। আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী। তিনি ভালো এবং খারাপ কাজের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। তিনি ভাল কাজ করা এবং শয়তান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তার আদেশ নিষেধসমুহকে এক কথায় বলা হয় আহকাম ই ইসলামিয়া। যদি কোন হৃদয় ভালো সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আহকাম ই ইসলামিয়া অনুসরণ করে তবে তা পবিত্র এবং নূরে পরিপূর্ণ হবে। তারা এই পৃথিবীতে এবং পরবর্তী জীবনে সমৃদ্ধি লাভ করবে। কেউ যদি এটি অস্বীকার করে এবং শয়তানের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে যা ভুল এবং শয়তান ও যিন্দিকদের দ্বারা রচিত তবে সে অন্ধকারে পতিত হবে। নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হৃদয় সব সময় আহকাম ই ইসলামিয়া অনুসরণ করে। যে হৃদয় অন্ধকারে পরিপূর্ণ তারা অসৎ সঙ্গ, নাফস এবং শয়তানের রাস্তা খুব পছন্দ করে। পরাক্রমশালি আল্লাহ তায়ালা সকলের জন্য একটি পবিত্র হৃদয় তৈরি করেন নতুন জন্ম নেয়া সকল শিশুর জন্য পুরো পৃথিবী জুড়ে। এরপর বাবা মা এবং তাদের পরিবেশ তাদের হৃদয়কে কলুষিত করে দেয় তাদের মত করে।]

মন্তব্য: মিশনারিরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করছে, ইহুদিরা তাদের ইহুদি রাব্বিস এর ধারান ছড়ানোর জন্য কাজ করছে। ইস্তানবুলের হাকিকাত কিতাবেভি মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছানোর কাজ করছে। আর ভন্ডরা ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা

করছে। একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং সচেতন মানুষ বুঝতে পারবেন কোনটি সঠিক পথ এবং তা মানবতার কাছে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করবেন। এটির চেয়ে ভালো এবং মূল্যবান কোন উপায় নেই মানবতার সাহায্য করার জন্য।

মিলাদি	হিজরি শামসি	হিজরি কামরি
২০০১	**১৩৮০**	**১৪২২**

[১] মানুষের সহজাত ধর্ম হচ্ছে রিপু।
[২] পাপী, অবিশ্বাসী মুসলিম।

আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি যিয়ালিনা মিনাত তালিবিনা ওয়া লিল ইলমি মিনার রাগিবিনা ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিনিল লাজি আরসালুহু, রাহমাতাল্লিল আলামিনা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

ইসলাম : আল্লাহ বিদ্যমান, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু সৃষ্টি করেন। সূচনালগ্নে সবকিছুই ছিল অবর্তমান। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ছিল। তিনি সর্বদা বিদ্যমান। তিনি এমন সত্ত্বা নন যিনি অন্য কিছুর পরে এসেছেন। তিনি যদি প্রথমেই অস্তিত্বহীন থাকতেন তবে তাকে সৃষ্টি করার জন্য অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হতো। অস্তিত্বহীন কোন শক্তি হতে যদি কোন কিছু সৃষ্টি করতে হয় তবে সে সৃষ্টির ধারাও হয় অস্তিত্বহীন। সুতরাং এটি বা এ সৃষ্টি কখনোই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় না। ক্ষমতার মালিককে যদি এতে অস্তিত্ব প্রদান করতে হয় তবে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা সেই শাশ্বত অস্তিত্ববান সত্ত্বা যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

অন্যভাবে, তর্কের খাতিরে যদি বলতে হয় সৃষ্টিশীল ক্ষমতা পরে তাহলে তারও কোন সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে, যা আমাদের অসীম সংখ্যার স্রষ্টার দিকে নিয়ে যায়। যেটা প্রকৃতপক্ষে কোন সৃষ্টিকর্তার সুচনার অস্তিত্বহীনতাকেই বোঝায়। আদি এবং পরম স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা।

যখন স্রষ্টাই অস্তিত্বহীন তখন আমাদের চারপাশের বস্তুগত অবস্তুগত সত্ত্বা যা আমরা দেখতে পাই ও শুনতে পারি সেগুলোও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। যেহেতু বস্তুগত সত্ত্বা এবং আত্মা উভয়েই বিদ্যমান সুতরাং একক এবং অদ্বিতীয় সর্বদা বিদ্যমান স্রষ্টারও অস্তিত্ব আছে।

আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মৌলিক উপাদানসমূহ, মানব দেহের উপাদানসমূহ, আত্মা এবং ফেরেশতা তৈরি করেন। মৌলিক উপাদানসমূহ এবং বিভিন্ন উপাদানে রূপান্তরিত এখন পর্যন্ত ১০৫টি এরুপ উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। আল্লাহ তায়ালা এই মৌলিক উপাদানসমূহ থেকে সকল পদার্থ ও বস্তু তৈরি করেছেন এবং এখনও অব্যাহত রেখেছেন। আয়রন, সালফার, কার্বন, অক্সিজেন গ্যাস প্রত্যেকটি একেকটি মৌলিক উপাদান। তবে তিনি একথা বর্ণনা করেননি ঠিক কত মিলিয়ন বছর আগে তিনি এসব উপাদান তৈরি করছেন। তিনি একথাও জানতে দেননি

কখন তিনি পৃথিবী, জান্নাত এবং সকল জীবিত সত্ত্বা সৃষ্টি করা শুরু করেছেন। যা সবই ছিল এসব মৌলিক উপাদানসমূহ থেকেই সৃষ্টি।

সকল জীবিত বা প্রাণহীন উপাদানেরই একটি নির্দিষ্ট জীবন আছে। সে সময় পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। তিনি উপযুক্ত সময়েই তাকে সৃষ্টি করেন এবং ধংস করেন যখন তার জীবনকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। তিনি যে শুধু শুন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা নয়, তিনি এক বস্তু থেকেও অন্য বস্তু সৃষ্টি করেন। কখন দ্রুত আবার কখনও বা ধীর গতিতে। এবং নতুনের আগমনে সাবেক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা নির্জীব দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রাণী, উদ্ভিদ, জিন, ফেরেশতা মানুষেরও পূর্বে সৃষ্টি করা হয়। প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালাম। এবং তার হতে আল্লাহ তায়ালা হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে তৈরি করেন। এবং তাদের থেকে সমগ্র মানব জাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা দেখতে পাই সকল জীবিত ও প্রাণহীন বস্তু পরিবর্তনশীল। চিরস্থায়ী কিছু কখনও পরিবর্তিত হয় না। আমাদের নিয়মিত শারীরিক ঘটনা, অবস্থান ও গঠন পরিবর্তিত হচ্ছে। তাছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে তাদের ভর ও স্বভাব/ ধর্ম পরিবর্তন হচ্ছে। কিছু পদার্থ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন পদার্থ অস্তিত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যভাবে পারমানবিক তত্ত্বের মতে পদার্থ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় এই অস্তিত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া কোন শাশ্বত চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভব না হয়ে পারে না। এসব কিছুর সুচনাই ওই সত্তা হতে উদ্ভব হতে হবে যা কোন কিছু হতে সৃষ্টি হয় নি। কারণ চিরস্থায়ী বলতে বুঝায় কোন সুচনা ছাড়াই যে অস্তিত্ব প্রাপ্ত।

ইসলামের শত্রুরা বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে দাবি করে মানুষ বানর হতে সৃষ্টি। তারা বলে চার্লস ডারউইন নামক একজন ইংরেজ ডক্টর এটা বলেছে। তারা মিথ্যাবাদী। ডারউইন কখনো এটা বলেননি। তিনি জীবিত সত্ত্বার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপর একটা প্রস্তাবনা দেন। তার বই **"দি অরিজিন অব স্পিসিস,,** এ তিনি লিখেন, জীব নিজেদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ করে যা তাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এজন্য তারা সামান্য পরিবর্তন/ অভিযোজন এর মধ্য দিয়ে যায়। তিনি এটা বলেননি যে এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রুপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানের উন্নয়নের উপর ব্রিটিশ এসোসিয়াসন কর্তৃক ১৯৮০ সালে আয়োজিত এক সম্মেলনে সাভান্সিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জন ডুরান্ট বলেন,

ডারউইনের বিবর্তন মতবাদ এখন একটা বৈজ্ঞানিক পুরাকথায় রুপান্তরিত হয়েছে।প্রফেসর ডুরান্ট ১ এর স্বদেশবাসী ডারউইনের উপর দেয়া এসব বিবৃতিসমুহ বিজ্ঞানের নামে ডারউইন মতবাদিদের জন্য এক আকর্ষনীয় জবাব।

এই বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির দিকে অনুপ্রাণিত করার পেছনের গভীর কারঙ্গুল শুধুই নিছক কল্পনা মাত্র। এর পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নেই। এই তথাকথিত মতবাদ জড়বাদী দর্শনের একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। বানর থেকে মানুষ হওয়ার এই যুক্তির পেছনে কোন ব্যাবহারিক পটভূমি নেই। তথাপি এটি বিজ্ঞান হতেও অনেক দূরে। এমনকি প্রকৃতপক্ষে এটি ডারউইনের মতবাদও নয়। এটি জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনবগত কিছু অজ্ঞ ইসলামের দুশমনের বানোয়াট কাহিনী। একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কখন এধরনের অজ্ঞ ও হাস্যকর যুক্তি মানতে পারে না। একজন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক যদি চরিত্রহীন জীবনের দিকে পরিচালিত হয় এবং সে যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলো অধ্যয়নের বদলে স্কুল জীবনের শিক্ষাগুলো ভুলে যায়, তাহলে সে কখনোই ভাল বিজ্ঞানী হতে পারবে না। এটা আরও ভয়ঙ্কর যে, সে ইসলামের বিরুদ্ধে তার ঘৃণাগুলোকে পুষে রাখছে এবং মিথ্যা ও বানোয়াট কথাগুলোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নামে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যার পরিনতি সমাজে অবিশ্বাসের বিষাক্ত ভিত্তি তৈরি হওয়া। এক্ষেত্রে এই ডিপ্লোমা, টাইটেল এবং পদ সবই যুবকদেরকে শিকার করবার এক আকর্ষণীয় ফাঁদ। যেসব বিজ্ঞানীরা নিজেদের **মিথ্যা এবং কুৎসা জ্ঞান বিজ্ঞানের** নামে প্রচার করে তাদের ভণ্ড বিজ্ঞানী বলা হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা চান মানুষ সুখে শান্তিতে পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরকালের অসীম নেয়ামত অর্জন করবে। এজন্য তিনি আমাদের দরকারি কিছু বিষয় করতে আদেশ করেছেন যা সফলতা ও সুখের কারণ হবে। এবং কিছু ক্ষতিকর বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যা আমাদের নরকের দিকে ধাবিত করে।

[১] ডক্টর ডুরান্ট (ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স ইম ওয়ালেস) উল্লেখ করেছেন, কিভাবে ইভাউলিউশন একটি বৈজ্ঞানিক রুপকথা, নিউ সায়েন্টিস্ট, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮০, প- ৭৬৫)

একজন ব্যক্তি যদি তার ধার্মিক হওয়া না হওয়া, বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী হওয়া, নিজেকে আহকামে ইসলামের পথে পরিচালিত করা, আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও

নিষেধসমুহ মেনে চলা ইত্যাদি বিষয়াবলীর উপর জেনে বা অজ্ঞাতে অমনোযোগী হয় তবে তা হবে তার জন্য খুবই ক্ষতিকর। তার পরকালীন দুনিয়ার সুখ- শান্তি দীর্ঘ হবে তবেই দুনিয়ায় জীবন বিধানের প্রতি আনুগত্যের সমানুপাতিক। এটা নিশ্চিত, যে তার অসুখের জন্য সঠিক ঔষধটি সনাক্ত করতে পারবে কেবল সে রোগ থেকে সহজে মুক্তি পাবে। অধার্মিক ও নাস্তিকরা দুনিয়াবী যে সাফল্য ও সুখ ভোগ করে পারতপক্ষে কুরআনে বর্ণিত পন্থা অনুসরণের ফলেই। কিন্তু পরকালীন সফলতা তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন সে কুরআনের বিধানগুলো একজন বিশ্বাসী হিসাবে জেনে পালন করবে।

আল্লাহ তায়ালার প্রাথমিক আদেশ হল **ঈমান**। **কুফরকে** তিনি সব কিছুর পূর্বে নিষেধ করেছেন। ঈমান হল এই বিশ্বাস যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তাঁর উপরে আল্লাহ তায়ালা নিজ আদেশসমুহ ওহি হিসাবে নাজিল করেছেন। অন্যভাবে তিনি ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর আহকাম ই- ইসলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রকাশ করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সকল মানবজাতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে যে বানি প্রকাশ করেছেন তাই-ই কুরআন আল কারিম। যে বই বা কিতাব কুরাআনের সকল লিখিত বানীগুলোকে ধারন করে তা **মুসহাফ** (কুরআনে কারিমের লিখিত কপি)। কুরআন আল কারিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজস্ব বক্তব্য নয়। এটি আল্লাহ তায়ালার বানী। কোন মানুষেরই পক্ষে কুরানের আয়াতের মত একটি আয়াতও তৈরি করা সম্ভব নয়। কুরআন আল কারিমে যেসব বিধান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাঁর সম্মিলিত রুপই **ইসলাম**। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে এ সকল বিধানসমুহ বিশ্বাস করে সে একজন **মুমিন** এবং **মুসলমান**। যে কোন একটি বিধানকে অস্বীকার করাই **কুফর**। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস, জিন ও ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস, আদম আলাইহিস সালাম সমগ্র মানজাতির আদিপিতা এবং প্রথম নবী এ বিষয়গুলো সব অন্তরের বিষয়। এগুলোকে বলা হয় **ঈমান, ইতিকাদ এবং আকাইদ**। যেহেতু আদেশবলি ও নিষেধসমুহ মেনে চলা অবশ্যই শারিরিক ও মানসিকভাবে সম্পন্ন হয় সুতরাং এটা খুবই প্রয়োজন প্রথমে বিশ্বাস আনা এবং পরে আদেশসমুহ ও নিষেধাবলি মেনে চলা। এগুলো **আহকাম-ই-ইসলাম** এর শিক্ষা। এগুলো বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ। মেনে চলা ও পরিহার করা হলো **ইবাদত**।

আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমুহ **আহকামে ইসলামিয়া** তথা **আহকামে ইলাহিয়া**। আদেশসমুহকে বলা হয় **ফরয** এবং নিষেধসমুহকে **হারাম**। যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি বিধানকে অস্বীকার করবে বা অবজ্ঞা করবে সে **কাফির** হিসাবে বিবেচিত হবে। যে বিধানসমুহ বিশ্বাস করে কিন্তু অবিহেলা করে, সে কাফির নয় কিন্তু **ফাসিক** হয়ে যাবে। একজন মুমিন যে ইসলামের বিধানসমুহকে বিশ্বাস করবে এবং এগুলো যথাসম্ভব মেনে চলবে সে একজন **সালিহ** মুসলিম। একজন মুসলিম যে ইসলামকে মেনে চলবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জনের জন্য কোন মুর্শিদকে ভালবাসবে তাকে বলা হয় **সালিহ** ব্যক্তি। একজন মুসলিম যিনি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও ভালবাসা অর্জন করেছেন তাকে বলা হয় **`আরিফ**, বা **ওয়ালী**।

একজন ওয়ালী যিনি অন্যদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে কাজ করে যান তিনি একজন **মুরশিদ**। এই সকল নির্বাচিত মানুষদের একত্রে **সাদিক** বলা হয়। তাদের সকলেই সালিহ ব্যক্তি। একজন সালিহ বিশ্বাসী কখনোই দোযখে যাবে না। একজন কাফির অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। সে কখনোই জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। এবং ভোগ করতে থাকবে অন্তহীন শাস্তি। একজন কাফির যদি ঈমান আনে তাহলে তাঁর পাপসমুহকে সাথে সাথে মাফ করে দেওয়া হয়। একজন ফাসিক যদি তওবা এবং ইবাদাতসমুহ পালন করে চলে তবে সেও কখন জাহান্নামে যাবে না। বিশ্বাসী মুমিনদের মত সরাসরি জান্নাতে যাবে। যদি সে তওবা না করে তা হলে হয় তাকে কারো শাফায়াতের মাধ্যমে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে অথবা তাঁর পাপসমুহ অনুপাতে শাস্তি প্রদান করে তাকে আবার জান্নাতে প্রেরণ করা হবে।

কুরআন আল কারিম যখন অবতরণ করা হল, এর ব্যাকরণ ছিল সেই সময়ের আরবি ভাষাভাষী মানুষদের জন্য উপযুক্ত। এটা ছিল একটি কাব্যিক ভাষা। অন্যভাবে বলা যায় এটি কবিতার ছন্দময় ছিল। এটি ছিল আরবি ভাষায় সুক্ষ তনিমায় প্রাচুর্যপূর্ণ। এটি বেদি, বেয়ান, মেয়ানি কিংবা বেলামাটের মত কাব্য চিঠিসমূহের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও এটি বুঝা অনেক কঠিন। একজন ব্যক্তি যদি আরবি ভাষার মাধুর্য্য /গাম্ভীর্য / মার্জিততা বুঝতে না পারে তাহলে সে কখনোই কুরআনকে ভালভাবে বুঝতে পারবে না যদিও সে আরবি জেনে থাকে। এমনকি ঐ যুগের অনেক মানুষও কুরআনকে ভালোভাবে বুঝতে পারেনি যদিও আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটির ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কুরআন আল কারিমের ব্যাখ্যাকেই **হাদিস শরিফ** বলা হয়। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাসমুহ অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কলবও পরিবর্তিত এবং আঁধারে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তাই ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিমরা নিজেদের সংকীর্ণ মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে নিজেরা কুরআনের বিভিন্ন ব্যখ্যা করেছে যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া কুরআনের মুল শিক্ষার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের শত্রুদের দ্বারা এই সব ভুল ব্যাখাসমুহকে বুঝতে হবে। তাকে ইসলামের আদেশসমূহ অর্থাৎ ফরয এবং নিষেধসমূহ অর্থাৎ হারাম জানতে হবে এবং যখন সে এগুলো পালন করার মত অবস্থায় পৌছাবে তখন পালন করতে হবে। তারা যদি এগুলো না শিখে অথবা শিখেও কোনটি অবহেলা করে তবে তারা যেন আল্লাহ্ তায়ালার দীনকে অবহেলা করল। তারা ঈমান হারাবে। যারা তাদের ঈমান হারায় তাদের **মুরতাদ** বলা হয়। যারা ধার্মিকদের ছদ্মবেশে থেকে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে তাদের জিন্দিক বলা হয়। আমাদের **জিন্দিক**দের এবং তাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এটি উল্লেখ রয়েছে, **সিয়ার ই কাবির** [১] গ্রন্থের তুর্কিশ ভার্শনে একশত ষোল পৃষ্ঠায় এবং **দুররুল মুখতার** গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অবিশ্বাসীদের নিকাহ নামক অধ্যায়ে। কোন ব্যক্তি বালেগ হওয়ার পরও যদি তার প্রয়োজনীয় ইসলামি জ্ঞান না থাকে এবং সে যদি মনস্থির করতে না পারে যে সে মুসলিম এবং তার কর্মকাণ্ড যদি হয় ইসলাম না জানার কারণে তবে সে একজন মুরতাদ হিসাবে সাব্যস্ত হবে। **দুররুল মুখতার** গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে -অবিশ্বাসিদের নিকাহ নামক অধ্যায়ে রয়েছে, যখন কোন নিকাহ হওয়া বা বিবাহিতা মেয়ে বালেগ হওয়ার বয়সে পৌছায় কোন ইসলামি জ্ঞান ছাড়া তখন তার নিকাহ ভেঙ্গে যায় এবং অবৈধ হয়ে যায়। অন্য কথায় সে মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শনসমুহ তার কাছে পৌছাতে হবে। তার যে শুনবে তাকে অনুকরণ করতে হবে এবং বলতে হবে, আমি এগুলো বিশ্বাস করি। ইবনে আবিদিন রাহিমুল্লাহ তায়ালা বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছে, যখন কোন মেয়ে ছোট থাকে তখন সে মুসলিম, এ সময় তার পিতামাতার ধর্মই তার ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হবে।

[১] এই বইটির লিখক মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন আব্দুল্লাহ বিন তাওয়াস বিন হুরমুজ শেয়বানি (ইমাম মুহাম্মাদ) রহমাতুল্লাহ তায়ালা, (১৩৫,৭৫২ খ্রি, অয়াসিত- ১৮৯, ৮০৫খ্রি,), একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত। সামস উল আইম্মা আবু বকর

মুহাম্মাদ বিন আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (হিঃ ৪৮৩/ ১০৯০ খ্রি) বইয়ের একটি ব্যাখ্যা লিখেন যা তুর্কিতে প্রকাশ করা হয় খাজা মুহাম্মাদ মুনিব এফেন্দি এর আইয়ান্তাবে।

যখন সে বালেগ হবে তখন সে আর তার পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকবে না। যখন সে ইসলামের বিষয়ে অজ্ঞ অবস্থায় বালেগ হয় তখন সে মুরতাদ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ইসলামের বিধিবিধানে বিশ্বাস করে না যদিও তাকে কালিমা তাওহিদ পড়তে শোনা যায়, সে বলে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ** তবুও সে মুসলিম হবে না। যে ইসলামের ছয়টি ভিত্তির উপর যা আমানতু বিল্লাহতে বর্ণিত রয়েছে এবং বলে যে আমি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ এবং নিষেধসমূহকে মেনে নিয়েছি সে একজন মুসলিম। প্রত্যেক মুসলিমকে তাদের সন্তানদের নিম্নোক্ত মুখস্ত করাতে হবে, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়া বিল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা,সু বাদাল মাওত। হাক্কুন আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। এবং এর অর্থ ভালো করে শিক্ষা দেওয়া। বালেগ হওয়ার পর কোন বাচ্চা যদি বলে সে এই ছয়টির যে কোন একটি মানে না অথবা ইসলামের আদেশ নিষেধ মানে না তবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। এই ছয়টি বিশ্বাসের বিষয়ে বিস্তারিত হাকিকাত কিতাবের **ঈমান এবং ইসলাম (Belief** and Islam) নামক কিতাবে রয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমের এটি পড়া উচিত এবং বাচ্চাদের পড়ে শোনানো উচিত যাতে তাদের ঈমান মজবুত হয় এবং তার অধিন সকলকে পড়ে শোনানো উচিত। কার্যত আমাদের সকলের সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিৎ যাতে করে তারা মুরতাদ হিসাবে বড় না হয়। তাদের শৈশবের প্রথম সময়ে ঈমান, ইসলাম, ওযু, গোসল, নামায এই বিষয়গুলোর শিক্ষা দিতে হবে। [১] পিতামাতার প্রথম কর্তব্য তার সন্তানকে মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা। এটি **দুরের ওয়া ঘুরের** [২] কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, "একজন মুসলিম যে মুরতাদ হয়েছে তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে বলতে হবে। তার সন্দেহ দূর করতে হবে। সে যদি কোন অবকাশ চায় তাকে তিন দিনের জেলখানায় রাখতে হবে। সে তওবা করলে তার তওবা কবুল করা হবে। সে তওবা না করলে তাকে মুসলিম বিচারকের অধীনে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। কোন নারী মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে না। তাকে পুনরায় মুসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত বন্দি রাখতে হবে।

[১] হাকিকাত কিতাবেভি প্রকাশিত অফুরন্ত নিয়ামত বা Endless Bliss **কিতাবের চতুর্থ খণ্ডে এটি বর্ণিত রয়েছে।**

[২] তৃতীয় উসমানী শাইখ উল ইসলাম মুহাম্মদ মল্লা হাসরাও রহমাতুল্লাহ কর্তৃক লিখিত।

সে যদি দারুল হারবে পালিয়ে যায় তবে পুনরায় দারুল ইসলামে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তার কোন জারিয়া থাকবে না। সে মুরতাদ হয়ে গেলে তার নিকাহ ভেঙ্গে যাবে এবং অবৈধ হয়ে যাবে। তার সকল সম্পত্তি তার অধীন হতে চলে যাবে। সে পুনরায় মুসলিম হলে সে আবার সম্পত্তি ফিরে পাবে। সে মারা গেলে বা দারুল হারবে পালিয়ে গেলে তার সম্পত্তি তার ওয়ারিশরা পাবে। তার কোন ওয়ারিশ না থাকলে **বায়তুল মালের** হকদার ব্যক্তিরা তা পাবে।

[১] একজন মুরতাদ অন্য মুরতাদের সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। মুরতাদ হিসাবে অর্জিত সম্পত্তি তার সম্পত্তি নয়। এটি মুসলিমদের জন্য ফেইস হিসাবে গন্য হবে। (**ফেইস** এর সংজ্ঞা **অফুরন্ত নিয়ামত** নামক কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের উপ পরিচ্ছেদ **অবিশ্বাসীদের বিবাহে** বর্ণিত রয়েছে)। তার সকল সামাজিক আদান প্রদান যেমন কেনা বেচা, ভাড়ার চুক্তি, উপহার দেওয়া বাতিল হয়ে যাবে। (দয়া করে **অফুরন্ত নিয়ামত** কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের একত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এ বাতিল নামক পরিচ্ছেদ দেখুন)।

সে যদি পুনরায় মুসলিম হয় তবে এগুলো তার কাছে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। তাকে তার আগের ইবাদাতের কাযা করতে হবে না একমাত্র হজ ব্যতীত, হজ তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে। প্রথম তিনটি বিষয় যা একজন নতুন বিশ্বাসীর জানতে হবে, ওযু করতে, গোসল করতে এবং নামায আদায় করতে। ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ হল, বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্তায়ালা এক এবং অদ্বিতীয় এবং তার নিদর্শনসমুহে ঈমান আনা, ফেরেশতাদের উপর, আসমানি কিতাবের উপর, নবীদের উপর, পরকালের জিবনের উপর, কাযা এবং কাদার এর উপর। এরপরে তার এগুলো আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বলতে হবে। সংক্ষেপে, আমাদের ইসলামের আদেশ এবং নিসেধসমুহ অন্তর এবং শারীরিক উভয়ভাবে পালন করতে হবে এবং অন্তর সবসময় সচেতন রাখতে হবে নতুবা তা গাফেলতে ডুবে যাবে। কোন ব্যক্তির অন্তর যদি স্থায়ী না হয়। অর্থাৎ সে যদি মনে রাখতে না পারে আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ত্ব এবং তার করুণাসমুহকে, জাহান্নামের আযাবকে, ইসলামকে নিজের উপর আরোপিত করা তার জন্য অনেক কঠিন হবে। ফিকহের স্কলারগণ এই মর্মে ফতওয়া দিয়েছেন, যে এটি বান্দাকে ইসলাম পালনে সহজ

করে দেয়। শরীরের ইসলামের সাথে মানায় নেওয়ার সহজতা, ইচ্ছা এগুলো নির্ভর করে অন্তরের বিশুদ্ধতার উপরে। তথাপি কোন ব্যক্তির আচরণ যদি তার শুধু অন্তরের বিশুদ্ধতাকে গুরুত্ব দেয় এবং ভালো আচরণ করে তবে শারীরিকভাবে ইসলাম মেনে না চলে তবে সে একজন **মুলহিদ**। এ ধরনের ব্যক্তিদের শিক্ষাকে **ইস্তিদরাজ** বলে। এই শিক্ষার অধিকারী এবং দানকারী উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং নাফসে মুতমাইন্না নির্ভর করে কতটা শারীরিক ও ইচ্ছাকৃতভাবে সে ইসলামের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এধরনের মন্তব্য, আমার অন্তর পরিশুদ্ধ, আমার অন্তরের দিকে দেখ, তারাই বলে যারা ইসলামকে তাদের বিবেক বিবেচনা এবং শরীরের সাথে মানিয়ে নেই নি। এগুলো বলে তারা নিজেদের এবং তার আশেপাশের মানুষকে প্রতারিত করছে।

ঈমানের গুণাবলী

আহলে সুন্নাতের ঈমামগণের মতে ঈমানের গুণাবলী ৬টি।

১। আমানতু বিল্লাহঃ

আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আজিমুশশান বর্তমান, তিনি এক অদ্বিতীয়। ইহার প্রতি আমার পুর্ণ ঈমান আছে।

তাঁর কোন শরীক ও নজীর নেই। (তাঁর কোন অংশীদার এবং তাঁর সমতুল্য কিছু নেই)।

তিঁনি নির্দিষ্ট অবস্থান হতে মুনাজ্জেহ মুক্ত, স্বাধীন। (তিনি একই স্থানে অবস্থান করেন না)।

তিনি মুত্তাসসির, অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ গুণাবলীতে গুণান্বিত। তাঁর মাঝে কামাল গুণাবলী বিরাজমান।

তিনি সকল ধরনের অপূর্ণতা থেকে মুক্ত এবং অনেক দূরে। এগুলো তাহাঁর ভেতরে বিরাজমান নয়।

পরিপূর্ণতার (কামাল এর) গুণাবলী তাহাঁর মাঝে বিরাজমান আর অপূর্ণতার গুণাবলী আমাদের মাঝে বিদ্যমান।

আমাদের মাঝে যে সকল অপূর্ণতার গুণাবলী রয়েছে তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন ঘাটতি যেমন হাত, পা অথবা চোখ, অসুস্থতা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানি, চাহিদা এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য অসম্পূর্ণতা।

আল্লাহ তায়ালা আজিমুসশানের অধিকৃত পরিপূর্ণ গুনাবলীর মাঝে রয়েছে কামাল এর গুণাবলী। যেমন, পৃথিবী ও জান্নাত- জাহান্নাম, পানি ও অন্তরীক্ষে বসবাসরত সমগ্র জীবিত সত্তা, সকল সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করা যার সংখ্যা আমরা চোখে দেখি ও যা আমরা ও আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক চিন্তাও করতে পারি না, তাঁর সকল সৃষ্টিকে রিযিক (খাদ্য) দান করা, এবং তাঁর অন্যান্য পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী।

তিনি কাদির ই মুতলাক (মহান সৃষ্টি কর্তা)। প্রত্যেক এবং সকল সৃষ্টিই আল্লাহ আজিমুসশান এর কামাল এর গুণাবলী বা বিশিষ্টেরই একটা কাজের অংশ।

আল্লাহ আজিমুসশান এর ২২টি গুণাবলী রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য জানা ওয়াজিব। তাছাড়া তাঁর আর ২২টি গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাঁর জন্য "মুহাল„ (অচিন্তনীয়, অসম্ভব)।

ওয়াজিব মানে প্রয়োজনীয়। এই গুণাবলীসমূহ আল্লাহ আজিমুসশান এর মাঝে বিদ্যমান। যে বৈশিষ্ট্যসমূহ মুহাল (অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়) সেগুলো তাঁর মাঝে বিদ্যমান নয়।মুহাল ওয়াজিব এর ঠিক বিপরীত।এর মানে ৃবিদ্যমান থাকা অসম্ভব, সিফাত- ই-নাফসিয়াহ আল্লাহ আজিমুসশান এর একটি গুণাবলী যেটা আমাদের জন্য জানা ওয়াজিব। **ৃউযুদ**, যার অর্থ বিদ্যমান থাকা প্রচলিত দলিলের আলোকে প্রমানিত আল্লাহ্ তায়ালা বিরাজমান এটি আল্লাহ্ তায়ালার কওয়াল এ শরীফ, যা পড়ে, **ইন্নেনি এনাল্লাহু**। এর দলিল মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিশ্চই সকল সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। বিরাজমান না থাকা তার জন্য মুহাল। সিফাত এনাফসিয়্যা অর্থ তাকে ব্যতীত জাত কিংবা জাতব্যতীত তিনি চিন্তার যোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ আজিমুসশান এর বিষয়ে ৫টি গুণাবলী রয়েছে যেগুলোকে সিফাত-ই- জাতিয়্যা বলা হয়। এগুলো জানা আমাদের জন্য ওয়াজিব। এগুলোর অপর নাম **উলুহিয়্যাত এর গুণাবলী**।

১। কাদিম (কিদাম)**:** এটা দ্বারা বোঝায় আল্লাহ আজিমুশশান এর অস্তিত্বের কোন ও সুচনা ছিল না, তিনি সব সময়ই বর্তমান।

২। বাকা: এর দ্বারা বোঝায় আল্লাহ আজিমুশশান এর অস্তিত্বের কোনও পরিসমাপ্তি নেই, এটি ওয়াজিব-উল-উযুদ নামেও পরিচিত। এটির প্রথাগত প্রমাণাদি হিসাবে

আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদিদের তিন নম্বর আয়াতে কারিমায় বর্ণনা করেছেন।এর মনস্তাত্ত্বিক প্রমান হল, যদি তাঁর অস্তিত্বের কোনও সূচনা থাকতো তবে তিনি হয়তো অক্ষম কিংবা অসম্পূর্ণ হতে পারতেন। এবং একজন অক্ষম অসম্পূর্ণ সত্ত্বা কখনো অন্য কে সৃষ্টি করতে পারেনা। সুতরাং তাঁর অস্তিত্বের শুরু কিংবা শেষ তাঁর অস্তিত্বের জন্য মুহাল (অসম্ভব)।

৩। **কিয়াম-বি-নাফশিহি:** এটা দ্বারা বোঝায় আল্লাহ তায়ালার কর্মে `জাত, হিসাবে অন্য কারো প্রয়োজনীয়তা নেই। সূরা মুহাম্মাদ (আলাইহিস সাল্লাম) এ এই বিষয়ের প্রামানিক দলিল রয়েছে। সাধারন জ্ঞানে তাঁর যদি এই গুণাবলীসমূহ না থাকতো তবে তিনি অক্ষম ও অসম্পূর্ণ হতেন। যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে মুহাল বা অসম্ভব।

৪। **মুখালাফাত -লিল-হাওয়াদিসঃ** এর দ্বারা বোঝায় আল্লাহ আজিমুসশান তাঁর জাত ও গুনাবলীতে অন্য কারো মতই নয়। সূরা শুরা এর এগারতম আয়াতে কারিমায় এর প্রামানিক দলিল রয়েছে। তাঁর যদি এই গুণাবলী না থাকতো তবে তিনি অক্ষম ও অসম্পূর্ণ হতেন। যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে মুহাল বা অসম্ভব।

৫।**ওয়াহদানিয়্যাতঃ** এর দ্বারা বোঝায় আল্লাহ আজিমুসশান তাঁর জাত কিংবা গুণাবলী বা কর্মে কোনটিতেই তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) অথবা নযির (সমকক্ষ) নেই। সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে কারিমায় এর প্রামানিক দলীল রয়েছে। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো যদি তাঁর কোন শরীক থাকতো তাহলে সকল সত্তা অস্তিত্বহীন হয়ে পরতো। একজন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলে অপরজন তাঁর বিরোধিতা করতো।

[বেশীর ভাগই ইসলামিক স্কলারদের মতে **উজুদ** অর্থ বিদ্যমান বা অবস্থান যা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী। ফলে এই **শিফাত-এ দুনিয়া** এর উপনামে ৬টি গুণাবলী রয়েছে।]

<u>সিফাত-ই- তুবুতিয়্যিয়াহ</u>

আল্লাহ আজিমুসশান এর ৮টি গুণাবলী রয়েছে যা আমাদের জন্য জানা ওয়াজিব। এবং এগুলোকে সিফাত-ই- তুবুতিয়্যিয়াহ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এগুলো হল হায়াত, ইলম, শেম , বাসার, ইরাদা , কুদরাত, কালাম , তাকউইন।

১। হায়াতঃ এর অর্থ আল্লাহু আজিমুসশান জীবিত। সূরা বাকারার ২৫৫তম আয়াতে কারিমায় এর দলীল রয়েছে। অর্থাৎ যদি আল্লাহ তায়ালা জীবিত না হতেন তবে কোন সৃষ্টির অস্তিত্বই কল্পনা করা যেত না।

২। ইলমঃ আল্লাহ তায়ালার রয়েছে অপরিসীম জ্ঞান। সূরা হাশরের ২২ তম আয়াতে কারিমায় এর বর্ণনা রয়েছে। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল আল্লাহ তায়ালা যদি সকল জ্ঞানের অধিকারী না হতেন তাহলে তিনি হতেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে মুহাল বা অসম্ভব।

৩। শামাঃ এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা শ্রবণ করেন। সূরা ইসরার প্রথম আয়াতে কারিমায় এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি হতেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম যদিনা তিনি শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন হতেন। যা আল্লাহ সুবহানা তায়ালার জন্য অসম্ভব।

৪। বাসারঃ এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা দেখেন। এটাও সূরা ইসরার প্রথম আয়াতে কারিমায় বর্ণিত হয়েছে। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল আল্লাহ তায়ালা যদি দৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী না হতেন তাহলে তিনি হতেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

৫। ইরাদাঃ এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি যা চান তাই সংঘটিত হয়। তার অনিচ্ছায় কিছুই সম্পন্ন হয় না। তিনি বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং সৃষ্টি করেছেন। সূরা ইব্রাহীমের ২৭তম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এটা বর্ণনা করেছেন।তিনি হতেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম যদিনা তিনি ইচ্ছা ক্ষমতাসম্পন্ন হতেন যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

৬।কুদরাতঃ এর অর্থ আল্লাহ সুবহানা তায়ালা সর্বশক্তিমান। সূরা আলে ইমরানের ১৬৫ তম আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালা এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি সর্বশক্তিমান না হতেন তাহলে তিনি হতেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

৭।কালামঃ এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা কথা বলেন। সূরা নিসার ১৬৪তম আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালা এটা বর্ণনা করেন। আল্লাহ তায়ালা যদি বাকশক্তি সম্পন্ন না হতেন তাহলে তিনি হতেন অসম্পূর্ণ ও অক্ষম। যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

৮।তাকউইনঃ আল্লাহ আজিমুসশান সৃষ্টিশীল, তার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি সৃষ্টি করেন। তিনি এক শূণ্য হতে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। সূরা যুমার এর ৬২ আয়াতে কারিমায় এর দলীল রয়েছে। তার রয়েছে এই মহাবিশ্ব ও জান্নাতের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি। এবং তিনি একাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বলা বা মনে করা এক ধরনের কুফর। মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতেন পারে না। স্রষ্টাই সকল সৃষ্টির আধার।

সিফাত-ই-মানাইয়্যাঃ

আল্লাহ সুবহানা তায়ালার রয়েছে ৮ টি অবস্তুগত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট যাকে বলা হয় সিফাত-ই-মানাইয়্যা। এগুলো জানাও আমাদের জন্য ওয়াজিব। এগুলো হলো- হায়ুউন, আলিমুন, সামিউন, বাসিরুন, মুরিদুন, কাদিরুন, মুতাকাল্লিমুন, মুকেউয়্যীউনুন।

১। হাইয়্যুনঃ আল্লাহ আজিমুসশান জীবিত।

২। আলিমুনঃ আল্লাহতায়ালার রয়েছে ইলম-ই-কাদিমি। এর অর্থ শাশ্বত জ্ঞান। তিনিই এই ঐশী জ্ঞানের অধিকারী।

৩। সামিউনঃ আল্লাহ আজিমুসশান এমন শ্রবণ ক্ষমতা দ্বারা শোনেন যেটা শাশ্বত।

৪। বাসিরুনঃ আল্লাহ আজিমুসশান দেখেন।

৫। মুরিদুনঃ আল্লাহ আজিমুসশান ইচ্ছা পোষণ করেন ইরাদা-ই-কাদিমা এর সাহায্যে। (শাশ্বত ইচ্ছাবলী)

৬। কাদিরুনঃ আল্লাহ আজিমুসশান নিজ কুদরত-ই-কারিমায় সর্বশক্তিমান। (শাশ্বত শক্তি)

৭। মুতাকাল্লিমুনঃ আল্লাহ আজিমুসশান এর রয়েছে বাকশক্তি। (শাশ্বত ভাষা)

৮। মুকেউয়্যীউনুনঃ আল্লাহ আজিমুসশান সৃষ্টিশীল এবং তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

উপরেল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিপরীত গুণাবলী আল্লাহ আজিমুসশান এর জন্য অসম্ভব বৈশিষ্ট্য।

ওয়া মালাইকাতিহিঃ

আমি আল্লাহ সুবহানা তায়ালার ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস করি এবং এর উপরে আমার পূর্ণ ঈমান রয়েছে। তিনি নূর (আলো) হতে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা জিসম (অবয়ব), (এখানে বর্ণিত জিসম বা অবয়ব পদার্থবিদ্যা এর বইয়ের বর্ণিত দেহ বা অবয়বের মত নয়)। তারা খায় না এবং পানও করে না। তাদের যৌন চাহিদা নেই। তারা বেহেশত থেকে দুনিয়াতে নেমে আসে এবং আবার বেহেশতে ফিরে যায়। তারা বিভিন্ন বেশে সামনে আসে। তারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ সুবহানা তায়ালার অবাধ্যতা করে না। তারা আমাদের মত পাপে নিমজ্জিত হয় না। তাদের মধ্যে রয়েছে মুকাররাব (১) এবং নবীগণ।

ওয়া কুতুবিহিঃ আমি আরও বিশ্বাস করি আল্লাহ সুবহানা তায়ালার **(স্বর্গীয়)** কিতাবসমূহের উপর। আল্লাহ সুবহানা তায়ালার রয়েছে কিতাবসমুহ। কুরআনে কারিমে একশত চার খানা আসমানি কিতাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে একশত খানা ছোট কিতাব রয়েছে যাদের বলা হয় **সুহুফ**। এবং অন্য চারটি বড় কিতাব। **তওরাত (তোরাহ)** হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, **যাবুর** হয়েছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপরে, **ইনযিল** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে এবং **কুরআনে কারিম** আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপরে। বর্তমান জিউস এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে **তাওরাত এবং বাইবেল** এর কোনটি পড়া হয় এই বিষয়ে আমাদের একজন পাবলিকেশন যে এ বইগুলোর সাথে জড়িত এর **কোন জবাব দিতে পারে নি**।

একশত খানা সুহুফ এর ভিতরে দশখানা হযরত আদম আলাইহিস সালামের উপরে, পঞ্চাশটি হযরত শিস আলাইহিস সালামের উপরে, তিরিশটি হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালামের উপরে এবং দশটি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে। সবগুলোই হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে কারিম আসমান হতে অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এটি খণ্ড খণ্ড আয়াতে অবতীর্ণ হতে মোট তেইশ বছর সময় লাগে এবং এর বিধানবলী এ বিশ্ব ধ্বংসের আগ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে। একে সকল ধরনের বিলুপ্তি (বাতিল

হওয়া থেকে) এবং মানব সৃষ্ট পরিবর্তন (মানুষের দ্বারা কোন ধরনের পরিবর্তন সংস্করণ বা পরিবর্ধন) এর হাত থেকে হেফাজত করা হয়েছে।

[১] মুকাররব এর জন্য অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ওয়ারা এর পঞ্চম স্তর।

ওয়া রাসুলিহিঃ

আল্লাহ আজিমুসশান কর্তৃক প্রেরিত নবী রাসুল আলাইহিস সালামগণের প্রতিও আমার ঈমান আছে।

সকল নবীগণই মানুষ। আদম আলাইহিস সালাম প্রথম নবী এবং আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম সর্বশেষ নবী। এই দুইজনের মাঝে আরও অনেক নবী আলাইহিমুস সালাওয়্যাতু ওয়াত তাসলিমাত এসেছেন। আল্লাহ আজিমুসশান একমাত্র এই সংখ্যা জানেন। নবীগণের আলাইহিমুস সালাওয়্যাতু ওয়াত তাসলিমাত এর ৫টি গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো আমাদের জানা ওয়াজিব।

এগুলো সিদক, আমানাত, তাবলীগ, ইসমাত এবং ফেতানাত।

১। **সিদকঃ** সকল নবী আলাইহিমুস সালাওয়্যাত ওয়াত তাসলিমাত তাদের কথার উপরে পুরোপুরি বিশ্বস্ত। তারা যা বলেন সব সত্য।

২। **আমানাতঃ** তারা কখনো বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কাজ করেন না।

৩। **তাবলিগঃ** তারা আল্লাহ তায়ালার সকল আদেশ এবং নিষেধসমূহ জানেন এবং এগুলো তার উম্মাতদের মাঝে ছড়িয়ে দেন।

৪। **ইসমাতঃ** এর অর্থ সকল ধরনের পাপ, লোভ কিংবা এসবের কিঞ্চিৎ পরিমান থেকেও অনেক দূরে। তারা কখনো কোন পাপ কাজ করেন না। নবী আলাইহিস সালামগনই সেই গোষ্ঠী যারা কখনোই পাপ করেন না।

৫। **ফেতানাতঃ** এর অর্থ সকল নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামগণ) সাধারন মানুষ অপেক্ষা জ্ঞানী।

৫টি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো নবী- রাসুল আলাইহিমুস সালাওয়্যাত ওয়াত তাসলিমাতগণের জন্য জায়েয। তাঁরা পান করেন, আহার গ্রহন করেন, তাঁরা অসুস্থতায় ভোগেন, তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন (তাঁরা মরণশীল), তাঁরা হিজরত করেন এক জগত (এই দুনিয়া) হতে অন্য জগতে (পরকালীন জীবন), এবং তাঁরা

পৃথিবীর প্রতি আসক্ত নন। কুরআনে কারিমে ২৮ জন রহমতপ্রাপ্ত নবীগণের নাম উল্লেখ আছে। আলেমগণের মতে সকলের জন্য এটা জানা ওয়াজিব।

নবীগণের নামঃ (আলাইহিমুস সালাওয়্যাতু ওয়াত তাসলিমাত)

আদম, ইদ্রিস, নূহ, শিস, হুদ, সালিহ, লুত, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ইলিয়েসা, আইয়ুব, যাকারিয়া, ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম। এখানে উজাইর, লোকমান এবং জুলকারনাইন নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। কিছু ইসলামিক বিশেষজ্ঞের মতে তারা তিনজন এবং খিজির আলাইস সালাম নবী ছিলেন। অন্যদের মতে তাঁরা ছিলেন আউলিয়া।

মাক্তাবাত-ই মাসুমিয়ার ছত্রিশ নম্বর চিঠিতে উল্লেখ আছে, এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত আলেমগণের বর্ণনা রয়েছে যে খিজির আলাইহিস সালামও নবী ছিলেন।

১৮২ তম চিঠিতে আরও বর্ণীত আছে, খিজির আলাইহিস সালামের মানুষের ছদ্দবেশে আত্মপ্রকাশ ও মানুষের বেশে কাজ করা দ্বারা এটা প্রমান করেন না যে তিনি জীবিতই ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে অনেক নবী ও আউলিয়া কিরাম এর আত্মাও মানুষের বেশে দেখা যায়। তাদেরকে দেখতে পারাই মানে এটা নয় যে তাঁরা জীবিত।

এবং তোমাদেরকে এটা বলতে আরোপিত করা হয়েছে যে, আমি, আলহামদুলিল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালামের একজন বংশধর এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন উম্মত। ওহাবিরা এটা মানে না যে আদম আলাইহিস সালাম একজন নবী ছিলেন। তাছাড়া যেহেতু তাঁরা মুসলিমদের মুশরিক বলে তাই তাঁরা কাফের হিসাবে গণ্য।

[১] লিখিত মুহাম্মদ বিন ফারুকি রাহমাতুল্লাহি। ইমাম রব্বানি কুদ্দিসা সিররুহুমা এর তৃতীয় ছেলে কর্তৃক (১০০৭ সেরহেন্দ-১০৭৯)

ওয়াল- ইয়াওমিল আখিরিঃ

আমি পুনরুত্থান এর উপর বিশ্বাস করি। এর উপর আমার পূর্ণ ঈমান রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ সুবহানা তায়ালা আমাদের এই বিষয়ে অবহিত করেছেন। কিয়ামত দিবস শুরু হবে যখন মানুষ কবর থেকে উঠতে শুরু করবে। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হবে যখন মানুষ তাদের সর্বশেষ অবস্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং পুনরায় নতুন

জীবন প্রাপ্ত হতে হবে। জান্নাত, জাহান্নাম, মীযান, পুলসিরাত, হাশর, নাশর, কবরের আজাব এবং কবরে মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তর এগুলো সবই সত্য। এগুলো অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

ওয়াবিল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তায়ালাঃ আমি আরও বিশ্বাস করি অতীত এবং বর্তমানের সকল ঘটনা, ভালো খারাপ, যা ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে সবই আল্লাহ আজিমুসশান কর্তৃক নির্ধারিত তা কদর, এটা তার জ্ঞানের উপযুক্ত এবং পূর্ব হতে নির্ধারিত। আমাদের সৃষ্টির সাথে সাথে আমাদের নির্ধারিত সময় এবং যাবতীয় সকল কিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ, এর প্রতি আমার পূর্ণ ঈমান রয়েছে। এই বিষয়ে আমার অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহুঃ

আমার মাযহাবে ইতিকাদ (বিশ্বাসের ভিত্তিতে) **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতে**র মাযহাব। আমি এই মাযহাবের অনুসারী। বাকি অন্য বাহাত্তরটি মতবাদই বাতিল এবং তারা জাহান্নামে যাবে।

[যারা আসহাবে কেরামদের (আলাইহিম উর- রিদওয়ান) ভালবাসে তাদের বলা হয় **আহলুস সুন্নাত**। সকল সাহাবা কেরামগণই ছিলেন জ্ঞানী এবং আদিল মুসলিম। তারা অংশ নিতেন মানব জাতির শিক্ষক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলিহি ওয়া সাল্লামের সোহবতে (পবিত্র বৈঠকে, জমায়েত)। একজন সাহাবী যিনি নুন্যতম কোন সোহবতে অংশ নিয়েছেন তিনি সকল ওলিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওলি থেকেও শ্রেষ্ঠতর যেহেতু তিনি সাহাবী। আল্লাহর কোন প্রিয় ও কামাল বান্দার সাথে একটিমাত্র সোহবেত ও তাওয়াজ্জুতে যে হাল অনুভব হয়, তার বরকতপুর্ণ দৃষ্টিতে ও নিঃশ্বাসে যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যে ব্যক্তি এই সৌভাগ্যময় নৈকট্যে অনুপস্থিত থাকবে সে কখনো তা বুঝতে পারবে না। সকল সাহাবা কেরামগণ নবিজীর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই **নাফসের (১)** চাহিদাকে প্রশ্রয় দেওয়া হতে সুরক্ষা পেয়েছিলেন। আমরা তাঁদের সকলকে ভালবাসার আদেশ করছি। **সিরাত-উল ইসলাম** বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাগুলোর ভাষ্য মতে;"যে কোনো সাহাবায়ে কারিম আলাইহিম-উর রিদওয়ান সম্বন্ধে মার্জিতভাবে কথা বলো, তাঁদের নিয়ে কখনো মন্দ কথা বলো না।„

[১] **অফুরন্ত নিয়ামত** কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ছত্রিশ নম্বর অধ্যায় দেখুন।

যেহেতু বাহাত্তরটি দলের অনেকে এই বিষয়টিকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে, যেখানে অনেকে একে অবহেলা করছে, অনেকে তাঁদের বিশ্বাসকে অন্তরে পালন করছে যদিও অন্যরা ফিলসফি এবং গ্রীক ফিলসফারদের পিছে পড়ে আছে। এভাবে তারা এমন কিছু পালন করছে যা ইসলামে নেই এবং কিছু কিছু এমনকি ইসলামের বিপরীত। তারা বিদাতকে (বিশ্বাস এবং অনুশীলন যা কখনো ইসলামে ছিল না কিংবা যা ইসলামের বিশ্বাস ও প্র্যাকটিসের নামে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে) আলিঙ্গন করছে। তারা সুন্নাতে ইসলামের অবমাননা করছে। এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব হয়েছে যাদের ইজমার ভিত্তিতে স্বীকৃত ইসলামের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনুহুমা এর উপরে ক্ষোভ পোষণ করে। তাদের এই ক্ষোভ কোন ক্ষেত্রে নবীজির পবিত্র নামকেও পাশ কাটিয়ে যায় না। এমন কিছু মানুষ আছে যারা নবীজির স্বশরীরে এবং আধ্যাত্মিকভাবে **মিরাজের** রাতে জান্নাতে ভ্রমনের বিষয়ে অবিশ্বাস করে। (এটি **Endless Bliss** বইয়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদের ষাট তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে) এটি খুবই আতঙ্কের বিষয় যে বর্তমানে সমসাময়িক কিছু ইসলামিক স্কলার অন্ধভাবে **ইসলামিয়্যা** নামক একটি দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছে। যেটি বাহাত্তরটি দলের মধ্যে সব থেকে ক্ষতিকর। তারা বিভিন্ন লেখা ও ধ্বংসাত্মক মিথ্যা ছড়ানোর মাধ্যমে নিরীহ যুব সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করছে, যেমন তারা বলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বপুরুষ ছিলেন অবিশ্বাসী বা মুশরিক । তারা তাঁদের এই ভুল মতবাদগুলোকে প্রমানের জন্য কিছু শিট বইয়ের আশ্রয় নেয়। এটা পরিষ্কার যে এ পরাজিত মনভাবাপন্ন লোকদের প্রধান উদ্দেশ্য ইসলামকে অবমাননা করা, যুব সমাজের ঈমানকে হরণ করা এবং তাদেরকে অবিশ্বাসী হিসাবে কলঙ্কিত করা।

[১] নাফসের জন্য অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের তেতাল্লিশ নম্বর অধ্যায় দেখুন, [২] মুহাম্মাদ বিন আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হিজরি ৫৭৩) এর ব্যখ্যা লিখিত হয়েছে, ইয়াকুব বিন সাইয়েদ আলি রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি (হি ৯৩১)

কুরআনের একটি আয়াতে কারিমার সারমর্ম; **" একজন ব্যক্তি যদি কুরআনে কারিমকে নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করে তবে সে একজন অবিশ্বাসী**। ইসলামিক স্কলারগনের মধ্যে ছিল আদব বিদ্যমান। তারা অধ্যবসায়ের পর লিখতেন বা বলতেন। তারা প্রচুর চিন্তা করে কিছু বলতেন যেন কোন ভুল না হয়ে যায়।

অসংযত কথাবার্তা যেমন **আদিল্লা-ই-শরিয়া** এর সত্য প্রচারের পরিবর্তে অন্যের ভুল ও নীতিভ্রষ্ট কথাকে ইসলামের নামে প্রচারের প্রয়াস। ইসলামের জ্ঞানের প্রধান চারটি উৎস থেকে সিদ্ধান্ত প্রদান এটা কনো সাধারণ মুসলিমের কাজ নয় এটি কনো ইসলামিক স্কলারের কাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে অজ্ঞদের ওইসব নোংরা ও ঈমান বিধ্বংসী লেখা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা গনের প্রকৃত মহত্ত উপলব্ধি করতে পারেনি।

পারসিয়ান একটি পংক্তি আছে,

"আমি উইলো গাছের পাতার ন্যায় কম্পিত হবো যদি তারা আমার ঈমান ধ্বংস করতে চায়"

আল্লাহ আমাদের সকলের হৃদয়ে তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি ভালবাসা বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ তাঁর শত্রদের ভালবাসার ফাঁদে আটকা পড়া হতে আমাদের রক্ষা করুন। হৃদয়ে ঈমানের লক্ষণ হলো আল্লাহ সুবহানা তায়ালার প্রিয়জনদের প্রতি অন্তরে ভালবাসা থাকা এবং তাঁর শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করা।]

আমলের ক্ষেত্রে চারটি মাযহাব রয়েছে ;সেগুলো হলো- **ইমাম আযম** (আবু হানিফা), ইমাম শাফেই, ইমাম মালিক ও ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহগণের মাযহাব। এগুলোর যে কোনো একটিকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। চারটি মাজহাবই সত্য এবং সঠিক । চারটিই আহলে সুন্নাতের অন্তর্গত। আমরা ইমাম আযমের মাযহাবের অনুসারী। এই মাযহাবের মুসলিমদের বলা হয় **হানাফি**। ইমাম আযমের মাযহাব তাওয়াব (১) এবং সঠিক। এখানে যদি কোন ভুলের সম্ভাবনা থাকে তাহলে অন্য তিনটি মাযহাবও ভুল। আমরা বলি এখানে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাছারা ঈমানের বহনকারীর চিরসহায়ীভাবে বিশ্বাস করা আরও ছয়টি বিষয় রয়েছে;

১। আমাদের গায়েবের উপর ঈমান রয়েছে জাহির বা শুধুমাত্র দৃষ্টিযোগ্য বিষয়ের এর উপর নয় । যেমন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে চর্মচক্ষে দেখতে পাই না।

[১]তাওয়াব বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। যখন কোন নির্দিষ্ট কাজ তাওয়াব এর অর্থ আল্লাহ্ তায়ালা তা পছন্দ করেন এবং এর জন্য পরকালে পুরস্কৃত করবেন।

তথাপি তাঁকে আমরা এমনভাবে বিশ্বাস করি যেন তাঁকে আমরা দেখতে পাই। এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

২। এ মহাবিশ্বে এবং জান্নাতে এ দুই জাহানের মাঝে, সমগ্র মানবজাতি, জিনকুল, ফেরেশতাকুল, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাওয়াত তাসলিমাত) এর মাঝে এমন কেউ নেই যার গায়েব এর বিষয়ে সত্ত্বাগত জ্ঞান আছে। একমাত্র আল্লাহ আজিমুসশানের রয়েছে। তিনি তাঁর পছন্দনীয় সৃষ্টিকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী গায়েবের জ্ঞান অবহিত করেন বা প্রদান করেন। [গায়েব বলতে বোঝায় এমন কিছু কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা হৃদয়াঙ্গম অথবা কোন হিসাব বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। গায়েব শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব যাকে তা প্রদান করা হয়]

৩। হারামসমূহকে হারাম হিসাবে জানা এবং এর প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৪। হালালকে হালাল হিসাবে জানা এবং এর প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৫। তাঁর শাস্তির বিরুদ্ধে নির্বিকার বা সুরক্ষিত অনুভব না করা, সবসময় তাঁকে ভয় করা।

৬। তাঁর ক্ষমা বা অনুকম্পা হতে কখনোই নিরাশ হওয়া যাবে না, যত বড় পাপই তুমি করো না কেন,

কোন ব্যক্তি যদি এই ৬টি শর্তের যে কোনো একটি পরিপূর্ণ না করে কিংবা সে ৫টিই পূরণ করে নি যে কোনো একটি করেছে তবে তাঁর ঈমান সহিহ হবে না।

এখানে আরও চল্লিশটি এমন বিষয় রয়েছে যেগুলো যে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির মুহূর্তেই ঈমান হারানোর কারণ হতে পারে।

১। কোন বিদআতকে ধারন করা। এর অর্থ তাঁর হৃদয়ে ঈমানের ঘাটতি রয়েছে। [আহলে সুন্নাতের দেখান সঠিক পথ ও মত থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি ওই বিপথগামীকে ভুল পথে পরিচালিত দল বা অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি এমন কিছু অস্বীকার করে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক তাহলে সে সাথে সাথেই কাফির হয়ে যায়। **বিদআত অথবা দালালাতে**র বাহকের ঈমান ছাড়া মৃত্যুর কারণও হতে পারে]

২। দুর্বল ঈমান অর্থাৎ আমলহীন (আবশ্যকীয় করনীয় বা ইবাদাত) ঈমান।

৩। নয়টি অঙ্গকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করা।

৪। গুরুতর পাপগুলো নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া, তা বর্জন না করা। [সুতরাং মুসলিম যুবকদের মদ পান করা জায়েজ নয়, মুসলিম নারী বা যুবতীদের নিজেদের মাথা, চুল, উদর কিংবা কব্জি গায়রে মাহরাম (১) পুরুষদের দেখানো জায়েজ নয়।]

[১] মাহরাম এবং গায়রে মাহরাম সম্মন্ধে বিস্তারিত জানতে অফুরন্ত কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন।

৫। ইসলামের কারণে পাওয়া রহমত বা সুখের প্রতি কৃতজ্ঞতা পরিহার করা।

৬। ঈমানহারা হয়ে পরকালের পথে যাত্রাকে ভয় না করা।

৭। নিষ্ঠুর আচরন করা।

৮। সুন্নাতের রীতি বা আচরন দ্বারা বিহিত আযান- ই-মুহাম্মাদ এর প্রতি কর্ণপাত না করা। (কোন ব্যক্তি যদি অনুরুপভাবে দেওয়া কোন আযানকে অবজ্ঞাপূর্ণভাবে উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করে তবে সে সাথে সাথে অবিশ্বাসী হয়ে যায়।) [সুন্নত অনুসরণ করে কোন পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ আযান দিতে হবে তা **'Endless bliss'** বই এর এগারতম স্তবকে বিস্তারিত বর্ণিত আছে]

৯। পিতামাতার অবাধ্যতা করলে। তাদের কোন আদেশ যা ইসলামের বিধানের অনুকুলে কিংবা মুবাহ, এমন কিছু কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলে।

১০। উঠতে বসতে বারবার শপথ করলে যদিও তা সত্য হয়।

১১। নামাযের সময় রুকুতে (নামাযে শরীরকে বাঁকানো), কওমাতে (রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো), দুই সিজদার মাঝে এবং নামাজের জলসায় (দুই সিজদার পরে বসা) তা,দিল-ই- এরকানকে অবহেলা করা। তা,দিল-ই- এরকান বলতে বোঝায় একবার সুবহানাল্লাহ বলতে যে সময় লাগে সেই পরিমান সময় নড়াচড়া না করে স্থির থাকা।

১২। নামাযকে গুরুত্বহীন ইবাদাত মনে করা। নিজে নামায শেখা এবং পরিবারের লোকজন ও শিশুদের নামায শেখানোর ব্যাপারে অবহেলা করা। তাছাড়া অপরকে নামায আদায়ে বাধা প্রদান করা।

১৩। হামর (মদ) পান করা অথবা এমন কড়া পানীয় যা অধিক মাত্রায় পান করলে মদকতা তৈরি করে, মদ সামান্য পরিমান পানের ব্যাপারেও একই আইন প্রযোজ্য।

১৪। কোন মুমিনকে কষ্ট দেওয়া বা বিপদে ফেলা।

১৫। ।নিজেকে একজন ওলি বা ইসলামি পণ্ডিত হিসাবে লোক দেখানো মিথ্যা প্রচার করা। আহলে সুন্নাতের শিক্ষা অর্জন না করে নিজেকে ধার্মিক ও ইসলামের প্রচারক হিসাবে জাহির করা। [এরুপ মিথ্যাবাদীদের লিখিত বই আমাদের পড়া উচিত নয়। তাদের আলোচনা সভা কিংবা বক্তৃতা সভায়ও যাওয়া উচিৎ নয়।]

১৬। কারও পাপাচারকে ভুলে যাওয়া এবং একে হালকাভাবে নেওয়া।

১৭। ঔদ্ধত্য বা দাম্ভিকতা, নিজেকে নিয়ে খুব বেশি গর্ব করা।

১৮। উযব,(আত্ম প্রশংসা), কেউ তার নিজের শিক্ষা ও ধার্মিকতা নিয়ে নিজের প্রশংসা বা তারিফ করা।

১৯। মুনাফিক হয়ে যাওয়া, কপটতা ভণ্ডামি বা দ্বিমুখী চরিত্রের ধারন ।

২০। লোভ-লালসা, অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হওয়া।

২১। সরকারের আদেশ অমান্য করা অথবা তার মনিবের আদেশ অমান্য করা যদি তা ইসলামের বিধানের বাইরে না যেয়ে থাকে। তাদের যে আদেশগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে যায় তার বিরোধিতা করা উচিত।

২২। কোন রকম যাচাই বাছাই না করেই বলা যে অমুক অমুক খুব ভালো ব্যক্তি।

২৩। মিথ্যাবাদী হওয়া।

২৪। ইসলামিক পণ্ডিত বা আলেমদেরকে এড়িয়ে চলা। (আহলে সুন্নাতের আলেমদের লিখিত কিতাবসমুহ না পড়া)

২৫। সুন্নতের পরিসীমার বাইরে মোচকে অনেক বেশি লম্বা করা।

২৬। পুরুষদের সিল্ক এর পোশাক পরিধান করা। তবে সিনথেটিক সিল্ক কিংবা ধাতুর কাজ বা সুতি তাতের বোনা সিল্ক মিশ্রিত পোশাক পরিধানের অনুমতি রয়েছে।

২৭। স্বভাবসিদ্ধ পরনিন্দাকারী বা কুৎসা রটনা করা।

২৮। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, যদিও সে অমুসলিম হয়ে থাকে।

২৯। দুনিয়াবী বিষয়াদির উপর খুব বেশি রাগ প্রকাশ করা।

৩০। ঘুষ দেওয়া কিংবা নেওয়া।

৩১। অহংকারবসত পায়জামা কিংবা পোশাকের পায়ের কাছের কিনারা খুব বেশি লম্বা রাখা।

৩২। জাদুটোনা প্র্যাকটিস করা।

৩৩। কোন ধার্মিক (সালিহ) মাহরাম আত্মীয়ের সাথে কখনো সাক্ষাত বা দেখা করতে না যাওয়া।

৩৪। আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে অপছন্দ করা এবং এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করা যে ইসলামের ক্ষতি সাধনরত।

৩৫। কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অন্তরে তিন দিনের বেশি শত্রুতা পোষণ করা।

৩৬। ব্যভিচারকে অভ্যাসে পরিনত করা।

৩৭। সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া এবং এ থেকে তওবা (১) না করা।

৩৮। ফিকহের কিতাবসমুহে উল্লেখিত সময়ে আযান না দেওয়া, সুন্নত পদ্ধতি অনুসরণ না করে আযান দেওয়া এবং সুন্নত পদ্ধতিতে প্রদানকৃত আযানকে সম্মান প্রদান না করা।

[১] কোন পাপের জন্য তওবা করা বলতে বোঝায়, এর জন্য অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুনরায় না করার ব্যপারে প্রতিজ্ঞা করা।

৩৯। কোন ব্যক্তিকে মুনকার (হারাম) কাজ করতে দেখেও `নেহি, (নাহি) পালন না করা [ওই কাজ থেকে তাকে বিরত করার চেষ্টা না করা] মার্জিত ভাষা ব্যাবহারের মাধ্যমে যদিও তার এটা করার ক্ষমতা থাকে।

৪০। যে সব নারীদের উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে অধিকার আছে যেমন মা, বোন। তাদেরকে ইসলাম বর্জিত কাজ করতে দেখেও নিষেধ না করে তা উপেক্ষা করা। যেমন তাদের মাথা, বাহু, পা এবং দেহের অন্যান্য অংশ পরিপূর্ণভাবে না ঢেকে কিংবা গহনা সজ্জিত বা সুবাস ব্যবহার করে বাহিরে বের হওয়া।

ঈমান- অর্থ নবীদের উপরে আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত বিষয়সমুহের জবানের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের সমর্থন।

দ্বীন এবং **মিল্লাত- দ্বীন** এবং **মিল্লাত** ইতিকাদ বা বিশ্বাসের ভিত্তি, যা নবীজি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন।

ইসলাম অথবা **আহকামে ইসলামিয়া-** অর্থ সে সকল বিধিবিধান অনুসরণ করা যা যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে এনেছেন।

ঈমানে ইজমালি- অর্থ এর বিশদ বিশ্বাসই যথেষ্ট। ঈমানের বিষয়গুলো বিস্তারিত জানা জরুরী। একজন মুকাল্লিদের ঈমান বলতে বোঝায়, একজনের বিশ্বাস, না বুঝেও সহিহ, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তারিত প্রয়োজন। ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে, **ঈমান এ তাক্লিদি**, **ঈমানে ইস্তিদলালি** এবং **ঈমান এ হাকিকি**।

ঈমানে তাক্লিদি- এই স্তরের ঈমান থাকা ব্যক্তি, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব জানেন না। তারা তাদের পিতামাতাকে অনুসরণ করে। এই ধরনের ঈমান অনিরাপদ।

ঈমানে ইস্তিদলালি- এই স্তরের ঈমানদার ব্যক্তি, ফরজ ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং হারামসমুহ জানে এবং ইসলামকে অনুসরণ করে। তারা বিশ্বাসের এবং রীতিনীতি পালনে জ্ঞানের অধিকারী এবং যোগাযোগ রক্ষা করে। তারা এগুলো ধর্মীয় পুস্তক এবং শিক্ষকগণের কাছ থেকে শিখেছে। এদের ঈমান খাটি।

ঈমানে হাকিকি- যদি সমগ্র সৃষ্টি এক হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তায়ালার বিরোধিতা করে তবুও এই স্তরের ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি তার রবের বিরোধিতা বা অস্বীকার করবে না। তাদের অন্তরে কিঞ্চিত পরিমানেও সন্দেহ থাকবে না। আম্বিয়াদের ঈমান এই স্তরের ঈমান হিসাবে চিহ্নিত। এই স্তরের ঈমান অন্য দুই স্তরের ঈমান অপেক্ষা শ্রেয়। শুধুমাত্র ঈমান একাই যথেষ্ট জান্নাতে প্রবেশের জন্য। তবে শুধুমাত্র আমলের দ্বারা যাওয়া প্রশ্নবিদ্ধ। আমল ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য। ঈমান ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমান ছাড়া ভালো কাজ, সৎ কাজ, দান করা ইত্যাদি তাদের পরকালে কোন উপকারে আসবে না। ঈমান কখনো কাউকে দান করা বা উপহার দেওয়া যায় না তবে উপার্জিত সওয়াব দান বা উপহার দেওয়া যায়। কেউ তার শেষ ইচ্ছায় ঈমান বিষয়ে কোন পরামর্শ দিতে পারে না। তবে কেউ তার বংশধরদের তার মৃত্যুর পর তার নামে আমল করার কথা ওসিয়াত করতে পারে। যে আমলকে অবহেলা করবে সে অবিশ্বাসী হবে না। তবে যে ব্যক্তি ঈমানের কোন বিষয়কে অবমাননা বা অস্বীকার করবে বা আমলকে হালকাভাবে নিবে সে একজন অবিশ্বাসী। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ওজর এর কারণে আমল হতে অব্যহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু কোন উপায়েই সে ঈমান হতে অব্যহতি লাভ করবে না। ঈমান একটিই যা সকল নবীগণ তাঁদের উম্মাতের মাঝে প্রচার করছেন। তবে তারা একে অপর থেকে আলাদা হয় তাঁদের নিয়মাবলি, প্র্যাকটিস এবং প্রকৃতির উপরে। তাছাড়া দুই ধরনের ঈমান রয়েছে, একটি ঈমানে খিলকি এবং অপরটি ঈমানে কেসবি।

ঈমানে খিলকিস হলো **আহাদে মিসাক** এর সময়ে সকল জীবন প্রাপ্ত বান্দারা বলে, **বালা অর্থাৎ হ্যাঁ**। [১] **ঈমানে কেসবি** হলো সেই ঈমান যা বালেগ হওয়ার পর অর্জন করতে হয়। সকল বিশ্বাসীদের ঈমান একই। তারপরও তা আমলের কারণে পরিবর্তিত হয়।

ঈমান **ফরযে দাইম** অর্থাৎ সকল সময়ের জন্য ফরয অপর পক্ষে আমল হল ফরয যখন সময় আসে। ঈমান সকল মুসলিম এবং অমুসলিমদের জন্য ফরয আর আমল শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য ফরয।

ঈমানের আটটি শ্রেণি রয়েছে-

ঈমান এ মেতবু- ফেরেশতাগণের ঈমান।

ঈমান এ মাসুমি- নবীগণের ঈমান।

[১] পুনরুত্থান এবং পরকাল নামক কিতাবের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঈমান-ই-মাকবুল- হলো বিশ্বাসীদের ঈমান।

ঈমান-ই-মাওকুফ- এটি বিদআত পালনকারীদের সংশয়পূর্ণ ঈমান।

ঈমান-ই-মারদুদ- এটি মিথ্যা বা কপট ঈমান যেটি মুনাফিকরা ঈমান হিসাবে দাবি করে থাকে।

ঈমান-ই-তাকলিদি- এটি হলো তাদের ঈমান যারা তাদের বাবা মা অথবা নিজেদের পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছে কিন্তু কোন ইসলামি আলেমের কাছ থেকে জেনে ঈমান পালন করছে না। তাদের এই ঈমান সংশয়পূর্ণ ও বিপজ্জনক।

ঈমান-এ-ইস্তিদলাল- যে দলিল প্রমানের উপর ভিত্তি করে স্রষ্টার অস্তিত্ত ও সম্মন্ধে জানে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

ইমান-এ-হাকিকি- এই ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি যদি সমগ্র সৃষ্টিকুল ও স্রস্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তবুও সে তার রবকে অস্বীকার করে না। এবং এই ব্যক্তির হৃদয়ে কোন ধরনের ক্ষুদ্রতম সন্দেহের অস্তিত্ব থাকে না।যেহেতু এই বিষয়ে এখানে পূর্বে আলোচনা হয়েছে, সুতরাং এই ব্যক্তির ঈমান সর্বোত্তম ঈমান।

ঈমান তিনটি বিষয় বহন করেঃ

প্রথমত- এটি কারো গর্দানকে তলোয়ারের নিচে যাওয়া হতে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত- এটি কারো সম্পদকে জিজিয়া ও খারাজ থেকে মুক্ত করে।

তৃতীয়ত- ঈমান কাউকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ দেয়।

”আমানতুবিল্লাহি„এর সম্মান ও মর্যাদার কারণে একে সিফাত-ই-ঈমান, অথবা জাত-ই- ইমান বলা হয়। (ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রচলিত ব্যাখ্যা **”ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসুলুহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়া বিল ক্বাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা,লা ওয়াল বা,সি বা,দাল মাওত। হাক্কুন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্ললাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু„)**

ঈমানের দুটি কারণও রয়েছেঃ

সকল সত্তাকে সৃষ্টি এবং কুরআন অবতরণ।

আরো **দুই ধরনের** দলিল রয়েছেঃ

দলিল-ই-আকলি (মনস্তাত্ত্বিক দলিল) এবং দলিল-ই- নকলি (প্রথাগত বা প্রচলিত দলীল)

[১] দয়া করে অশেষ রহমত কিতাবের এগারতম এবং বিশ তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন, ২৩ নম্বর অধ্যায়ের ৪ নম্বর পরিচ্ছেদ, ১ এবং ১২ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নম্বর পরিচ্ছেদ, ৬ নম্বর অধ্যায়ের ১ নম্বর পরিচ্ছেদ দেখুন যিযিয়া এবং খয়ারায এর জন্য।

ঈমানের রয়েছে **দুটি রুকন (নীতি):**

ইকরার বিল লিসান (মৌখিক ঘোষণা) এবং তাসদিক বিল জেনান (অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা)। তাছাড়া এক্ষেত্রে এগুলোর উপরে আরও দুটি শর্ত আরোপিত রয়েছে;

অন্তর দ্বারা ঈমানের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অবশ্যই সকল রকম সন্দেহ বা দ্বিধা মুক্ত থাকতে হবে এবং মৌখিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সে যে বিষয়ে জবানী স্বীকৃতি দিয়েছে তার উপর অটল ও সচেতন থাকা। ঈমান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত হিদায়েত। সেই হিসাবে এটি কোন সৃষ্টি নয়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জন্মগতভাবে তার বান্দাদের এক ধরনের স্বীকারোক্তি বা ঘোষণা।

ঈমান কি সমবেত কোন বিষয়, একক কিছু অথবা এর কোন বহুত্ব আছে? অন্তরের দিক বিবেচনায় ঈমান সমষ্টিগত বা যৌথ বিশ্বাস, দৈহিক অঙ্গপ্রতঙ্গের ভুমিকার ভিত্তিতে এটি বহুত্তপুর্ণ।

ইয়াকিন- দ্বারা বোঝায় আল্লাহ আজিমুসশান এর কামাল জাত বা গুণাবলীসমূহ জানা।

খাওফ- বলতে বোঝায় আল্লাহ আজিমুসশান এর প্রতি ভীতি।

রেযা- অর্থ আল্লাহ সুবহানা তায়ালার রহমতের (ক্ষমা, দয়া) উপর কখনো আশা ছেড়ে না দেওয়া। তিনি ক্ষমাশীল তার রহমত মাগফেরাত সব সময় আমাদের জন্য উন্মুক্ত।

মুহাব্বাতুল্লাহ হলো ভালবাসা ও আকর্ষণ। আল্লাহ সুবহানা তায়ালার প্রতি তার রাসুলের প্রতি ও ইসলামিক বিশ্বাস ও বিশ্বাসীদের প্রতি।

হায়া- আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর সামনে নিজেকে নগণ্য মনে করা, নমনীয় থাকা।

তওয়াককুল- প্রতিটা বিষয়ে আল্লাহ সুবহানা তায়ালার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা। কোন কাজ শুরুর পুর্বে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

ঈমান, ইসলাম এবং ইহসান বোঝায়ঃ

ঈমান- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখা।

ইসলাম-বলতে বোঝায় আল্লাহু আজিমুসশান হতে বর্ণিত আদেশসমুহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধসমুহ হতে বিরত থাকা।

ইহসান-অর্থ তাঁর ইবাদাতের সময় বিষয়গুলো এমনভাবে পালন করা যেন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে সামনাসামনি দেখছো।

ঈমান- এর আভিধানিক অর্থ `প্রকৃত বা নিশ্চিত স্বীকৃতি,। ইসলামের পরিভাষায় ছয়টি বিষয়ের উপর এই স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

[১] তওয়াককুলের বিস্তারিত **অফুরন্ত নিয়ামত** কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের পয়ত্রিশতম অধ্যায়ে রয়েছে।

মা,রিফাতঃ এর অর্থ আল্লাহ সুবহানা তায়ালার কামাল গুনাবলিসমুহ অর্জনের জন্য তাকে জানা এবং অপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে নিজেকে দূরে রাখা।

তাওহিদ- আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক না করা। এই বিশ্বাস সমুহের উপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অটল থাকা।

ঈমান ৫ টি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিতঃ

১- ইয়াকিন,

২- ইখলাস,

৩-ফরযসমূহ আদায় করা এবং হারাম পরিহার করা,

৪-সুন্নাতের প্রতি আনুগত্য,

৫- আদবের উপর দৃঢ় থাকা এবং এর প্রতি সতর্ক ও মনযোগী হওয়া।

যে ব্যক্তি এই ৫ টি বিষয়ের উপর অটল থাকাবে সে তাঁর নিজের ঈমানের উপরও অটল থাকবে। এর যে কোন একটি দুর্গের প্রতি সামান্য অবহেলা শত্রু কর্তৃক আক্রমন তরান্বিত করবে।

মানুষের চারটি প্রধান শত্রু রয়েছে ;

তার ডানে রয়েছে খারাপ সঙ্গ, বামে রয়েছে নাফসের কামানা বাসনা, সামনে রয়েছে দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং তার পিছেই শয়তান। এই চারটি শত্রু সর্বদা তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট। খারাপ সঙ্গ বলতে শুধু তাদেরকেই বোঝায় না যারা কারো সম্পত্তি, অর্থ বা দুনিয়াবি জিনিসে ধোঁকা দেয়। সব থেকে মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর সঙ্গ হলো সেই ব্যক্তি যে অন্যের বিশ্বাস, ঈমান, আদব, হায়া এবং সাধারন মূল্যবোধ এর বিষয়গুলো ধংস করার চেষ্টা করে। এবং এভাবে সে অন্যের দুনিয়াবি সুখ শান্তি এবং পরকালীন শান্তি হতে তাকে বঞ্চিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে এরকম অসৎ ও ক্ষতিকারক সঙ্গ এবং ইসলামের শুত্রুদের কবল হতে হেফাযত করুক।

কালিমায়ে তাওহিদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পবিত্র অর্থ হলো, " আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য অন্য কোন মাবুদ বা স্রষ্টা নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বদা বর্তমান। তার কোন শরীক (অংশীদার) অথবা নযির (সমতুল্য, অনুরুপ) নেই। তিনি স্থান ও কালের উর্ধে।

"মুহাম্মাদুন রাসুলুল্লাহ„ দ্বারা বোঝায়, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ সুবহানা তায়ালার অনুগত বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত প্রকৃত রাসুল বা বার্তা বাহক। আমরা তাঁর উম্মত, আলহামদুলিল্লাহ।

কালিমায়ে তাওহীদের আটটি নাম রয়েছে-

১-কালিমা-এ-শাহাদাত,

২-কালিমা-এ-তাওহিদ,

৩-কালিমা-এ-ইখলাস,

৪-কালিমা-এ-তাকওয়া,

৫-কালিমা-এ-তাইয়্যিবা,

৬-দাওয়াত-উল-হাক্ক,

৭-উরওয়া-তুল-উথউয়া,

৮-কালিমা-এ-দেমারেত-উল-জান্নাত।

ইখলাসের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজনঃ

নিয়্যত করা (ইচ্ছা), এর অর্থ জানা, এবং পরিপূর্ণ ভক্তি ও সম্মানের সাথে এটি পাঠ করা বা মুখে উচ্চারন করা।

জিকির করার ক্ষেত্রে ৪ টি বিষয় লক্ষণীয়; তাসকিদ, তা,যিম, হালাওয়্যাত এবং হুরমাত।

যে ব্যক্তি তাসকিদ কে বর্জন করবে সে মুনাফিক, তা,যিম পরিত্যাগকারি একজন বিদআতী, যে হালাওয়্যাত পরিহার করল সে ভণ্ড এবং যে হুরমাত বর্জন করল সে ফাসিক। আর এগুলোর অস্বীকারকারী একজন অবিশ্বাসী।

তিন ধরনের যিকির রয়েছে-

১-যিকির-এ-আওয়াম,

২-যিকির-এ-খাওয়াস,

৩-যিকির-এ-আকহাস,

যিকির এ আওয়াম হলো অশিক্ষিত লোকজনের যিকির। যিকির-এ-খাওয়াস ইসলামিক আলেমদের প্রণীত যিকির, এবং যিকির-আকহাস হলো নবীজী কর্তৃক প্রণীত যিকির।

যিকির এর জন্য মানবদেহে রয়েছে ৩টি অঙ্গ;

১-জিহবা দ্বারা করা যিকির; কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা।

২-তাওহিদ এবং তাসবিহ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত করা।

৩-অন্তর দ্বারা করা যিকির।

অন্তর দ্বারা করা হয় এরুপ ৩ ধরনের যিকির রয়েছে

১-আল্লাহ আজিমুসশান এর গুণাবলী প্রদর্শনকারী দলীল ও নিদর্শন সমূহ নিয়ে ধেয়ান বা চিন্তা করা।

২-আহকামে ইসলামিয়্যার দলীল সমুহের উপরে ধেয়ান বা স্মরণ করা।

৩-আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা করা।

তাফসিরের আলেমগণ সুরা বাকারার একশত বায়ান্ন নম্বর আয়াতের বর্ণনায় বলেছেন, কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, **“হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যদি তায়াত (আনুগত্বের সহিত) এর সহিত আমাকে স্মরণ করো আমার যিকির করো তাহলে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। তোমরা যদি আমাকে দোয়ার মাধ্যমে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে ইযাবাতের (প্রার্থনা পুরণের) মাধ্যমে স্মরণ**

করবো। এবং তোমরা যদি আমাকে তাআত এর সহিত স্মরণ করো আমিও তোমাদের নাইম (জান্নাত) এর মাধ্যমে স্মরণ করবো। তোমরা যদি একাকি বা নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমার যিকির করো আমিও জামায়াতে কুবরার (মাহশের) মাধ্যমে তোমাদের স্মরণ করবো।তোমরা অভবগ্রস্থ অবস্থায় আমাকে স্মরণ করলে আমি আমার সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদের স্মরণ করবো। আমাকে যদি ইয়াযাতের সাথে স্মরণ করো আমিও তোমাদের হেদায়েতের মাধ্যমে স্মরণ করবো। আমাকে যদি সিদক এবং ইখলাসের সাথে স্মরণ করো বিনিময়ে আমি তোমাদের খালাস এবং নাজাতের (মুক্তি) মাধ্যমে স্মরণ করবো। এবং তোমরা যদি আমাকে ফাতিহা–এ– শরিফ, বা এর অন্তর্নিহিত রুবুবিয়্যাত এর সাথে আমার যিকির করো তাহলে আমি আমার রহমতের মাধ্যমে তোমাদের স্মরণ করবো।

তাছাড়া ইসলামিক আলেমগণ যিকিরের শত শত ফায়দা উল্লেখ করেছেন। এখানে তার ভিতর থেকে কিছু তুলে ধরা হলো।

যখন কোন ব্যাক্তি যিকির করেন আল্লাহ আজিমুসশান তার প্রতি সন্তুষ্ট ও রাজি হয়ে যান।

ফেরেশ্তাগন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। শয়তান অসন্তুষ্ট হয়। যিকিরকারির কলব স্নেহপূর্ণ ও কোমল হয়ে যায়। সে নিজ ইচ্ছায় এবং উৎসাহের সাথে ইবাদত পালন করে। যিকির তাদের কলবের থেকে দুঃখ দূর করে দেয়, কলব কে প্রফুল্ল রাখে এবং তাদের মুখ নুর দ্বারা আলকিত করে দেন। সেই ব্যক্তি সাহসিকতা এবং আল্লাহর মুহাব্বাত অর্জন করে। আল্লাহর মা,রেফাতের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, যাতে করে সে আউলিয়া কিরামগনের ফয়েয লাভ করতে পারে। তারা ষাটটির মত আখলাকে-হামিদার অধিকারী হন।

”আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু,, এর বরকতপুর্ণ অর্থ হল, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম, আখেরি যামানার নবী, আল্লাহর অনুগত বান্দা ও তার প্রিয় রাসুল।

তিনি খাদ্য এবং পানীয় গ্রহন করতেন, এবং তিনি সম্মানিতা নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র এবং কন্যা সন্তান ছিল। যাদের সবাই ছিলেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর গর্ভ হতে। শুধুমাত্র ইব্রাহিম ছিলেন

মারিয়া নামক জারিয়ার গর্ভজাত। এবং সে বালেগ হওয়ার পূর্বেই মারা যান। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু ব্যতিত তাঁর সকল সন্তানই তাঁর নিজের মৃত্যুর পূর্বে মারা যান। তিনি হযরত আলি রাদিয়াল্লাহকে বিবাহ করেন। হযরত হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তাঁদের সন্তান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইস সালাম এর সকল কন্যাদের মাঝে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ এর অবস্থান ছিল সবার উপরে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সব থেকে বেশি স্নেহভাজন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের এগারো জন সম্মানিতা স্ত্রী ছিল, হযরত খাদিজা, সাওদা, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা, উম্মে হাবিবা, জইনব বিন্তে জাহাশ, জইনব বিন্তে হুজাইফা, মাইমুনা, যুয়্যাইরিয়া, সাফ্যিয়া রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু।

আদিল্লাহ-এ-শরিয়া চারটি; কিতাব, সুন্নাত, ইযমা-এ-উম্মাত এবং কিয়াস-এ-মুজতাহিদ। ইসলামিক আলেমগণ এই চারটি উৎস থেকে ইসলামি জ্ঞানসমূহ আহরন করে থাকেন। আল্লাহ সুবহানা তায়ালার বানীসমূহই কিতাব, সুন্নাত বলতে বোঝায় ক,ওল-এ-রাসুল (আল্লাহর রাসুলের বাণী), তাক,রির-এ-রাসুল (তাঁর অনুমোদন বা সমর্থন)। ইযমা-এ-উম্মাত বলতে বোঝায়, একি শতাব্দীর মুজতাহিদ গনের কোন বিষয়ের উপর ঐক্যমতকে, যেমন সাহাবী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুগণ বা চার মাজহাবের ইমামগণের কোন বিষয়ের উপর ঐকমত। কিয়াস হল মুজতাহিদগনের দ্বারা দুটি ভিন্ন বিষয়ের উপর পৌঁছানো সিদ্ধান্ত।

মাজহাব এর আভিধানিক অর্থ পথ। আমাদের রয়েছে দুইটি পথ, একটি হলো ইতি,কাদ বা বিশ্বাস এর পথ এবং অপরটি হলো আমল বা ইবাদাত অনুশীলনের পথ।

আমাদের ঈমান, পথ প্রদর্শক কিংবা ইতি;কাদ এর পথ হলও আবু মান্সুর মাতুরিদি রাহামাহুল্লাহু তায়ালা। তাঁর পথকে বলা হয় **আহলে সুন্নাহ**। আমলের ক্ষেত্রে আমাদের গাইড হলো ইমাম এ আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা। তাঁর পথ কে বলা হয় **হানাফি মাযহাব**।

আবু আইয়্যুব মাতুরিদি এর নাম মুহাম্মাদ, তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ, তাঁর পিতামহের নাম মুহাম্মদ এবং তাঁর শিক্ষকের নাম আবু নাসের ই ইয়্যাদ রাহিমাহুমুল্লাহ তায়ালা।

আবু নাসের ই ইয়্যাদ এর শিক্ষক ছিলেন আবু বকর এ জুরজানি, তাঁর শিক্ষক ছিলেন আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ শেইবানি(শাইবানি),এবং এনাদের দুই

জনের শিক্ষক ছিলেন ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুমুল্লাহ। সুতরাং ইমাম আজম আবু হানিফা আমাদের ইতিকাদ এবং আমল উভয় মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রদর্শক বা গাইড।

সকল মুসলিমের অনুসরণীয় আদর্শ, ইমান বা গাইড তিনটি; এগুলো জানা আমাদের জন্য ফরয। প্রথমেই কুরান এ কারিম আমাদের ইমান ,যা আমাদের অবশ্য পালনীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহ সম্মন্ধে আদেশ প্রদান করে। সকল মুসলিমের তিনজন ইমাম রয়েছে,তাঁদের জানা ফরজ। আমাদের ইমাম কুরআন আল কারিম যা সকল বিধি এবং নিষেধ বর্ননা করেছে। আমাদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি আমাদেরকে ইসলাম সম্মন্ধে জানিয়েছেন। আমাদের ইমাম মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক যিনি এগুলো প্রতিষ্ঠাপনে গুরুত্ব দেন এবং এগুলো জারি করেন। ইমাম আযম এর শিক্ষকের নাম হাম্মাদ, যার শিক্ষক ইব্রাহিম নেহাই , যার শিক্ষক আল্কামা বিন কায়েস যিনি একই সময়ে হযরত নেহাই এর মামা ও ছিলেন। হযরত আলকামা এর শিক্ষক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাহিমা হুমুল্লাহি তায়ালা, যিনি শিক্ষা গ্রহন করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্ললাহু আলাইহি সাল্লাম জ্ঞান অর্জন করেছেন আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা থেকে। আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা মানব জাতিকে চারটি রত্ন দান করেছেন, আকল, ঈমান, হায়া এবং ফিল অর্থাৎ আমলে সালিহ। এবং আমল এবং ভালো কাজ কবুল হবে পাঁচটি শর্তে, ইমান, ইলম, নিয়্যাত, ইখলাস, কারো অধিকার হরন না করা। সর্বপ্রথম তাকে আহলে সুন্নাহ এর উপরে বিশ্বাস আনতে হবে এবং ইবাদত পরিপূর্ণ এবং সুন্দর হওয়ার শর্ত সমূহ জানতে হবে। [একটি আমল সহিহ হওয়া এবং এটি কবুল হওয়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ইবাদাতের কিছু শর্ত এবং ফরাইজ রয়েছে এগুলো সহিহ হওয়ার জন্য। এর কোন একটি বাদ গেলে ইবাদাত সহিহ হবে না। এটি যেন এমন যে এইবাদত পালন করা হয় নি এবং সে পরকালের আজাব থেকে মুক্তি পাবে না। তবে কোন আজাব হবে না যে ইবাদত সহিহ ছিল কিন্তু কবুল হয় নি। এক্ষেত্রে মুসলিম তার ইবাদত কবুল না হওয়ার কারণে সওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। কোন ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথমে তাকে সহিহ হতে হবে এবং অন্য পাঁচটি শর্ত পুরুণ হতে হবে।

ইমাম রব্বানি রাহিমুহুমুল্লাহ তায়ালা তার অসামান্য অবদান **মাকতুবাত** এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৭ নম্বর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

[১] "কেউ যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর দেখানো আমল অনুসারে আমল করে কিন্তু কোন কুল এর দানা পরিমান অধিকার হরণ করে সে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না । ইবনে হাজার মাক্কি রাহিমু হুমুল্লাহ তায়ালা তার কিতাব **জাওজির** এ একশত সাতাশী টি কবিরা গুনাহ উল্লেখ করেছেন। সুরা বাকারার একশত অষ্টাশি নম্বর আয়াতে রয়েছে, **"হে বিশ্বাসীরা ! বাতিল পন্থায় একে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ কর না**„

এই বাতিল পন্থা বলতে বোঝানো হয়েছে, সুদ, জুয়া, চুরি, ধোকা, মিথ্যা সাক্ষী, চাদাবাজি, রাহাজানি। কিছু হাদিসে শরিফে এসেছে, " **একজন মুসলিম যে তার জন্য হালাল সম্পদ ভোগ করে, ফরজ মেনে চলে, হারাম এড়িয়ে চলে, এবং অন্যের ক্ষতি করে না সে জান্নাতে যাবে এবং " যে শরির হারাম ভোগ করবে তা জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। এবং " কোন ব্যক্তির কর্ম হারাম থেকে যদি লোকেরা নিরাপদ না থাকে তবে ঐ ব্যক্তি তার নামায এবং জাকাতের কোন বিনিময় পাবে না। " কোন ব্যক্তির পরিধেয় জিল্বাব যদি হারাম উপায়ে অর্জিত হয় তবে তার নামায কবুল হবে না„**

[জিল্বাব অর্থ মেয়েদের পরিধেয় এক ধরনের মাথার স্কার্ফ। অন্য ধরনের জিল্বাব হোলো লম্বা কাপড় যা পুরুষেরা পরিধান করে। অনেকের মতে যারা তর্ক করে যে প্রকৃত জিল্বাব হলো মেয়েদের পরিধেয় চারশাফ বা স্কার্ফ, হাদিসে শরীফ প্রমান করে যে পুরুষেরাও জিলবাব পড়ে। এই ধরনের ধরনের তর্ক অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। একটি হাদিসে শরীফ যা তিনি তার ২২ টি পাপ কাজের প্রতিকারের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, **"যে ব্যক্তি যৌন বা ব্যভিচার জিনিস বিক্রয় করে সে আমাদের সমাজের নয়**। দুইশত দশ তম পাপের বর্ননায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন,

"জাহান্নাম সেই ব্যক্তির লক্ষ্য যার জিহবা এবং দ্বারা প্রতিবেশি কষ্ট পায় যদিও সে নামায রোজা করে এবং দান করে। যদি কারো প্রতিবেশি অমুসলিমও হয় তবুও দায়িত্ব তাদের ক্ষতি না করা, তাদের প্রতি দয়া দেখানো এবং উপকার করা।তিনশত তের তম পাপ কাজের বর্ণনায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, **" যে ব্যক্তি শান্তি চলাকালে কোন অমুসলিমকে অবৈধ ভাবে হত্যা করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না**„ অন্য হাদিসে রয়েছে, যখন দুই মুসলিম দুনিয়াবি কারনে যুদ্ধ করে এবং হত্যাকারী এবং যে খুন হলো কেউই জান্নাতে যাবে

না। **অফুরন্ত নিয়ামত** [১] কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের পনেরো অধ্যায়ের তৃতীয় চিঠিতে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, **"যে ব্যক্তি লোকদের উপরে কঠোর ছিল সে বিচার দিবসে এর শাস্তি ভোগ করবে**„

হাদিসে এসেছে তিন ধরনের ব্যক্তির দুয়া কবুল হয়, **আহত ব্যক্তি, অতিথি এবং পিতামাতা**। অন্য এক বর্ণনায়,একজন মজলুমের দুয়া কবুল করা হবে যদিও সে অবিশ্বাসী বা কাফির হয়। চারশত দুই নম্বর গুনাহের বর্ণনায় বর্ণিত হাদিস, **"যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে হত্যা করে সে আমাদের সমাজের নয় যদিও সেই বন্ধু অমুসলিম„।** চারশত নয় নম্বর গুনাহের বর্ণনায় একটি হাদিস রয়েছে, **" সকল পাপের ভিতরে নিজ সরকারের বিরুদ্ধচারণ করার গুনাহের শাস্তি সব থেকে দ্রুত প্রদান করা হয়**„ এখানেই **জাওজাতি**র অনুবাদ শেষ করা হল।

ও মুসলিম ! তোমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালার রহমত পেতে চাও এবং তোমাদের ইবাদত কবুল করতে চাও উপরের হাদিসগুলো অন্তরে প্রতিস্থাপিত করো, কারও সম্পদ, জীবন কিংবা অধিকারে আক্রমন করো না, মুসলিম অমুসলিম যেই হোক না কেন! কাউকে আঘাত করো না! মানুসকে তাদের অধিকার প্রদান করো। এটি অধিকার যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে মোহর (১) প্রদান করবে । যে নারীর সাথে তার বিচ্ছেদ হবে এবং সে এটি আদায় না করলে দুনিয়া এবং আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি লাভ করবে । যদি কেউ অন্যদের ইসলামের শিক্ষা গ্রহণে বা ইবাদতে বাধা প্রদান করে তবে এর অর্থ সেই ব্যক্তি অবিশ্বাসী এবং ইসলামের শত্রু। এর একটি উদাহরণ হলো, আহলে সুন্নাহ এর শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা করা এবং এর বিপরীতে মাযহাব ছাড়া বিদআত ছড়িয়ে দিতে ভুল শিক্ষা প্রদান এবং পুস্তক রচনা । সরকারের এবং আইনের বিপরীতে অবস্থান নিও না। নিজের ট্যাক্স আদায় কর। **বেরিকা** (যা লিখিত মুহাম্মাদ বিন মুস্তাফা হাদিমি রাহিমাতুল্লাহ তায়ালা হিজরি, ১১৭৬ / ১৭৬২ খ্রি) নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান এটি একটি গুনাহের আচরণ। এমনকি যদি তুমি দারুল হারবের অধিবাসিও হও তবুও তাদের আইন বা নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করো না। ফিতনা তৈরি করো না।

[১] **অফুরন্ত নিয়ামত** কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের বার তম অধ্যায় এবং ষষ্ঠ খণ্ডের পনেরো অধ্যায় দেখুন।

বলা হয়েছে যারা ইসলামকে আক্রমণ করে, বিদাতের অধিকারী এবং চার মাজহাবের যে কোন একটিতে নেই তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা । তাদের কিতাব বা সংবাদপত্র পড়া যাবে না। তাদের রেডিও এবং টেলিভিশনরে প্রোগ্রাম ঘরে প্রবেশ না করানো। যারা আমাদের কথা শুনবে তাদের **আমলে মারুফ** করা। অর্থাৎ সৎ উপদেশ দেওয়া। অন্য কথায় তাদের হাসি মুখে মিস্টিভাবে উপদেশ দেওয়া। নিজের সুন্দর ব্যবহার দ্বারা আশপাশের সকলের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা। [১] ইবনে আবেদীন রাহিমা হুমুল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন প্রথম খন্ড সেভাতাইন, [২] আমাদের লজ্জা স্থান আমাদের আওরাতের অধীনে সকল মজহাব অনুযায়ী। চার মাজহাবেই এগুলো ঢেকে রাখা ফরজ। যে এটি করবে না সে অবিশ্বাসী হয়ে যাবে। হাঁটু উন্মুক্ত ব্যক্তির জন্য আমলে মারুফ প্রয়োজন যাতে সে তা ঢেকে রাখে। আমলে মারুফ নম্র ভাষায় হতে হবে। এবং বিপরীতমুখী কথার সময় চুপ করে থাকতে হবে। যদি ছতর উন্মুক্ত কোন ব্যক্তি যদি বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখায় তবে তার বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া যাবে যাতে করে সে তা ঢেকে রাখে। একি আইন পুরুষের আওরাত দেখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চার মাজহাবেই মেয়েদের হাত এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত তাদের সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে নামাহরাম পুরুষ এবং অমুসলিম মেয়েদের সামনে। এর অর্থ এ সকল মানুষের সামনে তাদের হাত পা শরীর এবং চুল ঢেকে রাখতে হবে।

(উভয় লিঙ্গের জন্য নামাহরামদের বিষয়ে **অফুরন্ত নিয়ামত** কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের বারোতম অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে) শাফি মাজহাব অনুযায়ী মুখমণ্ডল প্রকাশ না করাও ফরজ। যদি তাদের পিতা, বা স্বামী এই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করে তবে তারাও অবিশ্বাসী হয়ে যাবে।

[১]একজন ফিকহের স্কলার যার প্রকৃত নাম, সাইয়েদ মুহাম্মাদ এমিন বিন উমার বিন আব্দুল আজিজ,, (১১৯৮, ১৭৮৪ খ্রি), দামেস্ক,-১২৫২, ১৮৩৬ , একই স্থানে) তিনি দাররুল মুখতার এর ব্যাখ্যা রাদউল মুহতার নামক কিতাবের পাচঁটি ভলিউম লিখেছেন যা প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনা করেছেন, আলাউদ্দিন হাস্কাফি রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি (১০২১। হাস্কাফি- ১০৮৮[১৬৭৭]) অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের একশত তিরিশ নম্বর অধ্যায়ের বেশির ভাগ ফিকহ রাদউল মুখতার হতে নেওয়া।

[২] দয়া করে অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দেখুন।

ছেলেদের হাঁটু এবং থাই বের করে খেলাধুলা করা বা নাচা বড় গুনাহ তাছাড়া মেয়েদের মাথা এবং হাত খুলে এগুলো করা অথবা এগুলো দেখাও বড় গুনাহ।

একজন মুসলিমের তার অবসর সময় গেম খেলে বা অপ্রয়োজনীয় কাজ করে নষ্ট করা উচিত নয় বরং সে এই সময় এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ বা নামায আদায়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

কিমিয়ায়ে সাদাত এ উল্লেখিত রয়েছে, " মেয়েদের যেমন মাথা, চুল হাত বা পা খোলা রেখে বাহিরে যাওয়া উচিত নয় তেমনি তাদের পাতলা টাইট পোশাক বা অতিরিক্ত সাজগজ কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে যাওয়া হারাম। তাদের স্বামী ভাই বা পিতা যদি এরুপ কাজ সহ্য করে তবে তাদেরকে গুনাহের অংশিদার হতে হবে। অন্য কথায় তারা একসাথে জাহান্নামে জলবে। তারা তওবা করলে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন যারা তওবা করে।

জাওযাত এবং গাযওয়াতে পয়গাম্বার

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণ এবং পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদসমূহঃ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চল্লিশ বছর বয়সে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজির কাছে আসেন এবং তাকে বলেন যে আপনিই সেই নবী। এর তিন বছর পর তিনি মক্কায় তার নবুয়্যতের ঘোষণা দেন। এই বছরকে বলা হয় **বাইয়্যাতে**র বছর। তিনি সাতাশ বার জিহাদে অংশ নেন।এর মধ্যে নয়বার তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়। এর মধ্যে আঠারোটি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং মুসলিম বাহিনীর সেনা প্রধান হিসাবে অংশ নেন। তাঁর জীবদ্দশায় চার জন পুত্র, চার জন কন্যা, এগারো জন সম্মানিতা স্ত্রী এবং বারোজন পিতৃব্য ছিল। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজা রাদিয়াল্লাহ এর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা এর মৃত্যুর এক বছর পর পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তায়ালার কন্যা আয়িশা রাদিয়াল্লাহ এর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হন। তিনি তেষট্টি বছর বয়সে মসজিদে নববি সংলগ্ন আয়িশা রাদিয়াল্লাহ এর ঘরেই ইন্তেকাল করেন। তাঁকে একই কক্ষেই দাফন করা হয়। হযরত আবু বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালাকেও একই কক্ষে দাফন করা হয়। যেহেতু পরবর্তীতে মসজিদকে পরিসরে আর বৃদ্ধি করা হয়েছে সুতরাং কক্ষটি এখন মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। হিজরতের সপ্তম বছরে তিনি

উম্মে হাবিবার সাথে নিকাহতে আবদ্ধ হন। উম্মে হাবিবা ছিলেন মক্কার কুরাইশদের সর্দার আবু সুফিয়ান বিন হারব এর কন্যা। আবু সুফিয়ান বিশিষ্ট সাহাবি মুয়াবিয়্যা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর পিতা। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহন করেন। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি সালাম উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু এর কন্যা হাফসা এর সহিত নিকাহ করেন। তিনি হিজরতের পঞ্চম বছরে জুওয়াইরিয়া নামক দাসিকে মুক্ত করেন এবং তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জুওয়াইরিয়াহ **মুরেইসি** নামক যুদ্ধ হতে অধিকৃত বনী মুস্তালিক গোত্রের গোত্র প্রধান এর কন্যা। তিনি ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী বিয়ে করে ছিলেন। এটির বিস্তারিত **অশেষ রহমত** কিতাবের দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি উম্মে সালমা, জয়নব বিন্তে হুজেয়মা, মায়মুনা এবং সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না এর সাথে বিবাহতে আবদ্ধ হন। তাঁর চাচাতো বোন জয়নব এর সাথে তাঁর বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

জিবরাঈল আলাইহি সালাম তাঁর কাছে প্রায় চব্বিশ হাজার বার আসেন। বায়ান্ন বছর বয়সে তাকে মিরাজে ভ্রমন করানো হয়। তেপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি মক্কা হতে মদিনা হিজরত করেন। এই ভ্রমনের সময় শত্রুদের চোখে ধুলো দিতে তিনি এবং আবু বকর সাওর পর্বতের গুহায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং সোমবার শেষ রাতে তা ত্যাগ করেন। এক সপ্তাহ ভ্রমনের পর তাঁরা কুবা নামক মদিনার একটি পল্লীতে পৌঁছান। এটি ছিল বাইশে সেপ্টেম্বর সোমবার|এবং তাঁরা জুমাবারে মদিনা প্রবেশ করেন।

হিজরাতের দ্বিতীয় বছরে বরকতপূর্ণ রামাদান মাসের সোমবারে পবিত্র বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনশত তের জন মুসলিম মুজাহিদের বিপরীতে কাফির কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল হাজারের মত। তেরজন মুসলিম শাহাদাত লাভ করেন। আবু জাহালসহ সত্তর জন কাফির মারা যায়। আল্লাহ মুসলিমদের বিশাল বিজয় দান করেন।

হিজরি তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে পবিত্র উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাতশতজন মুসলিম মুজাহিদের বিপরীতে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। এ যুদ্ধে সত্তর জন আসহাবে কিরাম শহীদ হন। উহুদ যুদ্ধের চার মাস পরে নযদের অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ৭০ জন তরুণ সাহাবার একটি দল

প্রেরণ করা হয়। তাঁরা যখন **বিরে মাউনা**তে পৌঁছান তখন তাঁরা অতর্কিতে হামলার শিকার হন এবং দুইজন ব্যাতিত সকল সাহাবি শাহাদাত বরন করেন।

[মিরাজের বিস্তারিত **অশেষ রহমত** কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন]

হিজরি পঞ্চম সন খন্দকের যুদ্ধের সাক্ষী। এই যুদ্ধে দশ হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। অমুসলিমরা মদিনাকে অবরুদ্ধ করে। এরই মধ্যে মুসলিমরা মদিনার চারিদিকে প্রতিরক্ষার জন্য পরিখা খনন করেন। সপ্তম হিঃ অনুষ্ঠিত খায়বারের যুদ্ধের এক বছর পুর্বে হুদায়বিয়া নামক স্থানে একটি চুক্তি বা সন্ধি হয় যা **বাইয়াতে রিদওয়ান** নামে পরিচিত। মুতার যুদ্ধ হয়ে ছিল বাইজেনটাইন সিজার হিরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার মুসলিম সৈন্যের বিরুদ্ধে বাইজেনটাইন বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। জাফর তাইয়্যেব রাদিয়াল্লাহ আনহু এই জিহাদে শাহাদাত অর্জন করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের বিচক্ষণতার কারণে এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করেন। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। **হুনাইনের** যুদ্ধ খুবই প্রসিদ্ধ। বিজয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। **খাইবার** ইহুদিদের খুবই প্রসিদ্ধ একটি দুর্গ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলিকে এই দুর্গ জয় করতে প্রেরণ করেন এবং মুসলমানরা এটিও জয়লাভ করে। এটি ছিল সেই জায়গা যেখানে রাসুলুল্লাহকে খাবারে বিষ প্রদান করা হয়েছিল যা তিনি খেতে অস্বীকার করেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে পিছনে পড়ে যাওয়ার কারণে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা একদল কুৎসা রটনাকারী গোষ্ঠীর সমালোচনার স্বীকার হন যা নবীজিকে খুবই ব্যথিত করে। এরপর আয়াতে কারিমা নাযিল হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে ওই কুৎসা রটনাকারী দল ছিল মিথ্যাবাদী। তাছাড়া তাঁকে আল্লাহ তায়ালা তায়েফের বিজয়ও উপহার দেন।

ঈমানের বিষয়ে বিস্তারিত

ঈমানের বারটি বিষয় রয়েছে। আমার রব আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। এই বিষয়ে আমার দলীল সুরা বাকারার ৬৩ নম্বর আয়াতে। আমার রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার দলীল সুরা ফাতহ এর আটাশ এবং উনত্রিশ নম্বর আয়াত। আমার ধর্ম ইসলাম এবং এর দলীল সুরা আলে ইমরানের

উনিশতম আয়াতে। আমার কিতাব কুরআন এই বিষয়ে আমার দলীল সুরা বাকারার দ্বিতীয় আয়াত। আমার কিবলা কাবা শরিফ এর প্রমাণ রয়েছে সুরা বাকারার এক শত এবং চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে।

আমার মাযহাব-এ ইতিকাদ হলো **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত**। যার দলীল রয়েছে সুরা আনআম এর একশত তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম। যার দলীল রয়েছে সুরা শুরার একশত বাহাত্তর নম্বর আয়াতে। আমার মিল্লাত হলো মিল্লাত এ ইসলাম। সুরা হাজ্জের আটাত্তর নম্বর আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।

আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উম্মত। যার দলীল সুরা আল ইমরানের একশত দশ নম্বর আয়াতে। আমি একজন মুমিন (বিশ্বাসী), হাক্কান (সঠিক)। যার প্রমাণ রয়েছে সুরা আনফালের চতুর্থ আয়াতে । আলহামদু লিল্লাহি আলা তাওফিকি ওয়াস্তাগ ফিরুল্লাহা মিন কুল্লি তাকসিরিন।

পাঁচটি কারণে ইলম আমল থেকে বড়ঃ

ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল নয় কিন্তু আমল ইলমের উপর নির্ভরশীল। ইলম প্রয়োজনীয় কিন্তু আমলকে ইলম থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। আমল ছাড়াও অনেক সময় ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইলম ছাড়া আমল সম্পূর্ণ মূল্যহীন। ইলম আকল (বুদ্ধি বা বিবেক) অপেক্ষাও শ্রেয়।

মুমিন এর যিনাত (অলঙ্কার) হলো তাঁর ইখলাস। ইখলাসের যিনাতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে ঈমান এর। ঈমানের যিনাতের যুক্ত জান্নাতের সাথে। জান্নাতের যিনাতের ভিতর রয়েছে হুর, গুলমান এবং জামালুল্লাহ এর দর্শন। (আল্লাহ তায়ালাকে সামনা সামনি এমনভাবে দেখা যা বর্ণনা করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়)। আমল ঈমানের কোন অংশ হতো তাহলে একজন ঋতুবর্তি নারীকে কখনো নামায হতে মুক্তি দেওয়া হতো না। কারণ ঈমান হতে কখনো সাময়িক মুক্তি বা ফারেগ হওয়া সম্ভব নয়। জীবনে একবার হলেও কালিমা এ শাহাদাত পাঠ করা ফরয। সূরা মুহাম্মাদ এর উনিশতম আয়াতে কারিমায় এর প্রমাণ রয়েছে। কালিমা শাহাদাত পাঠের সময় ৪টি শর্ত অবশ্যই পুরণ করতে হবে, মুখে যা উচ্চারণ করা হবে অন্তরকে অবশ্যই তাঁর সাথে সায় দিতে হবে অর্থাৎ অন্তরের সমর্থনে মুখে উচ্চারণ, পঠিত অংশের অর্থ জানা, অন্তরের পরিপুর্ণ আনুগত্য ও মনোযোগের সাথে পাঠ করা এবং তাযিম এর সহিত পাঠ করা।

কালিমা এ শাহাদাত পাঠের একশত ত্রিশটি সুফল রয়েছে। শিরক, সেক, তাসবিহ এবং তা,তিল এই চারটি বস্তু এইসব সুফলকে ধ্বংস করে দেয়। শিরক হল আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কোন অংশীদার মনে করা। শেক বলতে বোঝায় দ্বীনের প্রতি অমনযোগী, দ্বীন থেকে দুরে সরে যাওয়া বা দ্বীন পালন বন্ধ করে দেওয়া। তেসবিহ বলতে বোঝায় আল্লাহ সুবহানা তায়ালাকে কোন কল্পিত মাখলুক এর সাথে তুলনা করা। তা,তিল বলতে বোঝায়, আল্লাহ সৃষ্টির কোন কিছুর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, প্রাকৃতিক ভাবেই সময়ের সাথে সব কিছু সঙ্ঘঠিত হয়। এখানে ঈমানের ৩০টি সুফল তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে ৫টি দুনিয়াতে, পরবর্তী ৫টি মৃত্যুর সময়ে, ৫টি কবরের জীবনে, হাশরের দিনে ৫টি, ৫টি জাহান্নামে এবং ৫টি জান্নাতে।

<u>দুনিয়াবি ৫টি সুফল হলোঃ</u>

১। তার নামকে সুন্দর করে ডাকা হবে,

২। তার উপর আহকামে ইসালামিয়্যা ফরয হবে,

৩। শিরচ্ছেদ হতে তার গর্দান রক্ষা পাবে

৪। আল্লাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে,

৫।সকল মুমিন গন তাকে আপন করে নিবে এবং মুহাব্বাত করবে,

<u>মৃত্যুর সময়ের ৫টি ফায়দা হলোঃ</u>

১। আজ্রাইল আলাইহিস সালাম তার সামনে সুন্দর চেহারায় আবির্ভুত হবে,

২। মাখন থেকে চুল আলাদা করার মত যত্নকরে আলতোভাবে ফেরেশতারা তার রুহু বা আত্মা কবজ করবে,

৩। কবর থেকেই সে জান্নাতের সুগন্ধ পাবে,

৪। তার আত্মাকে ইল্লিনে প্রবেশ করান হবে এবং ভালো খবর বহঙ্কারি ফেরেশ্তারা সেখানে গমন করবে,

৫। হে মুমিন! তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে| এরুপ আওয়াজ সে শুনতে পাবে|

কবরে থাকা অবস্থার ৫টি ফায়দাঃ

১। কবরকে প্রশস্ত করা হবে,

২। মুনকার এবং নাকির সুন্দর অবয়বে আবির্ভূত হবে,

৩। একজন মালাইকা তাকে অজানা বিষয়ের তা,লীম দিবে,

৪। আল্লাহ তার মস্তিষ্কে এমন কিছু জ্ঞান দান করবেন যা কোন ব্যাক্তি জানে না।

৫। সে জান্নাতে তার মাকাম দেখতে পাবে,

বিচার দিবসের দিনে ৫টি সুফলঃ

১। তার প্রতি সওয়াল এবং হিসাবসমুহ সহজ করে দেওয়া হবে,

২। আমল নামা ডান হাতে প্রদান করা হবে,

৩। মিযানের দাঁড়িপাল্লায় সওয়াবকে ভারি করে দেওয়া হবে,

৪।আরশে আজিমে র ছায়াতলে তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে,

৫। বিদ্যুতের বেগে সে পুলসিরাত পার হবে।

জাহান্নামে থাকাকালীন ৫টি সুবিধাঃ

১। জাহান্নামের অন্যান্যদের মত একজন ঈমানদার ব্যাক্তির চোখ ধুসর হয়ে যাবে না,

২। নিজের শয়তানের সাথে সে ঝগড়া করবে না,

৩।তাকে হাতে আগুনের হাতকড়া এবং ঘারে লোহার বেড়ি পরানো হবে না,

৪। তাকে হামিম নামক অত্যধিক গরম পানি পান করানো হবেনা,

৫। সে আজীবন জাহান্নামে অবস্থান করবে না।

জান্নাতে অবস্থানকালে ৫টি ফায়দাঃ

১। সকল ফেরেশতারা তাকে সালাম প্রদান করবে,

২। তার সাথে সিদ্দিকগনের বন্ধু ত্ব হবে,

৩। জান্নাত তার চিরস্থায়ী অবস্থানের যায় হবে,

৪। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে,

৫।আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করবে।

কুফরের কারণসমূহঃ

সাধারনত তিন ধরনের কুফর রয়েছেঃ কুফর-ই ইনাদি, কুফর-ই জাহলি, কুফর-ই হুকুমি।

কুফর-ই- ইনাদিঃ

আবু জেহেল, নমরুদ, সাদ্দাদ কিংবা ফেরাউনের মত কুফর অর্থাৎ জেনে বুঝে ইসলাম ও ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করা। এদেরকে জাহান্নামি বলার অনুমতি রয়েছে।

কুফুর-ই-জাহলিঃ

সাধারণ কাফিরদের কুফুর। তারা জানে যে ইসলাম সত্য, আজান-এ মুহাম্মদ শুনে কিন্তু তাদের যদি ইসলামের পথে ডাকা হয় তারা জবাব দেয়, আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি পিতামহ এবং পরিবার থেকে শিখেছি এবং আমরা এর উপরই থাকতে চাই। এদের কুফরকে কুফর-ই-জাহিলি বলা হয়।

কুফর ই হুকুমিঃ

তাযীমের বিষয়কে তাহকির বা ঘৃণা করা এবং তাহকির বা ঘৃণার বিষয়কে তাযীম করা।

তাছাড়া আউলিয়া কেরাম, আম্বিয়া কেরাম এবং উলামায়ে কেরামগণের উপর ঘৃণা পোষণ করা, তাদের বক্তব্য কিতাব কিংবা ফতওয়া ও ফিকহি বিষয়াবলীকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করাও এক ধরনের কুফর। তাছাড়া কাফরদের ইবাদতের বিষয়সমুহ পছন্দ করা, জরুরত ছাড়া তাদের যুন্নার, যাজকগণের পোশাক এবং অন্যান্য কুফরের আলামতসমূহকে মুহাব্বত করা কিংবা ব্যবহার করাও কুফরির পর্যায়ে।

কুফরের সাতটি ক্ষতিকর দিক রয়েছেঃ-

এটি বিশ্বাস বা ঈমান এবং নিকাহকে বিলুপ্ত করে দেয়, এরকম ব্যক্তির মাধ্যমে জবেহকৃত পশু খাওয়া হারাম যদিও সে ইসলামের বিধান মোতাবেক পশু কোরবানি দেয়। হালাল বৈধ স্ত্রী এর সাথে কৃত সম্পর্কও তার জন্য ব্যাভিচারের সামিল। এ ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। জান্নাত তার থেকে দূরে সরে যায়। জাহান্নাম তার জন্য নিকটবর্তী হয়। সে যদি এ হালতেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জানাযার নামায পড়ানোর হুকুম নেই।

যদি কোন বাক্তি বলে, আমি যদি এমনটি করি, তবে কি কাফির হয়ে যাব, যদি আমি ভুল করি। সে অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং নিজেকে কুফরের দিকে ঠেলে দেয়, যদিও সে নির্দিষ্ট বিষয়ের নাম নেয় না জেনে বা না জেনে। তার ঈমান এবং নিকাহের তাজদিদ খুব জরুরি।

অপর এক ধরনের কুফর হল, ইসলামের নিষিদ্ধ বিষয়সমুহ যেমন যেনা, সুদ, জুয়া, মদ, মিথ্যা বলা এ সকল বিষয়ে এমন কামনা করা যে "যদি এটি হালাল হত! যদি আমি এটি করতে পারতাম!! " । কেউ যদি ঘটনাক্রমে বলে যে, "আমি বিশ্বাস করি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পয়গম্বার, কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম পয়গম্বর কিনা এই বিষয়ে আমার সংশয় আছে বা আমি জানিনা" সেও কাফির হয়ে যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখেরি পয়গম্বর হওয়া নিয়েও কেউ সংশয় প্রকাশ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। ইসলামিক আলেমদের মতে, কেউ যদি এরুপ বলে যে, "পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যা বলেছেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা মুক্তি লাভ করেছি" তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। বিরগিভি বলেন,ঐ ব্যক্তির অভিব্যক্তিতে যদি সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু তার অভিব্যক্তি প্রকাশের অর্থ যদি হয় ইলযাম বা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধান তবে সে কাফির হবে না।

বর্ণনায় রয়েছে, কোন বাক্তিকে যদি এক সাথে নামাযের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সে যদি সরাসরি নামাজ পড়তে অস্বীকার করে তাবে তাও কুফরির পর্যায়ে। কিন্তু সে যদি এই কথা দ্বারা বুঝিয়ে থাকে যে, "আমি কারো উপদেশ মানতে নামায আদায় করব না, আমি নামায আদায় করব কারণ এটি আল্লাহর বিধান" তবে এটি কুফর নয়। কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, দাড়িকে এক মুষ্টি পরিমাণ বড় রাখো এবং মোচকে ছোট রাখো বা নখ কাটো নিয়মিত যেহেতু এগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। জবাবে সেই ব্যক্তি যদি সরাসরি এগুলো করতে অস্বীকার করে তাহলেও সে কুফরি করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সুন্নতাবলীর ক্ষেত্রেই একই বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মিসওয়াক। হযরত বিরগিভি [জেইন উদ্দিন মুহাম্মাদ বিরগিভি রাহমাতুল্লাহ আলাহি ৯২৮-৯৮১ হিজরি, ১৫২১- ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ] এর ব্যাখ্যায় যোগ করেন, কেউ যদি মিসওয়াকের বিষয়ে অবজ্ঞা কিংবা অস্বীকার করে তখন তা কুফরি কিন্তু সে যদি এই উদ্দেশ্যে অস্বীকার করে যে সে অন্য কারো আদেশে এটা করবে না সে এটা করবে শুধুমাত্র এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের তা হলে এটি কুফরি নয়।

ইউসুফ কারদাভি তার "**আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম,"**নামক কিতাবের একাশি পৃষ্ঠায়; বুখারি শরিফের [মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি রাহমাতুল্লাহ

আলাহি ১৯৪-২৫৬ হিজরি / ৮১০- ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ, সামারখান্দ] একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, "**তোমরা মুশরিকদের আচার ব্যাবহারের বিপরীত করো! দাঁড়িকে লম্বা করো মোছকে ছোট করো,"** ।এই হাদিসটি দাঁড়ি কামানো এবং এক মুষ্টি অপেক্ষা ছোট করাকে নিষিদ্ধ করেছে। অগ্নি উপাসকরা তাদের দাড়িকে ছোট করতো, কেউ কেউ দাড়ি কামাতো। এই হাদিস তাই আমাদের তাদের প্রথার বিপরীত করতে আদেশ করে। কোন কোন ফিকাহবিদের মতে এই হাদিস অনুযায়ী দাড়িকে বড় করা ওয়াজিব এবং তা কামানো হারাম। এঁদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়্যা দাড়ি কামানোর ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিছু ইসলামিক স্কলারদের মতে দাড়ি লম্বা করা একটা প্রথাগত বা গতানুগতিক কাজ এটা ইবাদত নয়। ফাতহ নামক কিতাবের বর্ণনায় রয়েছে, দাড়িকে কোন ওজর ছাড়া ছোট করা মাকরুহ। এটিই এই বিষয়ে সঠিক মত।এই হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণ করা যায় না যে দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। আরেকটি হাদিসের বর্ণনায়, "**ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তাদের দাঁড়ি এবং চুলকে রঙ করে না । তারা যা করে তার বিপরীত কর,"** । সুতরা পারতপক্ষে এই হাদিস শরিফ দাঁড়ি এবং চুলকে রঙ্গিন করতে বলেছে। কিন্তু তাই বলে এটি নয় যে দাঁড়ি এবং চুলকে রঙ্গিন করা ওয়াজিব। এটি বলে যে এরূপ করা মুস্তাহাব। কিছু কিছু আসহাবে কারিমগণ তাদের দাঁড়ি এবং চুলকে রাঙ্গিয়েছেন (প্রাকৃতিক উপায়ে)। অধিকাংশই এরূপ করেন নি। এটি যদি ওয়াজিব হতো তবে সকলেই এরূপ করতেন। সুতরাং যে হাদিসে দাঁড়িকে বড় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, এখানে প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ি লম্বা করা মুস্তাহাব এটি বোঝানো হয়েছে। এটি করা ওয়াজিব নয়। কোন ইসলামিক আলেমকেই দাঁড়ি কামাতে লক্ষ করা যায় নি। তাদের যামানায় দাড়িকে বড় রাখা ছিল প্রথাগত আচার। (এখানে এর দ্বারা এটিকে উৎসাহিত করা হয়নি যে মুসলিমদের তাদের প্রথা অনুসরণ করতে হবে। এতি মাকরুহ। এরূপ ক্ষেত্রে ফিতনা তৈরি হলে তা হারাম)। এটিই কারদাভি রাহমাতুল্লাহ এর আলোচ্য অনুবাদ।

করদভি তার কিতাবের সুচনায় উল্লেখ করেন, তিনি বিভিন্ন মাযহাবের শিক্ষাগুলোকে একে অপরের সাথে সমন্বয় করেন এবং তার মতে যে কোন একটি মাযহাবকে অনুসরণ করা যুক্তিগত নয়। সুতরাং তিনি **আহলে সুন্নাহ** এর অনুসারী নন। আহলে সুন্নাতের স্কলারদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করতে হবে এবং মাযহাবের বিরোধিতা করবে সে একজন জিন্দিক। তবে যেহেতু কারদাভি এর লিখিত বক্তব্য মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি

রাহমাতুল্লাহ সংকলন করেছেন সুতরাং দাড়ি রাখা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য এটি হানফি মাজহাব এর পক্ষে পাঠকদের জন্য একটি দলিল স্বরূপ। হজরত আব্দুল হক দেহলভী রহমাতুল্লাহ [৯৫৮-১০৫২ হিজরি, ১৫৫১-১৬৪২ হিজরি] এই বিষয়ে আশয়া**তুল লোময়াত** কিতাবের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, ইসলামি স্কলাররা চুল এবং দাড়ির বিষয়ে তাদের বসবাসের স্থানের লোকাল কাস্টম অনুসরণ করেন। এজন্য এটি কারো লোকালিটির কাস্টম অনুসরনের উৎসাহ বৃদ্ধি করে যা মাকরুহ। তবে মুবাহ অর্থাৎ অনুমতি যোগ্য হলে ভিন্ন কথা। মুহাম্মদ বিন মুস্তাফা হামিদি রহমাতুল্লাহ [১১৭৬ হিজরি, ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ হাদিম কনিয়া তুরস্ক] তার **বেরিকা** নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, হাদিসে বর্ণিত আছে, **তোমরা তোমাদের দাড়িকে লম্বা কর এবং গোঁফ ছোট কর**। সুতরাং দাঁড়ি কামানো এবং এক মুষ্টির নিচে রাখাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া এক মুষ্টির অধিক দাঁড়ি রাখা সুন্নাতও। এক মুষ্টি বলতে বোঝায় হাতের চার আংগুলের প্রস্থের সমান পরিমাপ।

যখন সুলতান বলেন কোন কিছু সুন্নাত যদিও সেটি মুবাহ হয় তথাপি তা পালন করা ওয়াজিব। সুলতানের এবং সকল মুসলিমদের দ্বারা করা মানে এটি আদেশ। এক্ষেত্রে এক মুষ্টি পরিমান দাড়ি বড় করা ওয়াজিব। এর অন্যথা মানে ওয়াজিবকে অমান্য করা। এটি মাকরুহে তাহরিমি। মসজিদের ইমামের জন্যও একই বিধান। তবে দারউল হারবে এটি অনুমতিযোগ্য এক মুষ্টির নিচে দাড়ি রাখা বা কামানো । যদি দাড়ি না কামালে শাস্তি ভোগ করতে হয় অথবা চাকরি চলে যায় যাতে করে সে আমলে মারুফ হতে বঞ্চিত হয় এবং ইসলামের সেবা করতে পারে না এবং নিজের বিশ্বাসকে রক্ষা করে। কোন উজর ছাড়া ছাটা বা কামান মাকরুহ। এবং এক মুষ্টির নিচে দাড়ি রেখে কেউ যদি মনে করে সে সুন্নাত পালন করছে তবে এটি একটি বিদাত। বিদাত করা বড় গুনাহ।

যেমন কোন ছেলে এবং মেয়ে যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর নিকাহ করে এবং এর পর যদি তাদের ঈমানের মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিতে না পারে তবে তা যেন মুসলিম নয়। তাদের নিকাহ নামা আবার করতে হবে। কেউ যদি তার গোঁফ ছোট করে এবং তার পাশের কেউ যদি বলে এটা ভালো হয়নি তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির ঈমান হারানোর সম্ভাবনা আছে। কারণ গোঁফ ছোটকরা একটি সুন্নাত এবং ঐ ব্যক্তি এটিকে হাল্কাভাবে নিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি সমগ্র শরীরে সিল্কের পোশাক পরিধান করে এবং কেউ যদি বলে তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে অথবা এর দ্বারা সে ধন্য হোক তবে ঐ ব্যক্তির ইমান হারানোর ভয় রয়েছে। কোন ব্যক্তি

যদি কোন মাকরুহ করেন যেমন কিবলার দিকে পা দিয়ে রাখা বা কিবলার দিকে প্রস্রাব বা থুতু ফেলা তবে এক্ষেত্রে কেউ যদি তাকে এটি না করার জন্য বলে এবং ঐ ব্যক্তিকে জবাবে সে যদি বলে, আমি আসা করি তোমার সব পাপ এর মত মার্জনীয় হোক তবে ঐ ব্যক্তির ইমান চলে যাওয়ার ভয় রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি কোন মাকরুহ করেন এবং সে যদি মাকরুহকে খুব অবহেলা করে কাউকে বলেন তবুও।

তাছাড়া যদি কোন চাকর তার মনিবের ঘরে প্রবেশ করে সালাম দেয় এবং মনিবের পাশে থাকা কেউ যদি তাকে রাগ হয়ে বলে, থাম ! ! এভাবে কেউ মনিবের সাথে কথা বলে! তবে ঐ ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। তবে সে যদি তাকে ভদ্রতা শেখানোর জন্য বা আদবের সহিত অভিবাদনের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে বলে তবে তা কাফিরের কাজের পর্যায়ের না। কেউ যদি কারো পরনিন্দা করে এবং বলে যে এটি এমন কিছু গুরুতবপুর্ণ কিছু নয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে স্কলারদের মত অনুযায়ী। কারণ সে অনুতপ্ত না হয়ে হারাম করেছে।

কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমাকে যদি অমুক এবং তমুকের সাথে জান্নাতে যেতে বলা হয় আমি যাব না অথবা আল্লাহ্ আমাকে জান্নাত দিলে আমি এটি চাইব না আমি চাইব তার দিদার এধরনের কথাবার্তা কুফর। আরেকটি বক্তব্য যা কুফরির পর্যায়ের তাহলো বলা যে ইমান বৃদ্ধি পাবে বা হ্রাস পাবে। বিরগিভির মতে এটা বলা কুফর যে **মুমিনুন বিহ** এর উপর নির্ভর করে এটি হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে তবে যদি তা ইয়াকিন এবং কুয়াতে সিদক এর উপর নির্ভর করে হয় তবে তা কুফর নয়। অনেক মুজতাহিদগন ইমান হারানোর বিষয়ে বলেছেন।

স্কলারগণ বলেছেন দুইটি কিবলা আছে এরুপ বলা কুফর। যার একটি কাবা এবং অপরটি জেরুজালেম । বিরগিভির বর্ণনা মতে এরুপ কুফর যে এখন দুইটি কিবলা রয়েছে তবে কেউ যদি বলে আগে জেরুজালেম কিবলা ছিল এখন কাবাই একমাত্র কিবলা তবে তা কুফর নয়। কোন মুসলিম কারণ ছাড়াই যদি কোন ইসলামিক স্কলারের বিরুদ্ধে হিংসা এবং ঘৃণা পোষণ করেন তবে তার ঈমান হারানোর ভয় রয়েছে । এবং এরুপ বলাও কুফরি যে কাফিরদের উপাসনার পদ্ধতি যা ইসলামের সাংঘর্ষিক সেগুলো সুন্দর। কেউ কোন ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করে সে বিশ্বাসী কি না এবং এর জবাবে ঐ ব্যক্তি যদি বলে ইনশাল্লাহ এবং যদি আর ব্যাখ্যা না করে তবে এটিও কুফরির পর্যায়ের। স্কলারগণ বলেছেন কেউ যদি কারো সন্তানের উৎসর্গ কামনা করে বলে যে তোমার সন্তান অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর জন্য। তবে সে

কাফির। কোন মহিলা যদি কাল কোমরবন্ধ পরিধান করে এবং বলে যে এটি যুন্নারত বেসে কাফিরে পরিনত হয়ে যায় এবং স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কেউ হারাম খাদ্য গ্রহনের সময় যদি বিসমিল্লাহ বলে তবে সে কাফির হয়ে যায় । বিরগিভির মতে এটি বলতে ফকিহরা বুঝিয়েছেন সে কাফির হবে যদি সে এটি হারাম লীআইনিহি গ্রহন করার সময় বলে। যেমন মদ, অপরিস্কার বা মৃত পশুর মাংস। এবং এটি প্রযোজ্য হবে একমাত্র তখন যখন ব্যক্তি জানে যে সে হারাম গ্রহণ করছে। এর মাধ্যমে সে আল্লাহ তায়ালার নাম নিয়ে অবজ্ঞা করেছে। এক্ষেত্রে খাবার নিজেই হারাম।

ইসলামিক ইমামগণ বলেছেন যদি সে হারাম উপায়ে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করে তবে সেই খাদ্য হারাম নয় উপার্জনের উপায় হারাম। যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এই বলে অভিশাপ দেয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার আত্মাকে কাফিরদের ভূমিতে নিয়ে যাক। স্কলারগণ এই ব্যাপারে সর্ব সম্মত নয় যে অভিশাপদাতা ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হবে কি হবে না।

কারো নিজের কুফরকে কোন ইসলামিক স্কলারের উপরে আরোপ করাও কুফরি। কারো কুফরের অনুমোদন দেওয়াও কুফর। তবে এই অনুমোদন দুর্বলতা বা ফিসক অর্থাৎ গুনাহের কারণ হলে এটি কুফর নয়। বিরগিভি রহমাতুল্লাহ বলেছেন, আমরা এই কথাটি গুরুতের সাথে দেখি। এর জন্য কুরআনে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাটি দলিল স্বরূপ। কোন ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহ্ তায়ালা জানে যে সে ঐ কাজ করেনি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ঐ কাজ করে থাকে তবেও সে কাফির হয়ে যাবে। সে তার হাক তায়ালার মাধ্যমে নিজের কপটতা লুকিয়েছে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে নিকাহ করে কোন সাক্ষি ছাড়া এবং বলে যে আল্লাহ্ তায়ালা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া সাল্লাম তাদের সাক্ষি। তবে সেও কাফির। কেউ যদি বলে যে হারানো এবং চুরি যাওয়া সম্পদ কোথায় জানে, তবে সে এবং তাকে অনুসরণকারী সবাই কাফির। সে যদি বলে জিনেরা তাকে জানায় তবুও সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি আল্লাহর নামে কিছু শপথ করতে চায় এবং অপর কোন ব্যক্তি যদি বলে যে আমি চাই না তুমি আল্লাহর নামে শপথ কর, দাস মুক্তি, সম্মান এসব এর জন্য আমি চাই তুমি কোন বস্তুর উপরে শপথ কর পরবর্তী জন কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে তোমার চেহারা আমাকে মৃত্যুর ফেরেশতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটিও কুফরি কারণ মৃত্যুর ফেরেশতা প্রধান ফেরেশতাদের একজন। কেউ যদি বলে নামায না পড়া কত সুন্দর সেও

কাফির।

ইসলামি স্কলারদের মতে কেউ যদি কাউকে বলে এসো নামাজে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি বলে না আমার জন্য নামাজ পড়া কষ্টকর সে কাফির। কেউ যদি বলে বেহেশত হতে আল্লাহ্ তায়ালা আমার সাক্ষী তবে সেও কুফরি করল, কারণ সে আল্লাহ্ তায়ালাকে এমন স্থানে বর্ণনা করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা কোন স্থানে অবস্থান হতে মুক্ত। রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসি সাল্লাম খাবার পর আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং অপর কেউ যদি বলে এটি একটি খারাপ অভ্যাস তবে দ্বিতীয় জন কাফির হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি বলে একজন জিউস হওয়ার থেকে নাসরানি হওয়া ভালো তবে সে কাফির। অথবা আমেরিকার কাফির কমিউনিস্ট থেকে ভালো। এক্ষেত্রে বলা উচিত একজন জিউস একজন খ্রিষ্টান কিংবা নাসরানী থেকে খারাপ। কেউ যদি বলে, ইলমের প্রতিনিধি হয়ে আমার কি লাভ, কে কিই বা করে যা উলামারা বলে অথবা কোন ফতওয়া নিচে ফেলে দেয় এবং বলে যে ধার্মিক ব্যক্তিদের কোথায় কোন লাভ নেই তবে সেও কাফির হয়ে যায়।

কেউ যদি কাউকে কোন বিচারের জন্য শরিয়া আইনে যাওয়ার পরামর্শ দেয় এবং ঐ ব্যক্তি যদি জবাবে বলে পুলিশ তাকে না নিতে আসা পর্যন্ত সে যাবে না অথবা কিভাবে আমি ইসলামকে জানবো তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কিছু বলে যা কুফরি এবং কোন ব্যক্তি যদি তাতে হাসে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

কেউ যদি বলে আল্লাহ্ তায়ালার ওজনহীন কোন শুন্য স্থান নেই অথবা আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশতে অবস্থান করছেন তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমি ইসলাম জানি না তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, আদম আলাইহিস সালাম যদি গন্দম না খেতেন তবে আমরা পাপি হতাম না তবে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে স্কলারগণ একমত নয় যে সে কাফির হবে কি না, কেউ যদি বলে, আমরা পৃথিবীতে অবস্থান করতাম না। কেউ যদি কোন বড় গুনাহ করে কারো তওবা করতে অনুরোধে তওবা না করার কথা বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে বলে চলো কোন আলেমের কাছে যাই অথবা ফিকহায়ের কিতাব পড়ি অথবা ইল্মে হাল অর্জন করি এর জবাবে যদি ঐ ব্যক্তি বলে ইল্মের সাথে আমার কি কাজ। তবে সে কাফির হয়ে যাবে। যে চার মাজহাবে লিখিত কিতাবকে আক্রমণ করবে সে জিন্দিক। কেউ যদি কিছু প্রশ্নে উত্তর না জানে যেমন, তুমি কার অনুসারী? তোমার মিল্লাত কি? তোমার ইতিকাদ এর মাযহাবের ইমাম কে? তোমার আমলের মাযহাবের

ইমাম কে? তবে সে কাফির হয়ে যায়।

তাছাড়া ইসলামিক স্কলারগণ বলেছেন, কেউ যদি কোন স্পস্ট হারামকে হালাল বলে যেমন, মদ, শুকর তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কোন হারাম বস্তুর হালাল হওয়ার আসা করাও কুফরি। যেমন, জুয়া, ব্যভিচার, সমকামিতা, সুদ ইত্যাদি। তবে যদি আশা করা হয় যদি মদ হালালভাবে তৈরি করা হত তবে তা কুফরি নয়। কারণ মদ সব সময় হারাম ছিল না। কুরানের কোন শব্দ বা আয়াত নিয়ে হাসি তামাসা করা কুফুরি। কোন ব্যক্তি যদি ইয়াহিয়া নামের কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করে বলে, **হে ইয়াহিয়া! হুজ ইল কিতাব**। তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ এর মাধ্যমে সে কুরআনে কারিমের শব্দ নিয়ে ঠাট্টা করছে। একি বিষয় মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট বা নাচ গানের সাথে কুরআন তিলাওয়াত এর ক্ষেত্রেও একই আইন প্রযোজ্য।

কেউ যদি বলে মাকালা কাল্লাহ ।যদি এমন কিছু দেখে যার সম্বন্ধে সে ধারনা করে এবং এর বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। এটি আফাত [অশেষ রহমত কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে, এটি আফেত এর প্রতি শব্দ, এর অর্থ দুরজগের সম্ভাবনা] কেউ যদি বলে, আমি এখন তোমার সামনে ওয়াদা করব না, কারণ তারা কোন পাপের ওয়াদা করতে চায়।এটি বলা আফাত যে,তুমি জিব্রাইলের বা ছুরের মত নগ্ন।এর মাধ্যমে প্রধান ফেরেশতাদের সাথে ঠাট্টা করা হয়। আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোন নামে কিছু ওয়াদা করা হারাম।

কোন ব্যক্তি হারাম কিছু করার মাধ্যমে মুরতাদ বা কাফির হয়ে যাবে না। তবে সে যদি কোন হারামকে হালাল বলে যা কুরআন এবং হাদিসে হারাম হওয়ার ব্যপারে বর্ণিত তবে সে কাফির হয়ে যাবে। তথাপি কোন ব্যক্তি যদি নিজের অথবা পুত্রের মাথা ছুয়ে আল্লাহর নামে ওয়াদা করলে যেমন ওয়াল্লাহি! আমার পুত্রের মাথার কছম, তবে ভয় করা হয় সে কুফরি করল।

আহকামে ইসলামিয়াঃ

ইসলামের আদেশ এবং নিষেধসমূহকে বলা হয় **আহকামে ইসলামিয়া**। এটি ৮টি ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। **ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরুহ এবং মুফসিদ**। ফরয আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম। এবং এগুলো দলিল সাপেক্ষে প্রমাণিত। অন্যকথায় আয়াতে কারিমায় এগুলো বর্ণিত রয়েছে। যে এগুলো অমান্য

করে কিংবা শিথিলিতা দেখায় সে কাফির। যেমন, ঈমান, কুরআন, ওযু করা, নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, হজ, গোসল।

তিন ধরনের ফরয রয়েছেঃ ফরযে দায়েম, ফরযে মুয়াক্কাত এবং ফরযে আল কিফায়া।

১। ফরযে দায়েমঃ সম্পুর্ণ **আমান্তু বিল্লাহ** মুখস্ত রাখা এবং এর অর্থ বুঝে বিশ্বাস করে হ্রদয়ে ধারন করা।

২। ফরযে মুয়াক্কাতঃ ইবাদাতের আদেশসমুহ যা নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয়। যেমন পাচঁবার দৈনিক নামায আদায়, পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা, ব্যবসার পদ্ধতি শেখা।

৩। ফরযে কিফায়াঃ আল্লাহ্ তায়ালার এমন আদেশ যা একটি গ্রুপের জনগোষ্ঠীর উপর আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে সদস্য পঞ্চাশ, একশ, দুইশ কিন্তু তাদের মধ্যের একজন আদায় করলেই সবার আদায় হয়ে যাবে। এর একটি উদাহরণ সালাম বা সম্ভাষণ। অন্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে, জানাযার নামায, মৃত মুসলিমকে গোসল করানো, সারফ এবং নাহু শেখা, হাফেয হওয়া, বেশি করে জ্ঞানার্জন করা।

তাছাড়া ফরযের ভেতরে আরও পাঁচটি ফরয রয়েছে। ইলমে ফরয, মিকদারে ফরয, ইতিকাদে ফরয, ইখলাসে ফরয, ইনকারে ফরয। ইনকারে ফরয কুফুর।

ওয়াজিবঃ ওয়াজিব আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ। তবে এই আদেশগুলো প্রুফটেক্সটের মাধ্যমে জানা গেছে। ওয়াজিব প্রমাণিত কোন কিছুকে কেউ যদি অস্বীকার করে তবে সে কুফুর করবে না। যে ব্যক্তি কোন ওয়াজিবকে অস্বীকার করবে সে কাফির হবে না। তবে এটি পালনে অস্বীকারকারী জাহান্নামের আগুনে যাবে। যেমন, বিতরের নামাজে দুয়ায়ে কুনুত পড়া, কুরবানি করা, রমজানের ঈদের আগে ফিতরা আদায় করা, কোন সেজদার আয়াত শোনার বা পড়ার পর **তিলাওয়াতের সেজদা** আদায় করা। ওয়াজিবের মধ্যে আরও চারটি ওয়াজিব এবং ফরজ রয়েছে, ইলমে ওয়াজিব, আমাল এ ওয়াজিব, মিকদারই ওয়াজিব, ইতিকাদই ওয়াজিব এবং ইখলাস ই ফরজ। লোক দেখান ফরজ বা ওয়াজিব গুনাহ।

সুন্নাতঃ এমন কাজ যা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করতে আদেশ বা অনুমতি দিয়েছেন এক বা একের অধিক বার। যে এটি পালন করবে সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়াই সুন্নাত

পরিত্যাগকে অভ্যাসে পরিনত করবে সে পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সুন্নাত এর উদাহরণ- যেমন, মিসওয়াক ব্যবহার করা, আজান এবং ইকামাত দেওয়া, জামাতে নামাজ আদায় করা, কারো বিবাহের সন্ধায় আহারের আয়োজন করা, এবং ছেলে সন্তানের খৎনা করানো। তিন ধরনের সুন্নাত রয়েছে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাত এ গায়রি মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে আল কিফায়া। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এর উদাহরণ, ফজরের নামাযের দুই রাকাত সুন্নাত, যোহরের নামাযের আগের এবং পরের সুন্নাত, মাগরিবের নামাযের সুন্নাত, এবং এশার নামাযের সুন্নাত। এগুলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। অনেক স্কলারগণ বলেন ফজরের নামাযের সুন্নাত ওয়াজিব। কোন ওজর ব্যতিত এসব সুন্নাত পরিত্যাগ করা যাবে না। যে ব্যক্তি এর কোন একটি পরিত্যাগ করলো সে কাফির। সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদার উদাহরণ, আসরের নামাযের সুন্নাত এবং এশার ফরয নামাযের আগের সুন্নাত। এগুলো উল্লেখযোগ্য হারে পরিত্যাগ করলে এটি কোন কিছুতে বাধ্য করে না। তবে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগকারী অনেক নিয়ামত এবং জান্নাতে শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

[**হালাবি** এবং **কুদুরিতে** মতে, দুই ধরনের ইবাদত রয়েছে- **ফারাইদান্দ ফাদাইল**, যেগুলো ফরয কিংবা ওয়াজিব নয় এগুলো **ফাদাইল** বা **নফল**। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নাত এই নাফিলা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। এবং এগুলো নামাযের ফরযের ভুলত্রুটি পুষিয়ে দেয়। অন্য কথায়, এগুলো ফরয অংশের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে এটি মনে রাখা উচিত যে, সুন্নাত নামায কোন ফরযের বিকল্প হতে পারে না যা আদায় করা হয় নি। এমন সুন্নাত নামায কোন ব্যক্তির জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করতে পারবে না যা সে ফরয নামায আদায় না করার কারণে ভুগবে। যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া ফরজ নামাজ ছেড়ে দিয়েছে তার সুন্নাত সহিহ হবে না। যদি নিয়্যাত করা না হয় তবে সুন্নাত নামাজের ফজিলত অর্জিত হয় না। সুতরাং যারা পূর্বের অনেক নামাজ আদায় করতে পারে নি তাদের উচিত কাজা আদায় করতে থাকা এবং সুন্নাত হিসাবে চার ওয়াক্তের সুন্নাত আদায় করতে থাকা। সুতরাং তারা যখন নিয়্যাত করবে তখন তারা পূর্বের নামাজের কাজা আদায় করবে এবং বর্তমানের দৈনিক নামাজের সুন্নাত আদায় করবে। [এটির বিস্তারিত অশেষ রহমত কিতাবের তেইশ নম্বর অধ্যায়ের চতুর্থ পরিছেদে উল্লেখ করা হয়েছে] সুন্নাতে আল কিফায়া এমন সুন্নাত যা একটি দলের পক্ষ থেকে একজন আদায় করে দিলেই হয়ে যায়। যেমন সালাম, ইতিকাফ ,

বিসমিল্লাহ শরীফ। কিভাবে দ্বৈত নিয়্যাত করতে হবে এর বিস্তারিত অফুরন্ত নিয়ামত নামক কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ২৩ নম্বর পরিছেদে বর্নিত রয়েছে।

কেউ যদি খাবার পুর্বে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ না করে, সে তিনটি জিনিস ভোগ করবে- ১। শয়তান তার সাথে খাবারে যোগ দিবে, ২। যে খাবার সে খাবে তা তার শরীরে ব্যধি হিসাবে দেখা দিবে, ৩। খাবারে কোন বরকাত থাকবে না। বিসমিল্লাহ শরীফ বলে তবে খাবার থেকে সে তিনটি লাভ পাবে- ১। শয়তান তার সাথে খাবে না, ২। সে যে খাবার গ্রহন করবে তার শরিরের উপকারে লাগবে, ৩। খাদ্যে বরকত আসবে [যদি কেউ বলতে ভুলে যায় তাহলে সে যখন মনে আসবে তখন বলবে]।

<u>মুস্তাহাবঃ</u> অর্থ এমন কিছু যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জীবন কালে একবার বা দুইবার করেছেন। যে এটি করবে না তার জন্য কোন শাস্তি বরাদ্দ নেই। এটি না করার জন্য সে শাফায়াত থেকেও বঞ্চিত হবে না। যেমন, নাফিলা নামাজ আদায়, নাফিলার জারাখা, উমরা আদায় করা, নাফিলা হজ্জ, নাফিলা দান সাদকাত।

<u>মুবাহঃ</u> এমন কিছু যা ভালো উদ্দেশ্যে করলে সওয়াব রয়েছে এবং খারাপ উদ্দেশ্যে করলে গুনাহ হবে। এটি না করলে আজাবের সম্মুখিন হতে হবে না। হাটা, বসা, বাড়িকেনা, হালাল খাদ্য খাওয়া, সব ধরনের পোশাক পরিধান করা হালাল উপার্জন থেকে আসা।

<u>হারামঃ</u> এমন কিছু যা আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। এগুলা তাদের মধ্যে অন্যতম যা তিনি কুরআনে নিষেধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যে কোন হারামকে হালকাভাবে নিল সে কাফির। যে কোন হারাম কাজ করে তবে জানে যে এটি হারাম তবে সে কাফির হবে না। সে ফাসিক হবে। ইবনে আবিদিন রহমাতুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তোমরা কোন ফাসিক ইমামের [ইমাম হচ্ছেন যিনি জামাতে নামায পরিচালনা করেন, এটি সম্পর্কে বিস্তারিত অশেষ রহমত কিতাবের ২০ নম্বর অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে] সাথে নামায আদায় করবে না। ফাসিক হল সেই ব্যক্তি যে মদ পান করে, যিনা করে, বা সুদ নেয়। ইমামের কথায় জুমআর নামায আদায় করতে হবে। এই বিষয়ে, একজন মুসলিমের জামাতে নামাযের গুরুত্ব কিতাবের ২৪ তম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। কোন ফাসিক ইমামের চাইতে অন্য মসজিদে গিয়ে সালিহ ইমামের সাথে নামায আদায় করতে হবে। একজন ফাসিক ব্যক্তির সাথে

মর্যাদাহানিকর ব্যবহার করা ওয়াজিব। যদি জানা যায় যে সে ফাসিক তবে তাকে ইমাম বানানো যাবে না। তাকে ইমাম বানানোর অর্থ হল সে একজন মহৎ মানুষ। এবং সকল শ্রদ্ধার অধিকারী। কোন ব্যক্তি যদি ফাসিক হয় তবে সে কোন মাযহাবের অনুসারী নয়। তাকে ইমাম বানান মাকরুহে তাহরিম। হারামকে এড়িয়ে যাওয়াই **তাকওয়া**। যে বিষয়ে হারাম বা হালাল হওয়াতে সন্দেহ রয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়া হল **ওয়ারা**। আর হালাল ছাড়া সন্দেহজনক এরুপ কিছু করা হল **যুহুদ**। কোন মুসলিম যদি দারুল হারবে অবস্থান করে তবে তার উচিত দারুল ইসলামে চলে যাওয়া।

দুই ধরনের হারাম রয়েছে- একটি **হারাম লিআইনিহি** এবং অপরটি **হারাম লিগাইরিহি**। যেমন, সমকামিতা, ব্যভিচার, জুয়া, শুকর খাওয়া, মেয়েদের বাহু মাথা এবং পা বের করে রাস্তায় বের হওয়া। কোন ব্যক্তি যদি বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে হারাম গ্রহণ করে এবং এটি অগ্রাহ্য করে যে আল্লাহ্ তায়ালা এটি তার জন্য হারাম করেছেন তবে সে কাফির। যারা এই সব পাপ করবে কিন্তু বিশ্বাস করে যে এগুলো নিষেধ এবং আল্লাহ্ তায়ালার আজাবের ভয় করে তারা কাফির নয় তবে তারা কঠিন আজাবের মুখোমুখি হবে। হারাম কাপড় চোপর হল যা হারাম উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত। যেমন, কারো বাগানে ঢোকা, ফল ছেড়া, এবং মালিকের অনুমতি ছাড়া ফল খাওয়া, কারো বাড়ির কোন সম্পত্তি বা টাকা চুরি করা। তবে এসব করার সময় কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে করে তবে সে কাফির হবে না। কেউ যদি কারো সম্পত্তি থেকে অন্যায় উপায়ে একটি শস্যদানা পরিমান আত্মসাৎ করে তবে বিচার দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা এর সাত শরাকাত জামাতে আদায় করা কবুল নামায নিয়ে নিবেন। হারাম এড়িয়ে চলা ইবাদত অপেক্ষা বেশি সওয়াব হয়।

<u>মাকরুহঃ</u> মাকরুহ এমন কিছু যা আমলের দ্বারা উপার্জিত সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। দুই ধরনের মাকরুহ আছে, কারাহাতে তাহরিমিয়্যা এবং কারাহাতে তানজিহিয়্যা। কারাহাত এ তাহরিমিয়্যা এড়িয়ে চলা ওয়াজিব। এটি হারামের কাছাকাছি। কেউ যদি এটি নিয়মিত করে তবে সে দিন দিন পরিনত হয় আনুগত্যহীন এবং পাপিষ্ঠ। সে দোজখের আগুন এর প্রতিক্ষা করে। সে নামাযে এরুপ করলে তাকে নামায আবার পুনরায় আদায় করতে হবে। সে যদি ভুলে এটি করে তবে তাকে সেজদায়ে সাহু [এটি সম্পর্কে বিস্তারিত অশেষ রহমত কিতাবের ১৬ নম্বর অধ্যায়ের চতুর্থ পরিছেদে বর্ণনা করা হয়েছে] দিতে হবে।

এক্ষেত্রে নামায পুনরায় পড়ার জরুরত নেই। যে ব্যক্তি কারাহাতে তানজিহিয়্যা করে, সে আজাবের সম্মুখিন হবে না। তবে সে এটি অভ্যাসে পরিনত করলে সে শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে। যেমন, ঘোড়ার মাংস খাওয়া, বিড়াল বা ইদুরের খাওয়া কোন খাবার খাওয়া, মদ তৈরিকারীর কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা।

মুফসিদ হল যা আমলকে হালকা বা ধ্বংস করে দেয়, যেমন, কারো ইমান বা নামায নষ্ট করা, নিকাহ ,হজ্জ, যাকাত বা কিছু কেনা বেচার নষ্ট করে দেওয়া। একজন মুসলিম যদি ফরয সুন্নাত এবং ওয়াজিব আদায় করে এবং হারাম এবং মাকরুহ থেকে বিরত থাকে তবে সে অনেক **সওয়াবের** অধিকারী হবে এবং পরকালে শান্তি লাভ করবে।কেউ যদি হারাম এবং মাকরুহগুলোকে করে এবং ফরয, সুন্নাত, ওয়াজিবকে অবজ্ঞা করে তবে সে **পাপিষ্ঠ** হিসাবে রেকর্ডিত হবে। একটি হারামকে এড়িয়ে যাওয়ার সওয়াব একটি ফরয আদায় অপেক্ষা অনেক বেশি। একটি ফরযের সওয়াব একটি মাকরুহ হতে বিরত থাকা অপেক্ষা বেশি যা একটি সুন্নাত থেকেও বেশি। মুবাহের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা যা পছন্দ করেন তা হল **খায়রাত** এবং **হাসানাত**। যদিও এই সওয়াবগুলো যে ব্যক্তিকে দেওয়া হবে তার সুন্নাতের মর্যাদা এর থেকে বেশি। একে বলা হয় **কুরবাত্ত** অর্থাৎ এমন কিছু নিয়মিত করা যা থেকে পুরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি খুব সহনশীল, তাই তিনি ধর্ম নাজিল করছেন যা প্রশান্তি এবং আরামের উৎস। শেষ ধর্ম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম। অন্যান্য ধর্মগুলো খারাপ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যে কোন মুসলিম বা অমুসলিম যদি পরিপূর্ণভাবে এই দ্বীন মেনে চলে, জেনে অথবা না জেনে, সে দুনিয়াতে কোন সমস্যায় পতিত হবে না। এর উদাহরণ আমেরিকা এবং ইউরোপের যেসব অবিশ্বাসীরা এর আদর্শের বিশিষ্টে কর্ম করে। তবে অবিশ্বাসীরা পরকালে কোন বিনিময় পাবে না। যে ব্যক্তি ইসলামকে অনুসরণ করবে এবং ইসলামকে মেনে চলবে পরকালে সে অপার সুখের জান্নাত লাভ করবে।

ইসলামের ভিত্তিঃ

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি কালিমায়ে শাহাদাত। এটির অর্থ জানা এবং বিশ্বাস করা। দ্বিতীয়টি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। তৃতীয়টি পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা। চতুর্থটি যাকাত আদায় করা যখন এটি ফরয হয়। এবং পঞ্চমটি সামর্থবান সকলকে জীবনে একবার হলেও হজ পালন করা। [ইসলামের ভিত্তিসমুহ সম্পর্কে বিস্তারিত অশেষ রহমত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে চতুথ এবং পঞ্চম অধায়ে]।

এই পাঁচটি আদেশ মেনে চলা এবং তার নিষেধসমুহ হতে বিরত থাকাকেই বলে **ইবাদাত**। যে ব্যক্তির উপর হজের শর্তগুলো পরিপূর্ণ হয় নি তার জন্য হজ করা নাফিলা ইবাদাত এবং যে একবার পালন করেছে তার জন্য আবার করাও নাফিলা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এমন কোন নফল ইবাদত করা উচিত নয় যা বিদআত বা হারাম সৃষ্টি করে। হযরত ইমাম রব্বানি কুদ্দিসাসিররু তার উনত্রিশ, একশত তেইশ এবং একশত পঁচিশ নম্বর চিঠিতে এবং ছাব্বিশ নম্বর **মাকামাতে মাজহারিয়ার** চিঠিতে, উমরা বা নফল হাজ এর অনুমতি দেন নি। আফিদুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন এসাদ ইয়াফি রহমাতুল্লাহ [৬৯৮-৭৬৮ হিজরি ১২৯৮-১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দ, ইয়েমেন] মক্কা নগরী তার জুহদ অনুসরণ করে, যার একটি গ্রেডের নাম মাকামাত এ আশারা। তার কিতাব **নাশর উলমাহাসিন ইলগালিয়্যা**তে যখন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং ওলি ইমাম নববি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সকল প্রকার সুন্নাত মেনে চল কিন্তু তুমি অনেক বড় একটি সুন্নাত এড়িয়ে গেছো যা হল নিকাহ। এর জবাবে তিনি বলেন, আমি ভয় করি, এর ফলে হয়তো একটি সুন্নাত পালন করতে গিয়ে আমি অনেক হারাম কাজে জড়িয়ে পরবো।

ইমাম ইয়াহিয়া নববি দামেস্কে ৬৭৬ সনে ইন্তেকাল করেন। পাকিস্তান **জামেয়া হাবিবিয়ার উীন** প্রফেসর হাবিবুর রহমান ১২০১ হিজরি অর্থাৎ ১৯৮১ সালে হজে যান। সেখানে তিনি দেখতে পান যে ওহাবি ইমাম লাউড স্পিকারে নামায পড়াচ্ছেন তখন তিনি নিজে আলাদা নামায আদায় করেন। এরপর তাকে হ্যান্ড কাফ পরিয়ে হাজতে নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কেন সে জামাতে নামায পড়ে নি। যখন তিনি বলেন ইমামের জন্য লাউড স্পিকারের মাধ্যমে নামায পড়ানো জায়েয নয় তখন তাকে আর হজ করতে দেওয়া হয়নি। ফিরিয়ে দেওয়া হয়। একজন

মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সে যেখানেই থাকুক না কেন তার ঈমানে অটল থাকবে। আগে স্কলারদের কাছ থেকে দ্বীন শেখা সহজ ছিল। এখন কোথাও তেমন ইসলামিক স্কলার পাওয়া যায় না। ব্রিটিশদের নিয়োগপ্রাপ্ত অজ্ঞ ও মূর্খরা দূর-দুরান্তে ইসলামের নামে ছড়িয়ে পরেছে। একমাত্র উপায় আহলে সুন্নাতের লিখা বই পড়া। এসব বই পাওয়া আল্লাহর বিশাল এক অনুগ্রহ। ইসলামের শত্রুরা যুবকদের পথভ্রষ্ট করার জন্য ভুল বই ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা প্রকৃত বই হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তরুণরা বিভিন্ন আকর্ষণীয় গেইমস এবং অন্যান্য কজে মন দিচ্ছে বই না পড়ে। এটা হতাশাজনক যে অনেক যুবক এখন গেইমস ছাড়া কিছু ভাবতেও পারে না। এই সব যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই মহামারী থেকে মুসলিম অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। এজন্য বাচ্চাদের তাদের ঈমান এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে জানাতে হবে এবং ধর্মীয় বই পড়ার প্রতি নজর দিতে হবে। এভাবে তাদের ক্ষতিকারক সময় ক্ষেপণ হতে রক্ষা করা যাবে। আমরা দেখতে পাই অনেক বাচ্চারা এতটা মগ্ন হয়ে গেইমস খেলে যে তারা খাওয়ার কথাও ভুলে যায়। এসব শিশুদের জন্য এমনকি তাদের স্কুলবই পড়ে পাশ করাও কঠিন। অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের বই পড়ার দিকে উৎসাহিত করা। **ইসলামের এথিকস**সমুহ পড়তে হবে। যারা এগুলো পড়বে তারা শুধুমাত্র ইসলাম সম্বন্ধে জানবে তা নয় তারা ইসলামের শত্রুদের সম্মন্ধেও জানবে এবং তারা কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারবে। যদি পিতামাতা তা করতে ব্যর্থ হন তবে একটি অধার্মিক এবং এথিস্ট যুবসমাজ গড়ে উঠবে। যারা দেশ, জাতি ও মিল্লাতের ক্ষতি করবে। আরেকটি বিষয়ে অবিভাবকদের নজর দেওয়া উচিত। তা হল মেয়েদের সতর। আমরা দেখতে পাই শরীরের বিভিন্ন অংগ বের করে মেয়েরা সবার মাঝে হেটে যায়, বিভিন্ন খেলায় অংশ নেয়। আওরাত এর অংশসমূহ ঢাকা একটি অন্যতম ফরয। যারা এটিতে গুরুত্ব দেয় না তারা ঈমানহারা হতে পারে। মুসলিমরা মসজিদে যায় অধিক সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে। এসব কারণ ছাড়াও মসজিদে যাওয়া অনেক সওয়াবের।

তবে উন্মুক্ত আওরাত বিশিষ্ট দর্শনীয় কোন স্থান মসজিদ হতে পারে না। এটি ফিসক বা পাপের সমাবেশ। যারা এ রকম মসজিদে যায় তারা প্রকৃতপক্ষে ফিসকের মাঝে যায় এবং গুনাহগার হবে। যারা এ রকম জায়গায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে যায় তারা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের অধিকারী হবে। যেহেতু এটি একটি বড় গুনাহ কারো আওরাত এর অংশের দিকে তাকানো এমনকি এটি

দেখানোও বড় গুনাহ। সুতরাং যারা এরুপ স্থানে যায় তারা সওয়াবের পরিবর্তে গযবে ইলাহি নিশ্চিত করে।

নামায অধ্যায়

নামাযের ১২টি ফরয রয়েছে। তন্মধ্যে বাহিরের ফরয ৭টি আর ভিতরের ফরয ৫টি।

বাহিরের ফরযগুলো হলোঃ ১। অপবিত্রতা হতে ত্বাহারাত (পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা), ২। নাজাসাত হতে পবিত্রতা, ৩। সতর ঢাকা, ৪। ক্বিবলামুখী হওয়া, ৫। ওয়াক্ত বা নির্দিষ্ট সময়, ৬। নিয়্যত, ৭। তাক্ববীর-ই-ইফতিতাহ।

ভিতরের ফরযগুলো হলোঃ ১। ক্বিয়াম, ২। ক্বিরাত, ৩। রুকু করা (প্রত্যেক রাকাতে একবার করে), ৪। সেজদাহ করা (প্রত্যেক রাকাতে দুইবার), ৫। শেষ বৈঠকে বসা (তাশাহুদ পড়া অথবা ততোক্ষন বসে থাকা)। নামাজের ভিতরের এই সব ফরযকে **রুকন** বলে। সেজদার সময় কপাল এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি জমিনে রাখা।

ত্বাহারাত বলতে বুঝায় শরীরকে পবিত্র করা। অর্থাৎ অযু না থাকলে অযু করা, জুনুবী অবস্থায় থাকলে গোসল করা এবং পানির অভাব থাকলে অযু বা গোসল এর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা।

শরীরের পবিত্রতা আদায়ের ৩টি মুলনীতি: অতি সতর্কতার সাথে ইসতিনজা বা ইসতিবরার (অধ্যায়ের শেষে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে) দিকে লক্ষ্য রাখা, যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হবে এবং মাথা মাসেহ করা হবে তখন যেন কোন অংশই বাদ না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

নাজাসাত হতে পবিত্রতা অর্জনের ৩টি মুলনীতিঃ নাজাসাত হতে নিজের পরিধেয় পোষাক পবিত্র রাখা, নামাজের পূর্বে শরীর পাক রাখা, নামাজের স্থানকে পবিত্র রাখা। (অনুগ্রহ পূর্বক এ অধ্যায়ের শেষে ৫৪ ফরয সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন!)

সতর-ই- আওরাত সম্পন্ন হওয়ার জন্য ৩টি মুলনীতিঃ হানাফি মাযহাব

অনুযায়ী পুরুষের সতর হল নাভী থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা। নামাযের সময় পা ঢেকে রাখা পুরুষের জন্য সুন্নত। মহিলাদের মধ্যে, স্বাধীন নারীর জন্য তার হাত এবং মুখ ছাড়া পূর্ণশরীর ঢেকে রাখা সতর। তবে তাদের পা খোলা রাখার পক্ষে একজন স্কলারের মত পাওয়া যায়। পরাধীন নারী বা দাসীর জন্য সতর হলো তার বুক ও পিঠের উপরের অংশ হতে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। কোন মহিলা যদি মাথা, হাত এবং পা উন্মুক্ত রেখে বাইরে বের হয় অথবা টাইট এবং এমন পাতলা কাপড় পড়ে বের হয় যে সব অঙ্গ বুঝা যায় তাহলে সেটা হারাম হবে এমনকি কোন পুরুষ তার দিকে নজর দিলে তার পাপ হবে। কোন ব্যক্তি যদি এই হারামকে হারাম হিসেবে মানতে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে, অর্থাৎ একজন মুরতাদ।

ক্বিবলামুখী হওয়ার জন্য ৩টি প্রয়োজনীয় বিষয়ঃ নামায শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজের বক্ষকে ক্বিবলা হতে অন্যদিকে না সরানো। আল্লাহ আজিমুশশানের দিওয়ান- ই-মানাওয়ী এর কাছে নিজেকে নম্র ও নিরহঙ্কারীভাবে উপস্থাপন করা।

নামাজের সময় সংক্রান্ত ৩টি প্রয়োজনীয় বিষয়ঃ ১– নামায শুরুর এবং শেষ হওয়ার সময় জানা, ২- কখন নামায পড়া মাকরুহ সেটা জানা, ৩– এবং তখন নামায না পড়া।

নিয়্যত হলো এটা জানা এবং অন্তরে অনুধাবন করা যে নামাযটি আপনি পড়ছেন সেটা কি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি মুস্তাহাব, এবং সেটা মন থেকে মুখে উচ্চারণ করা। ইমামে আযাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে বিতরের নামাযের নিয়ত করা ওয়াজিব এবং বাকি দুই ইমামের মতে (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)) সুন্নত, এবং শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ীও সুন্নত। (মালেকী মাযহাবের কোন একজন অনুসারীর জন্য ওহারাজ (ইসলামের আলোকে ওজর থাকলে) এর কারণে বিতর ছেড়ে দেয়া অনুমোদনযোগ্য হবে)। তাক্ববীর-ই- ইফতিতাহ হলো মানুষ তার হাতকে কান পর্যন্ত উঠাবে এবং অন্তরকে জাগ্রত ও সতর্ক রাখবে।

ক্বিয়াম সম্পন্ন হওয়ার শর্ত ৩টিঃ ১– ক্বিবলা মুখী দাঁড়ানো; ২- সেজদার দিকে দৃষ্টি রাখা (অর্থাৎ যেখানে কপালও নাক স্পর্শ করবে সেদিকে দৃষ্টিকে একাগ্র রাখা); এবং ৩– নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেহকে এপাশ ওপাশ না দোলানো।

ক্বিরাত আদায় হওয়ার শর্ত ৩টিঃ ১– যেসব নামাযে জোরে তেলাওয়াত করা আবশ্যক সেসব নামাযে জোরে এবং যেসব নামাযে নীরবে তেলাওয়াত করা আবশ্যক সেসব নামাযে অন্ততঃ পক্ষে এমনভাবে তেলাওয়াত করা আবশ্যক যাতে নিজের কান সেগুলোকে শুনতে পারে এবং উচ্চারণ সঠিক হয়, ২–নামাযে পঠিত আয়াতগুলোর অর্থ চিন্তা করা। নামাযে পঠিত আয়াতগুলোতে তাজবীদের নিয়মগুলো যথাযথভাবে মান্য করা, ৩– নামাযের শুরুর তাকবীর এবং নামাযের ভিতরে উচ্চারিত সকল কিছু অবশ্যই আরবী ভাষায় হতে হবে।

কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে আরবী শব্দের উচ্চারণ করতে হয় তা এমন একজন হাফিজের কাছে শিখতে হবে যিনি তার মাযহাবের ইলমে হাল্ক বইসমুহে বর্ণিত নিয়ম কানুন মেনে চলেন। ল্যাটিন হরফে (ইংরেজি) লিখিত কুরআনুল কারিমের আয়াতসমুহ সঠিক ও শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা যায় না (আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বাংলায় লিখা কুরআনেও একই সমস্যা)। এভাবে (ল্যাটিন হরফে/ বাংলা হরফে) পড়লে ভুল ও ত্রুটিপুর্ণ হয়। তবে কুরআনের তাফসির বা অনুবাদ ল্যাটিন বা বাংলা যে কোন ভাষায় পড়া যায়।এটা অনুবাদ অতএব প্রশ্নের বাইরে। কুরআনের তার্কিশ সংস্করণ নামেযে বইগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিছু অধার্মিক ও লা-মাযহাবী লোকের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এগুলো মোটেই সঠিক নয়। এগুলো ভুল এবং দ্বিধাগ্রস্থ। প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত কুরআন শিক্ষার কোর্সসমুহে অংশ নেয়া, ইসলামি অক্ষরগুলোকে শিখা। কেবল এভাবেই সঠিকভাবে কুরআনে কারিম তিলাওয়াত ও নির্ভুলভাবে নামায আদায় করা যায়। আয়াতে কারিমাগুলোর নির্ভুল তিলাওয়াত এবং সঠিকভাবে আদায়কৃত নামাযই শুধু কবুল হবে। **তারগীব-উস- সালাত** নামক বইতে বলা হয়েছে– "নামাযে যে আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করা হয় তা যদি নয়জন ইসলামিক স্কলারের মতে ভুল হয় এবং একজনের মতে

শুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা তার নামাযের দিকে তাকাবো না বরং সেটা হবে ফাসেদ নামায। (কোন ইবাদাতকে তখনই ফাসেদ বলা হয় যখন সেটা গ্রহণযোগ্য নয়)।

রুকু সম্পন্ন করার জন্য তিনটি মুলনীতিঃ ১–ক্বিবলামুখী হয়ে রুকু করা, ২-সঠিকভাবে বাকা হওয়া (এমনভাবে বাকা হতে হবে যাতে ইংরেজি হরফ। এর উল্টা মতো দেখায়), কোমড় এবং মাথা কাধ বরাবরে থাকতে হবে। ৩- একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকতে হবে যাকে বলা হয় তুমানিনাত, (অর্থাৎ যতক্ষন না অন্তর সন্তুষ্ট হয় ততক্ষন পর্যন্ত)।

সেজদাহ সম্পন্ন হওয়ার তিনটি মুলনীতিঃ সেজদাহের জন্য অবনত হওয়ার সুন্নতি নিয়ম হলো- ১- ক্বিবলামুখী হয়ে সিজদাহ করা, ২- কপাল ও নাক জমিনে লাগানো এবং একই লাইনে রাখা, ৩- একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ তুমানিনাত পর্যন্ত সেজদাহতে থাকা।

একজন সুস্থ মানুষের জন্য নামাযের বিছানা থেকে ২৫ সেমি পর্যন্ত উচু জায়গায় সেজদাহ করা অনুমোদনযোগ্য (যখন তারা নামায পড়ে), এমনকি এটা করাও মাকরুহ। কেননা আমাদের নবী কখনই নামাযের বিছানা থেকে উচু জায়গায় সেজদাহ করেন নি, এমনকি আসহাব-ই-কেরামগণও এমন করেন নি। উচু জায়গায় সেজদাহ করলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

কাযা-ই- আখিরা সম্পন্ন হওয়ার জন্য তিনটি মুলনীতি রয়েছেঃ ১- পুরুষের জন্য বাম পায়ে বসবে এবং ডান পা সোজা রাখবে, অন্য দিকে মহিলাদের জন্য এমনভাবে বসা উচিত যাকে বলা হয় তাওয়াররুক, যার মানে হলো দুই পা ডান ভাজ করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসবে, ২- নিষ্ঠার সাথে ওতাহিয়্যাতু পড়বে, ৩- ক্বাদা-ই-আখিরার সময় (শেষ বৈঠকে), সালাওয়াত (দরুদ) এবং অন্যান্য দুয়া পড়বে। নামাযের শেষে পঠিত দুয়াসমূহ এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করা হবে।

গোসল অধ্যায়

গোসলের ফরযঃ হানাফি মাযহাবের মতে গোসলের ফরজ ৩টি, মালিকী মাযহাবের মতে ৫টি, শাফেয়ী মাযহাবের মতে ২টি, এবং হাম্বলি মাযহাবের মতে একটি।

হানাফি মাযহাব অনুযায়ীঃ

১- পানি দ্বারা মুখের ভিতরে একবার ধৌত করা। দাঁত ও দাঁতের মাড়ি ভিজানো ফরযের অন্তর্ভুক্ত। (অতি প্রয়োজন ছাড়া হানফি মাযহাব অনুসারী কোন মুসলিম দাঁতে ক্যাপ বা ফিলিং করতে পারবে না। প্রয়োজনে তারা নকল দাঁত লাগাতে পারবে যাতে করে গোসলের সময় সেটা খুলে ঠিকভাবে ধৌত করা যায়। যদি কোন মুসলিম অতি প্রয়োজন ছাড়াই দাঁতে ক্যাপ বা ফিলিং করিয়ে ফেলে তাহলে সে অসুবিধা এর কারণে ওযর এর সম্মুখীন হবে, তখন গোসলের সময় সে মালেকী বা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করতে পারবে। এমতাবস্থায় গোসলের বা নামাজের অযুর প্রয়োজন হলে নিয়তের সাথে এটা যোগ করবে যে, "আমি শাফেয়ী (বা মালেকী) মাযহাবের অনুসরণ করছি,, ২- নাকের ছিদ্রে একবার করে পানি পৌছানো, ৩- সমগ্র শরীর একবার ধৌত করা। শরীরের অসুবিধাজনিত অঙ্গসমুহ বাদ দিয়ে সমস্ত শরীর ধৌত করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। যদি শরীরের কোন অংশ জরুরাত এর কারনে ধৌত করা না যায়, যেমনঃ দূর্ঘটনার ফলে এমন কিছু হল যেটা ব্যক্তির অনিচ্ছায় হয়ে গেছে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তার গোসল সহীহ (শুদ্ধ) হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

`দুররুল-মুখতার, বই অনুযায়ী, দুই দাঁতের মাঝে আটকে থাকা কোন খাবার বা দাঁতের মাড়িতে আটকে থাকা খাবারের কারণে গোসল অশুদ্ধ হবে না। এটা হল ফতোয়া [১] অনুযায়ী । কেননা, পানি খাবারের ভিতরে ঢুকে যাবে এবং তাকে ভিজিয়ে দিবে। তবে যদি খাবারটা কঠিন পদার্থ হয় তবে পানি তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। আর এটাই হলো এ বিষয়ের আসল কথা। **ইবনে আবেদিন** (রঃ) বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ এটা খুলাসাত-উল- ফতোয়া বইতেও আছে যে, এটা (গোসল) শুদ্ধ হয়ে যাবে কেননা পানি তরল হওয়ায় এটা খাবারের ভিতরে প্রবেশ করবে (সুতরাং খাবারকে ভিজিয়ে দিবে)। অবশ্য যদি এমন হয় যে, যদি পানি খাবারের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে তবে গোসল শুদ্ধ হবে না, এটা সর্বসম্মত ভাবে আলেমগণের মত। একই ধরনের মত পাওয়া যায় **`হিলইয়াত-উল- মুযাল্লি,** নামক বইতেও, (লিখেছেন ইবনে আমির হাজ্ব হালাবি

(রঃ) ৮৭৯ হিজরী, ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে) যদি দাঁতে লেগে থাকা খাবারের অংশগুলো অনবরত চাপ লাগার পরেও কঠিন পদার্থই থেকে যায় তবে তাতে ঐ খাবারের ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারবে না, এ অবস্থায় গোসল করলে সেটা শুদ্ধ হবে না। কেননা এটাতে কোন জরুরাত নেই [অন্য কথায়, এটা অনিচ্ছায় হয়নি], অথবা এটা কোন রকমের `হারায, ও নয় [অর্থাৎ পরিস্কার করায় কোন অসুবিধা নেই, চাইলেই পরিস্কার করা যায়]।

`হালাবি-ই সাগির,** বইতে লিখা আছে, যদি দাঁতের ফাকে রুটি বা অন্যান্য খাদ্য থাকা বস্থায়ও কেউ গোসল করে তবে সেটা সহীহ হয়ে যাবে, ফত্বোয়া অনুযায়ী, এমনকি সে যদি এটাও মনে করে যে পানি (গোসলে ব্যবহৃত) দাঁতের ফাকে প্রবেশ করেনি। **`খুলাসাত-উল-ফতোয়া, বই অনুযায়ীও এ ফতোয়াকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কতিপয় আলেমের মতে, যদি খাদ্য কণা কঠিন পদার্থ হয় তবে গোসল সহীহ হবে না। এই সর্বশেষ ফয়সালাটা **`যাহীরাত-উল-ফাত্বোয়া,** বইতে দেয়া হয়েছে (লিখেছেন বুরহানুদ্দিন মাহমুদ বিন তাজুদ্দিন আহমেদ বিন আব্দুল আযীয বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জন্ম ৫৫১ হিজরী [১১৫৬ খ্রীস্টাব্দ]- শহীদ ৬১৬ হিজরী [১২১৯ খ্রীস্টাব্দ])। এটা সুযুক্তিপূর্ণ একটা ফয়সালা। কেননা, ব্যবহৃত পানি তার নীচে পৌছুতে পারবে না। এবং এটা `জরুরাত,ও নয় `হারায,ও নয়।

`দুররুল-মুন্তাক্বা,** [২] বইয়ে নিম্নরুপ বলা হয়েছে- দাঁতের ফাকে খাবার লেগে থাকা অবস্থায় গোসল সংক্রান্ত আলোচনায় কিছু আলেম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে গোসল সহীহ হয়ে যাবে, যদিও অন্যান্যরা ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। তবে সতর্কতা জন্য, পূর্বেই হাত দ্বারা লেগে থাকা খাবার বের করে ফেলা যায়। **`মারাক-ইল-ফালাহ,তে তাহতায়ীর ভাষ্য মতে, যদি দাঁতের ফাকে বা দুই দাঁতের মাঝে খাবার লেগে থাকে তবুও গোসল সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, পানি হলো তরল পদার্থ এবং তাদের ভিতরে সহজেই চুয়ে যাবে। যদি খাবার চাবানোর পরেও শক্ত থাকে, তবে তা গোসল সহীহ হওয়াকে বাধাগ্রস্থ করে। আর এমনই লেখা আছে `ফাতহ-উল-ক্বাদির, নামক বইয়ে।

**`বাহরুর-রাইক,** নামক বইয়ে আছে, যদি দাঁতের ফাকে বা দুই দাঁতের মাঝে খাবার লেগে থাকে তবুও গোসল সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, পানি হলো নিখুত পদার্থ যাযে কোন কিছুর ভিতরেই সহজে চুয়ে যাবে। `তেজনিস, (বাতা জনিস) নামক বইতেও একই কথা বলা হয়েছে। সদরুস-শেহীদ হুসামাদ্দিন বলেছেন, এ

অবস্থায় গোসল সহীহ হবে না এমন কি অবশ্যই লেগে থাকা খাবার বের করতে হবে এবং দাঁতের কোটরে পানি প্রবাহিত করতে হবে। খবার বের করে ভালোভাবে ধৌত করাই নিরাপদ।

---

[১] ফতোয়া হলো চূড়ান্ত ব্যাখ্যা যেখানে একজন বিজ্ঞ ইসলামি আলেম ধর্মীয় বিষয়ে কোন মুসলিমের প্রশ্নের উত্তর দেন। যে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে তিনি ফতোয়া দেন সেটা প্রদানকৃত ফতোয়ার সাথে যুক্ত করে দেন।
[২] আলাউদ্দীন হাসকাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি লিখেছেন (জন্ম ১০২১ হি- মৃত্যু ১০৮৮হি [১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দ])

`ফতোয়া-**ই- হিন্দীয়া**, বইয়ে বর্ণিত আছেঃ এ যুক্তিটাই সত্যের কাছাকাছি যে, দাঁতের ফাকে বা দুই দাঁতের মাঝে লেগে থাকা খাবার অবস্থায় কোন ব্যক্তি গোসল করলে সেটা সহীহ হয়ে যাবে।একই যুক্তি `**জাহীদী**তেও লেখা আছে। তারপরেও, এটাই যুক্তিযুক্ত যে আগে খাবার বের করা অতঃপর দাঁতের ফাকে পানির প্রবাহ দেয়া। এমনই বলা হয়েছে **ক্বাযীখান** পুস্তকে। **নাতিফি** নামক বইতে বলা হয়েছে যে, দাঁতের চারিপাশে খাবার লেগে থাকা অবস্থায় গোসল করলে সেটা পরিপূর্ণ হবে না এবং খাবার বের করে দিয়ে তারপর সুন্দরকরে পরিস্কার করতে হবে।

আল-মেজমুয়াত-উয যুহদিয়্যা বইয়ে লিখা আছে, যদি দুই দাঁত এর ফাকে লেগে থাকা খাবার শক্ত ময়দার কাঁই এর মতো হয় এবং পানি ঢুকতে বাঁধা দেয়, পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে, তবে তা গোসল সহীহ হতেও বাঁধা দেয়। একই কথা লিখা আছে **হালাবি**তেও। এটা বিচারিত হবে না যে, এখানে কোন হারায (অসুবিধা) নেই, কারণ লেগে থাকা খাবার সরিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু ফিলিং বা ক্যাপ লাগানো দাঁততো সরানো সম্ভব নয়; সুতরাং এক্ষেত্রে ফিলিং বা ক্যাপ সরানো হারায। হ্যা এখানে হারাযের বিধান গণ্য হবে। যতক্ষণ না মানুষ এমন কিছু করা যেটা হারাযের কারণে হয়, তখন সেটা অন্য মাযহাব মানার ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে এটা কোন ফরয ত্যাগ করার ওযর হিসেবে গ্রহনীয় হবে না। একজন ব্যক্তিকে বল তখনই কোন একটি ফরয পালন থেকে মুক্তি পেতে পারে যখন সে অন্য মাযহাবে বর্ণিত সুযোগ দাঁত পরে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে যদি কেউ ফিলিং বা ক্যাপ লাগায়। তখন কি এমন করা জরুরাত হবে না? (অর্থাৎ, এজন্য ফরয পালন থেকে এবং এভাবে দাঁতের ফাঁক ধৌত করা থেকে মুক্তি)„

তখন আমাদের জবাব হলো ”যখন জরুরাত দেখা দেয় তখন অন্য মাযহাবের অনুসরণে কোন বাঁধা নেই„।

যুক্তি আছে ”গোসলের সময় দাঁত ধৌত করার হুকুম হল ফিলিং বা ক্যাপের বাইরের অংশে পানি প্রবাহিত করা,„ কিন্তু এটা ইসলামে পুরোপুরি সঠিক বলে গণ্য হয় না। তাহতাওয়ী (আহমেদ বিন মোহাম্মাদ বিন ইসমাঈল) **ইমদাদ-উল-ফাত্তাহ** নামক বইয়ের পাদ টীকায় বর্ণনা করেছেনঃ ”কোন ব্যক্তি যদি অযু করে মোজা পরে এবং তারপর অযু ভাঙ্গে তাহলে তার এ অযু ভঙ্গটা তার পায়ের পরিবর্তে মোজার উপর প্রভাব ফেলবে (অর্থাৎ পুনরায় অযু করার সময় আর পা ধুতে হবে না শুধু মোজার উপর মাসেহ করলে ইহবে)„।[৩] এই বর্ণনাটা ফিকাহের কিতাবের `অযুও মোজার উপর মাসেহ, শীর্ষক আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। অতএব এই ফাত্বোয়া থেকে ক্যাপ পরানো অবস্থায় অযু এমন কি গোসলও করা যাবে এমন ধারনা করলে সেটা এই ইস্যুতে নিজ উদ্যোগে ফাত্বোয়া দিয়েছে বলেই মনে করা হবে। এমন কি ক্যাপ পরানো দাঁতের সাথে অযুর সময় মোটা দাঁড়ির নীচের চামড়া ধৌত করার ফতোয়ারও তুলনা করা যাবে না, এটা ফরয (অতএব এটা করা আবশ্যক)। গোসলের সময় দাঁড়ির নীচের চামড়া ধৌত করা ফরয।

৩- ”**অবিরাম কল্যাণ**„ এর চতুর্থ গুচ্ছের তৃতীয় অধ্যায়ে `ওযর, সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন।

দাঁড়ির নীচের চামড়া ধৌত করা ফরয নয় যেহেতু অযু করার সময়ও ঘন দাড়ির নীচের চামড়া ধৌত করা ফরয নয়,„ এবং সে তার ঘন দাঁড়ির নীচের চামড়া ধৌত করে না। তাহলে ঐ ব্যক্তির গোসল এবং যারা এমনটা বিশ্বাস করে তাদেরও, এবং তার ফলে তারা যে নামায পরে, কোনটাই সহীহ হবে না। এখানে ফিকহের বিধানকে চিঁড় ধরা বা ভাঙ্গা- পায়ে অথবা ভাঙ্গা-হাতে কাঠের ব্যান্ডেজ লাগানোর সাথে দাঁতের ফিলিং বা ক্যাপ পরানোকে তুলনা করা সঙ্গত হবে না। কেননা, এ অবস্থায় বেন্ডেজ খুলে ফেললে ক্ষত স্থানের বা ভাঙ্গা অঙ্গের আরো বড়ো রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এখানে হারায রয়েছে, অতএব এখানে অন্য মাযহাবের অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। এই তিন অবস্থায়ই কোন ব্যক্তি নীচের (ব্যান্ডেজের) অঙ্গ ধৌত করা থেকে মুক্তি পাবে।

যদি আপনার ক্ষয়ে যাওয়া বা ব্যাথা যুক্ত দাঁত থাকে এবং আপনি সে গুলোকে নকল দাঁত দিয়ে পরিবর্তন করতে চাওনা তবে তাতে ফিলিং বা ক্যাপ পরানোর

স্বাধীনতা আপনার রয়েছে, এভাবে ফিলিং বা ক্যাপ লাগা্নো অথবা স্থায়ী- ব্রিজ লাগানো কোন জরুরাতের জন্ম দিবে না। এখানে এটাকে তখন আর জরুরাত বলা হবে না, বরং তার এ অবস্থাই আপনাকে আবশ্যকীয় নীচের অঙ্গ ধৌত করা থেকে মুক্তি দিয়েছে। কেননা, এখানে অন্য মাযহাবের অনুসরণ করা সম্ভব। কোন ব্যক্তিরই এমন ভিত্তিহীন যুক্তিকে কাজে লাগানোর অধিকার নেই যে, জরুরাতকে এমন মানুষের কঠোর সমালোচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে যে ফিকাহের বইগুলো মেনে চলে এবং শাফেয়ী বা মালিকী মাযহাবের অনুসরণ করে। **জরুরাত** মানে হলো অতি প্রাকৃতিক কারণ যেটা কোন কিছু করতে (অথবা, না করতে) বাধ্য করে, যেমন এমন কারণ যেটাতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। ইসলামি আদেশ ও নিষেধে জরুরাতের একটি উদাহরণ হলো, একটি প্রচন্ড ব্যাথা, কোন একটি অঙ্গহানির আশংকা বা জীবনহানির আশংকা, এবং অন্য কোন উপায় না থাকা। অন্যদিকে **হারায** মানে হলো কঠিন তা বা দুঃসাধ্য তা যেটা কোন কিছু করতে বাধা দেয় অথবা ফরয কোন কাজ করতে বাধা দেয় অথবা এমন কিছু করতে বাধ্য করে যেটা করা হারাম। আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ গুলোকে একত্রে **আহকাম -ই- ইসলামিয়্যা** বলে। যখন আহকাম –ই –ইসলামিয়্যা এর কোন একটি নিয়মকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, অর্থাৎ যখন কোন একটি আমল করা হবে অথবা কিছু বাদ দেয়া হবে, তখন ঐ বিষয় সম্পর্কে আপনার নিজের মাযহাবের বিজ্ঞ আলেমদের প্রদান করা বহুল পরিচিত ও বাছাইকৃত বিবৃতির আলোকে আমল করতে হবে। যদি ঐ আলেমের দেয়া বিবৃতি পালন করতে আপনার হারায (অসুবিধা) দেখা দেয় তবে আপনি কম গ্রহনযোগ্য এবং দূর্বল কোন মত আমল করতে পারবেন (যেটা আপনার নিজের মাযহাবেরই অন্য আলেমের দেয়া)। যদি এমনটা করতে ও হারায (অসুবিধা) দেখা দেয় তবে অন্য মাযহাব গ্রহণ করতে পারবে এবং এ বিষয়ে ঐ মাযহাবের উপর আমল করতে পারবে। যদি অন্য মাযহাবের উপর আমল করতেও হারায দেখা দেয় তাহলে দেখতে হবে এ অবস্থায় হারাযটি জরুরাত হবে কি হবে না।

১- যখন কোন হারায কাজ জরুরাতের সৃষ্টি করে (যেটা করা ফরয), তাহলে আপনি উক্ত ফরয পালন থেকে মুক্তি পাবেন।

২- যখন কোন হারায কিন্তু জরুরাতের সৃষ্টি করে না [যেমনঃ আঙ্গুলের নেইল পলিশ], অথবা জরুরাত সৃষ্টি করে এবং এটা করার অন্য পথও আছে কিন্তু আপনি হারায সম্পন্ন পথটিই গ্রহন করলে, তাহলে আপনার পথটি (হারাযের)

সহীহ হবে না। আপনাকে হারায বাদ দিয়েই বাতটিকে সম্পন্ন করতে হবে। হারায বা জটিলতার সময় অন্য মাযহাবের অনুসরণ করা উচিত (অর্থাৎ যদি আপনার বাছাই করা পথটি ও হারাযের সৃষ্টি করে), তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে জরুরাত আছে কি নাই, এটা লিখা আছে` **ফাত্বোয়া-ই-হাদিসিয়া**, নামক বইয়ে (লিখেছেন ইবনে হাযার মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৮৯৯হিঃ [১৪৯৪খ্রী]- ৯৭৪হিঃ [১৫৬৬খ্রী], মক্কা), এবং`**খুলাসাতুল তাহকিক**, (লিখেছেন আব্দুল গণি নাবলুসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ১০৫০হিঃ [১৬৪০খ্রী] ১১৪৩হিঃ [১৭৩১খ্রী],দামেস্ক), তাহতাহি রাহিমাহুল্লাহু তায়ালার ভাষ্য মতে শের বেলালি রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা তার বই `মেরাক -ইল- ফেলাহ ,তে, এবং হালীল এসিরদী রাহিমাহুল্লাহু তায়ালার কিতাব `**মাফুয়াতে**,ও এভাবে বলা হয়েছে। মোল্লা হালীল (এসিরদী) মৃত্যুবরণ করেছেন ১২৫৯হি [১৮৪৩খ্রী]। একজন হানাফী মুসলিম যখন তার দাঁত ব্যাথা বা ক্ষয় থেকে বাঁচার জন্য অপসারনীয় আলগা দাঁতের পরিবর্তে ফিলিং করাবে বা ক্যাপ পরাবে তখন সে গোসল করার সময় শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করতে পারবে। কেননা, এই দুই মাযহাব অনুযায়ী মুখের ভিতর ধৌত করা এবং নাকের ছিদ্রে পানি দেয়া ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাব মানাটা খুবই সহজ। তবে আপনাকে গোসল বা অযুর করার সময় এবং নামায শুরু করার সময় এ নিয়ত (অর্থাৎ অন্তর থেকে আসতে হবে) করতে হবে, যে আপনি শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করছেন, কিন্তু যদি নিয়ত করতে ভুলে যান তবে নামাযের পর যখনই মনে হবে তখনই নিয়ত সম্পন্ন করতে হবে। এই অবস্থায় আপনি যে অযু এবং গোসল করলেন এবং যে নামায পরলেন তা শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাব অনুযায়ী সহীহ (শুদ্ধ, গ্রহণ যোগ্য) হয়ে যাবে। তাদের জন্য (যারা গোসল বা অযুর ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহন করেছে) শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী, যদি আপনার ত্বক এমন কোন নারীর ত্বকের সাথে স্পর্শ করে যারা ১৮ জন নারীর বাইরে অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম তবে পুনরায় অযু করতে হবে এবং যদি আপনার হাতের তালু আপনার লজ্জা স্থান (লিঙ্গ অথবা পায়ু পথ) স্পর্শ করে তবুও পুনরায় অযু করতে হবে, এবং একজন ইমামের পিছনে নামায (জামাত) পরার সময় মনে মনে সুরা ফাতিহা পড়ে নিতে হবে। যখন মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করা হয় তখন কি করা উচিত তা জানার জন্য দয়া করে **অশেষ রহমত**

কিতাবের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ গুচ্ছে নজর দিন! অন্য মাযহাবের অনুসরণ মানে এই নয় যে এটা আপনার মাযহাবকে পরিবর্তন করে দিবে। সে শুধু ফরয এবং মুফসিদের জন্য ঐ মাযহাব গ্রহণ করেছে। সে ওয়াজিব, মাকরুহ এবং সুন্নতের ক্ষেত্রে তার নিজের মাযহাবেরই অনুসরণ করছে।

গোসল সম্পর্কে ফিকহের আলেমদের বিবৃতি থাকার পরেও কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবও মানেন না এমন কিছু অযোগ্য লোক দাঁতের সমস্যার জন্যেও একই সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন বলে শুনা যায়। তারা বলেন এ ফতোয়াটি **`সেবিল-উর- রাশিদ**, নামক সাময়িকী তে **১৩৩২হি [১৯১৩খ্রীঃ]** সংখ্যায় ফিলিং করা দাঁতের ক্ষেত্রেও অনুমোদনযোগ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোপরি আমরা এটা বলতে চাই যে এ ধরনের তথাকথিত সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখকরা সংস্কারবাদী এবং কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব মানে না। এর একজন লেখক মানাস্তিরের (বি তোলা) ইসমাইল হাক্কি, একজন গুপ্তচর **ফ্রী- মেসন**[৪]। আরেকজন হলেন, ইজমীরের ইসমাইল হাক্কি, মেহমেদ আব্দুহকে ভুল পথে পরিচালিতকারী মুর্খদের মধ্যে সে ছিলো একধাপ এগিয়ে, যে ছিল কায়রোর **মেসন** মুফতি এবং ইসলামের একজন সংস্কারবাদী। সে ইজমীর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহনের পর ইস্তাম্বুল থেকে টিচার্স ট্রেইনিং কোর্স সম্পন্ন করে। তার ধর্মীয় শিক্ষা ছিল দুর্বল এবং ধর্মীয় জ্ঞান ছিল খুবই কম। তার তোষামদি আচরণ তাকে ইউনিয়ন পার্টির মেম্বার করে, সে একজন মাদ্রাসা শিক্ষক হয়ে আব্দুহর সংস্কারবাদী ও ধ্বংসাত্মক নীতির প্রচার করতে থাকে। ইসমাইল হাক্কি তার **তেলফিক্‌-এ-মাযাহিব** বইয়ের যে প্রশংসা স্তুতি লিখেছে সেটা মিশরের রাশিদ রিদার অনুবাদ যা আহমেদ হামদি আকসেকি প্রকাশ করেন। সে ছিল তার বিষাক্ত কৌশলের শিকার একজন শিষ্য, তার ভিতরের আক্রোশগুলো ফাস করে দেয়।

৪- কোন মহিলাদের সাথে নিকাহ জায়েজ নাই তা জানার জন্য "**অবিরাম কল্যাণ**„ এর পঞ্চম গুচ্ছের বারো তম অধ্যায়ে দেখুন।

ইসমাইল হাক্কি তার পুর্বোক্ত সাময়িকীতে ফিকহের আলেমদের বর্ণিত যুক্তিগুলো তুলে ধরেছেন, যেখানে স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধাই করলে সেটা জায়েয হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বইগুলো সামনে আনার চেষ্টা করেছেন, যেমনঃ `সিয়ার-ই-কাবিরে,র (মুহাম্মাদ শাইবানির বই) ভাষ্য, আলেমদের

ঐক্যমত যে জরুরাত হলে রুপার পরিবর্তে স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাধাই করতে পারবে এবং এটাও উল্লেখ করেন যে এটা হলো দাঁতের জরুরাতের জন্য প্রজোয্য। যাই হোক, আসল কথা হলো উনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল দাঁতে ফিলিং বা ক্যাপ পরানো অবস্থায় গোসল সহীহ হবে কিনা, এটা জিগ্যেস করা হয় নি যে রুপা দিয়ে নাকি স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাধাই করবে। এটা এমন যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি এবং যেটা সাধারণত জানা বিষয় সে ব্যাপারে বিষদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা, ইজমীরের ইসমাইল হাক্কি উপসংহারে গিয়ে আসল প্রশ্নের উত্তর লিখতেন। তিনি যেটা করেছেন সেটা হলো জ্ঞানের ডাহা বিকৃতিকরণ । এটা ইসলামি আলেমদের ফাতোয়া দেয়ার ছদ্মবেশে নিজের ব্যক্তিগত মতামত লিখার অপচেষ্টা মাত্র। তার এ প্রয়াস এর চেয়েও জঘন্য খারাপ। গোসল সম্পর্কে ফকীহদের লিখিত বিবৃতিকে নিজের ব্যক্তিগত মতামত বলে চালিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরুপ তিনি বলেন, "যেমন **বাহর** এ বলা আছে, যেখানে পানি পৌছানো কষ্টকর সেখানে ধৌত করা আবশ্যক নয়„। অন্যদিকে **বাহর** নামক কিতাবে বিবৃতিটি এভাবে লিখা আছে যে, " দেহের সে অংশ যেখানে পানি পৌছানো কষ্টকর„। এভাবে তিনি অপরিহার্য একটি বিষয়কে অপরিহার্য নয় এমন বিষয়ের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ বিবৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক নন যে, "যদি কোন মহিলা মাথা ধৌত করায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে সে মাথা ধৌত করবে না„, যেটা **দারুল মুখতারে** লিখা আছে, এটাকে প্রমাণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ফিলিং করা ব্যক্তির গোসল জায়েজ (অনুমোদন যোগ্য) হয়ে যাবে। কেননা মাথায় পানি লাগলে সেটা শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বিধায় এ মাসাআলা দেয়া হয়েছে। অন্য দিকে ফিলিং বা ক্যাপ পরানো ব্যক্তির ইচ্ছাধিন। এজন্যই দাঁতের ফাকে খাবার থাকা অবস্থায় গোসল জায়েজ হবে কি না এ প্রশ্ন নিয়ে **দররুল মুখতার** কিতাবে আলাদা ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখিত কুটকৌশল ও ছলচাতুরি ইজমীরের ইসমাইল হাক্কির অসদাচারণের কিছু ছোট উদাহারণ মাত্র। সে ছিল নীতিহীন একজন মানুষ যে নিজের স্বার্থের জন্য ইসলামি আলেমদের মিথ্যা সাক্ষি উপস্থাপন করে ভুল পথে পরিচালিত করেছে এটা বলে যে, "স্বর্ণ বা রুপার ফিলিং বা ক্যাপের নিচে পানি পৌছানো অথবা এর নীচের স্থান ধৌত করা এটা প্রয়োজনীয় নয় (গোসলের সময়)। ফিকহের আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে এধরনের দাতের ক্ষেত্রে এটা জরুরাত এবং জরুরাত সম্বলিত অংশে (দেহের) পানি পৌছানো আবশ্যক নয়„। অথচ হানাফী মাযহাবের কোন

একজন আলেমও এ কথা বলেন নি যে দাঁতে ফিলিং করানো বা ক্যাপ পরানো জরুরাত। অথচ ফিলিং বাক্যা পরানো বিষয়টা এতো পুরনো ব্যাপারও নয় (অর্থাৎ নতুন আবিষ্কার) যখন ফিকহের আলেমগণ বেঁচে ছিলেন। তার শেয়ার-ই- কাবির বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠায় আছে, যেখানে তিনি প্রমাণ স্বরুপ উল্লেখ করেছেন, ইমাম শাইবানি রাহিমাহুল্লাহু তায়ালার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির পরে যাওয়া দাঁতের পরিবর্তে স্বর্ণের দাঁত লাগালে বা স্বর্ণের তাঁর দিয়ে বাধাই করলে এটা জায়েজ হবে। বইটিতে দাঁতে ক্যাপ পরানো নিয়ে কোন ধরনের আলোচনা করা হয়নি। এগুলো হলো রং বেরঙ্গের সংযোজন যেটা ইজমীরের ইসমাইল হাক্কি নকল করেছেন। যিনি হলেন ধর্মের মেসনিক মানুষ, যার নির্দিষ্ট মাযহাব নেই, যে শেষ দিকে আগমন করে মুসলিমদের সাথে ছলনা করার জন্য সকল ধরনের প্রতারনার আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের মধ্যে গণবিক্ষোভের প্রচার করেছে।

ইমাম শাইবানি রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা বলেছেন ভগ্ন প্রায় দাঁতে স্বর্ণ বা রুপার তার দিয়ে বাধাই করা যাবে। তিনি এটা বলেননি যে স্বর্ণ দ্বারা ফিলিং করা বা ক্যাপ লাগানো জায়েজ। কিন্তু এ ধরনের বিষয়গুলো ইসমাইল হাক্কি ছড়িয়েছে। সমসাময়িক মুফতিগণ এবং ধর্মীয় অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিগণ ইজমীরের ইসমাইল হাক্কির কথাগুলোর জবাব দিয়ে ছিলেন যার ফলে সত্যও অসত্যের বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে এবং বিভ্রান্তকর প্রবন্ধগুলোও ধরা পরেছে যেগুলো আমরা পূর্বোক্ত প্যারাগ্রাফে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন আলেম হলেন বলভাদিনের (তুরস্ক) ইউনুস-যাদে আহমেদ ওয়াহাব এফেন্দি রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা। এই বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি বিস্তর ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী প্রমাণ করেছেন ইসলামিক আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, ফিলিং করা দাঁতসহ গোসল করলে সেটা সহীহ হবে না।

সেবিল-উর-রাশিদ সাময়ীকির পরিচালকদের ইজমীরীদের এ ধরনের প্রতারণাপূর্ণ ছল ধরার জন্য আরো অধিক বিজ্ঞ হওয়া উচিত। তারা পরবর্তিতে দ্বিতীয় সংস্করণে ফতোয়ার সাথে এ কথা যোগ করে তাদের প্রবন্ধকে সঠিক বলার চেষ্টা করেছে যে, গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে,, যেটা ১৩২৯ হি [১৯১১খ্রী] ফতোয়ার কিতাব `**মাজমুয়া-ই-জাদিদা**,য় প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাদের এ তথাকথিত ফতোয়া ১২৯৯ হিজরীতে প্রকাশিত বইয়ের প্রথম সংস্করণে ছিল না। এ বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পরে মুসা কাজিমের মাধ্যমে দ্বিতীয় সংস্করণে ঢুকানো হয়ে ছিল, একজন শাইখ-উল-ইসলাম যাকে কুখ্যাত ইউনিয়ন পার্টি অফিসে এনে ছিল। অতপর **সেবিল-এ-**

রাশাদ সাময়ীকিতে একজন ফ্রী-মেসনের সাজানো এক বিবৃতি দিয়ে ইসলামের এক সংস্কারকের প্রবন্ধকে সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়। কোন একজন ফিকহের আলেম ও দাঁতের ক্যাপ বা ফিলিং করাকে জরুরাত বলেন নি। যে সমস্ত মানুষই এমন কথা বলে তারা হয় ধর্মের মেসনিক মানুষ অথবা ইসলামের সংস্কার করা এমন মানুষ যাদের নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নেই অথবা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি অথবা তারা ছাড়া কেউ না। আহমদ তাহতাবী রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা তার নিজস্ব ভাষ্যে **মেরাক-ইল-ফালাহ** কিতাবে বর্ণনা করেনঃ ”যখন আপনি (কোন একটি জামাতে যোগ দিলেন) এমন একজন ইমামকে (যিনি জামাতের ইমামতি করছেন) অনুসরণ করছেন যিনি অন্য তিন মাযহাবের কোন একজন, তাহলে তার পিছনে আপনার নামায শুধ্য হয়ে যাবে এ শর্তে যে আপনার নিজের মাযহাব অনুযায়ী নামাযকে নষ্ট করে দেয় এমন কিছু ঐ ইমামের মধ্যে থাকবে না (এমন কি ভুলটা যদি ঐ ইমামের মাযহাব অনুযায়ী নামাযকে নষ্ট না করে তবুও) অথবা যদি এমন ভুল-ক্রুটি থেকেও থাকে সেটা আপনার অজ্ঞাতে আপনি শুধু তাকে অনুসরণ করছেন। এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ক্বাওল (মত, বিবৃতি)। অন্য আরেকটি ক্বাওল অনুযায়ী, ”যদি ইমামের নিজের মাযহাব অনুযায়ী তার নামায সহীহ হয়ে যায় তাহলে যারা তাকে অনুসরণ করেছে তাদেরও নামায সহীহ হয়ে যাবে যদিও আপনার নিজের মাযহাব অনুযায়ী সেটা সহীহ মনে না হয়„। ইবনে আবেদিনেও একই কথা লিখা আছে। যেমন তাহাতাবীর রচনায় লিখিত বিবৃতি এবং তাহতাবী রাহিমাহুল্লাহু তায়ালার কথায়ও এটা বুঝা যায়, দাঁতে ক্যাপ বা ফিলিং ছাড়া একজন হানাফী মুসলিমের এমন একজন ইমামের পিছনে নামায আদায় সহীহ হবে কিনা যার দাঁতে ক্যাপ বা ফিলিং করা আছে? এ বিষয়ে আলেমদের দুটি পৃথক মত পাওয়া যায়। পূর্বের ক্বাওল অনুযায়ী ফিলিং বা ক্যাপ ছাড়া একজন মুসলিমের ফিলিং বা ক্যাপ করানো একজন ইমামের পিছনে নামায আদায় সহীহ হবে না। কেননা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এমন ইমামের নিজের নামায ইসহীহ নয়। পরের ক্বাওল অনুযায়ী যদি ইমাম এক্ষেত্রে শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করে থাকেন তবে ক্যাপ বা ফিলিং বিহীন উক্ত হানাফী মুসলিমের তাকে অনুসরণ করা সহীহ হয়ে যাবে (অর্থাৎ তার পিছনে নামায পরা বা তার ইমামতিতে নামাযে অংশ নেয়া)। এটা হলো ইমাম হিন্দুয়ানী রাহিমাহুল্লাহি আলাইহির ইজতিহাদ। একই নিয়ম শাফেয়ী মাযহাবেও অনুসরণ করা হয়। যতক্ষণ না এটা জানা যায় যে, দাঁতে ক্যাপ করা বা ফিলিং করা একজন সালেহ

ইমাম শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবের অনুসরন করছেন না ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাপ বা ফিলিংবিহীন একজন হানাফী মুসলিমের উচিত উক্ত ইমামের ইমামতিতে নামায আদায় করা। তাকে এটা জিজ্ঞাস করা অনুমোদনযোগ্য নয় যে সে নামাযে শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করেছে কিনা। পরেরটি একটি দুর্বল ক্বাওল। যাই হোক না কেন পূর্বে যেমন আমরা বলেছি, যখন কোন হারায (অসুবিধা) থাকে তখন দুর্বল ক্বাওলের উপর আমল করা জরুরি হয়ে পরে। যেমন **হাদিকা**য় লিখা আছে, এমন দুর্বল ক্বাওল ফিতনাকে রোধ করতে ব্যবহার করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির ইবাদত ফিকহের কিতাব অনুযায়ী চার মাযহাবের কোন একটির সাথেও না মিলে তবে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একথা বলা হবে যে, সে সুন্নি নয়। আর কোন ব্যক্তি যখন সুন্নি নয় তখন হয় সে বেদাতি এবং ভন্ড অথবা সে তার ইমান হারিয়ে ফেলেছে এবং মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) হয়ে গেছে। আমরা বলছি না যে আপনি আপনার দাঁত ক্যাপ বা ফিলিং করতে পারবে না। বরং আমরা আমাদের ভাই-বোনদের ফিলিং বা ক্যাপ করা অবস্থায় কিভাবে গ্রহণ যোগ্যপন্থায় ইবাদতগুলো আদায় করা যায় তা দেখাচ্ছি। আমরা তাদেরকে সহজ পথ দেখাচ্ছি।

১৫ ধরনের গোসল রয়েছেঃ তার মধ্যে ৫টি হলো ফরয, ৫টি ওয়াজিব, ৪টি সুন্নাত, এবং একটি মুস্তাহাব।

ফরয গোসল গুলো হলোঃ যখন কোন মহিলার (মেয়ের) মাসিক অথবা সন্তান প্রসবের পিরিয়ড শেষ হয়, স্ত্রী সংগমের পর অর্থাৎ যৌন মিলনের পর, যৌন মিলনে বীর্যপাতের পর, স্বপ্ন দোষে বীর্যপাতের পর এবং কেউ যদি তার বিছানায় বা আন্ডার প্যান্টে বীর্য দেখতে পায়, এমতাবস্থায় ওয়াক্তের নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই গোসল করা ফরয।

ওয়াজিব গোসলগুলো হলোঃ মৃত মুসলিমকে গোসল করানো ওয়াজিব এবং এমন শিশু যে মাত্র বয়ঃসন্ধিতে পৌছেছে তাকে গোসল করানো। যখন স্বামি-স্ত্রী একত্রে ঘুমাবে এবং জাগার পর তরল বির্য দেখতে পাবে কিন্তু দুজনের কেউই জানেনা যে কে এটার জন্য দায়ী তখন তাদের উভয়ের জন্যই গোসল করা ওয়াজিব। যখন আপনি আপনার শরীরে কিছু বির্য লেগে থাকতে দেখবেন কিন্তু মনে করতে পারছেন না যে কখন নির্গত হয়েছে তখন আপনার জন্য গোসল করা ফর। যখন কোন মহিলা সন্তান জন্ম দিবে তখন রক্তপাত না হলে তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব (রক্তপাত হলে গোসল করা ফরয)।

সুন্নত গোসল হলোঃ জুমাবারে গোসল করা এবং ঈদের দিনে এবং ইহরামের সময়-ইহা আপনার নিয়তের উপর নির্ভর করবে- এবং আরাফাতের ময়দানে আরোহনের সময় (পাহাড়ে)।

মুস্তাহাব গোসল হলোঃ যখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহন করে, তার জন্য গোসল করা ফরয হবে যদি সে ইসলাম গ্রহনের পূর্বে জুনুবী (অর্থাৎ এমন অবস্থা যখন গোসল করা আবশ্যক) অবস্থায় থাকে। অন্যথায় তার জন্য গোসল মুস্তাহাব।

গোসলের ৩টি হারাম কাজ হলোঃ

১- উভয় লিঙ্গের জন্যই গোসলের সময় দেহের নাভ্রির নিচ থেকে হাটুর ঠিক উপর পর্যন্ত তাদের একই লিঙ্গের মানুষের সামনে উন্মুক্ত করা রাখা হারাম; (অন্য কথায় কোন পুরুষে র জন্য তাদের শরীরের নাভির নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত কোন অঙ্গ অন্য কোন পুরুষকে দেখানো হারাম, এবং মহিলাদের জন্যও একই অঙ্গ অন্য মহিলাকে দেখানো হারাম, যখন তারা গোসল করে)।

"**অবিরাম কল্যাণ**„ এর চতুর্থ গুচ্ছের চতুর্থ অধ্যায়ে গোসল সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন, এবং পঞ্চম গুচ্ছের সপ্তম অধ্যায়ে হজ্ব সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২- একটি ক্বাওল অনুযায়ী, মুসলিম মহিলার দেহ গোসলের সময় অমুসলিম কোন মহিলাকে দেখানো হারাম। (এ নিয়মটি অন্য সময়ও অবশ্যই মানতে হবে)।

৩- পানির অপচয়; (অন্য কথায় গোসলের সময় প্রয়োজনীয় পানির অতিরিক্ত ব্যবহার করা হারাম)।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী গোসলের সময় ১৩ টি সুন্নত মেনে চলা উচিতঃ

১- পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। অন্য কথায়, পুরুষাঙ্গ ও পায়ু পানি দ্বারা ধৌত করা।

২- কব্জির নিচে হাত ধৌত করা।

৩- শরীরে সত্যিকারের কোন নাজাসাত থাকলে সেটা পরিস্কার করা।

৪- মাযমাযা এবং ইস্তিনশাকের সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকা, (মাযমাযা মানে হলো পানি দ্বারা মুখ ধৌত করা, এবং ইস্তিনশাক মানে হলো নাকের ছিদ্রে পানি টেনে নেয়া)। নাক এবং মুখের ভিতরে যদি একটা সুঁচের মাথা পরিমাণ জায়গাও শুষ্ক থাকে তবে গোসল সহীহ হবে না। গোসলের পূর্বে অযু করা।

৫- গোসলের জন্য নিয়ত করা।

৬- উভয় হাতে পানি ঢালার সময় হাত দ্বারা ভালো করে ঘষা।

৭- সর্ব প্রথম মাথায় পানি ঢালা এবং ঠিক তার পরেই ডান ও বাম কাঁধে তিন বার করে পানি ঢালা।

৮- হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। অন্যকথায়, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো ভালো করে ভিজানো।

৯- শরীরের সামনের বা পিছনের কোন অংশই কিবলা মুখি না করা।

১০- গোসলের সময় পার্থিব বিষয়ে কথা না বলা।

১১- তিন বার করে মাযমাযাও ইস্তিনশাক করা।

১২- উভয় পা ডান দিক থেকে শুরু করে ধৌত করা।

১৩- যদি গোসলের স্থানটি এমন জায়গায় হয় যে, পানি (গোসলে ব্যবহৃত পানি) গিয়ে কোন জলাশয়ে পরে তবে সেখানে প্রশ্রাব না করা। এ সুন্নাতগুলোর সাথে আরো কিছু সুন্নাত রয়েছে যেগুলো আমারা তালিকা ভুক্ত করেছি।

তাওহীদের দু,আ

ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ। লাইলাহা ইল্লালাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহীম, ইয়া আফুয়্যু, ইয়া ক্বারীম, ফায়্যফুআন্নি ইয়া আরহামার রাহিমিন, তাওয়াফ্যান্নি মুসলিমান ওয়া আলহিকনি বিসসালিহিন। আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ালি আবায়ি ওয়া উম্মাহাতি যাউজাতি ওয়ালি আজদাদি ওয়া জাদ্দাতি ওয়ালি ইবনি ওয়ালি বিনতি ওয়া লিইহাওয়াতি ওয়া আহাওয়াতি ওয়া লিআমামি ওয়া আম্মাতি ওয়া লিআহওয়ালি ওয়া হালাতি ওয়া লিওস্তাযি আব্দুল হাকিম-ই-আরওয়াসি ওয়ালি কাফফাতিল মুমিনিনা ওয়া মুমিনাত রাহমাতিল্লাহি তায়ালা।

হায়েয ও নিফাস অধ্যায়

(মাসিক এবং প্রসবের সময়)

মাসিক অবস্থাটা সর্বনিম্ন তিন দিন থেকে সর্বোচ্চ দশদিন। সন্তান প্রসবকালিন অবস্থার জন্য কোন নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন দিন নেই। যখনই রক্তপাতবন্ধ হবে তখন থেকেই গোসল করে নামায পরা শুরু করতে হবে এবং রোযা রাখাও শুরু করতে হবে। এটা সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন হতে পারে। যদি মাসিক অবস্থার রক্তপাত

(সর্বনিম্ন) তিনদিন হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঐ মহিলার বিগত দিনের নামাযগুলোর কাযা আদায় করতে হবে যেগুলো তিনি মাসিক শুরু হয়েছে মনে করে ছেড়ে দিয়েছিলেন [১]। এবং এ অবস্থায় গোসল করাটা ফরয এর পর্যায়ে পরবে না। যদি রক্তপাত তিনদিনের সীমা শেষ হওয়ার পরে বন্ধ হয় তবে যখন থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে সে সময় থেকে তিনি গোসল করে নামায আদায় করবেন। যদি (সর্বোচ্চ সীমা) দশদিনের সীমা হয়ে যায়, তবে রক্তপাত বন্ধ হোক বা না হোক তিনি গোসল করে ওয়াক্তের নামায আদায় করা শুরু করবেন। যখন (সর্বোচ্চ সীমা) চল্লিশ দিন (প্রসবকালিন সময়) শেষ হবে তখন উনাকে গোসল করতে হবে, তিনি নামায আদায় করা শুরু করবেন রক্তপাত বন্ধ হোক বা না হোক। প্রসবকালিন ও মাসিকের সময়ে বের হওয়া সকল ধরনের নির্গত বস্তুই রক্তপাত হিসেবে বিবেচিত হবে (হলুদ বা ঘোলা বস্তুও)।

এই দশ দিনের মাসিকের অথবা প্রসবকালিন চল্লিশ দিনের সীমার মধ্যে যদি এক বা দুই দিনের জন্য রক্তপাত অনিয়মিত হয়ে যায় এবং এর ফলে সে এটা মনে করে গোসল করল এবং রোযা রাখা শুরু করে দিলো যে তার মাসিক বা প্রসবকালিন সীমা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু যদি উক্ত সীমার মধ্যে পুনরায় রক্তপাত শুরু হয়, তাহলে তাকে উক্ত রোজাগুলোর কাযা আদায় করতে হবে (যেগুলো মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে মনে করে রেখেছিলো, যেন তিনি এগুলো পালনই করেননি এটা মনে করে)। এবং যখন রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে তখন তাকে পুনরায় গোসল করতে হবে। যদি তা আদাত এর পূর্বেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং এমনকি তৃতীয় দিনের শেষে (রক্তপাতের), তাহলে তাকে গোসল করতে হবে এবং তার নামায আদায় করতে হবে। কিন্তু তার আদাত শেষ হওয়ার পূর্বে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না। একই বিধান প্রসবকালিন মহিলার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। যদি রক্তপাত আদাত[২] শেষে হওয়ার পরে বন্ধ হয় এবং এমনকি রক্তপাতের দশম দিনে বা তার আগে, তাহলে এ পুরো সময়টা হায়েজ হিসেবে গন্য হবে। যদি রক্তপাত বন্ধ না হয়ে দশম দিনের পরেও চলতে থাকে , তাহলে আদাতের পরের রক্তপাত হায়েজ হিসেবে গন্য হবে না, এবং তাকে ঐ অতিরিক্ত দিনেগুলির জন্য নামাযের কাযা আদায় করতে হবে, (অর্থাৎ, আদাত এর পরের দিনগুলোর)। প্রসবকালিন চল্লিশ দিনের হুকুমও দশ দিনের মাসিকের নিয়মে হবে। রমজান মাসে হায়েজ (মাসিকের রক্তপাত) অথবা নিফাস (প্রসবকালিন রক্তপাত) একদিন পরেই যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটা যদি ফযরের পর হয় তবে সে

সারাদিন আর পানাহার করবে না, যেন সে ঐ দিন রোযা রাখলো। কিন্তু তাই বলে এটা রোযার পরিপূরক হবে না। তাকে পরবর্তিতে এই দিনের কাযা রোযা আদায় করতে হবে (অর্থাৎ, মহিমান্বিত রমজান মাস শেষে তাকে একদিন রোযা রাখতে হবে)। যদি ফযরের পর রক্তপাত শুরু হয়, এবং দুপুরের পরেও তা দেখা যায় তবে সে একান্তে/নির্জনে পানাহার করতে পারব।সাধারণভাবে বলা যায়, যদি কোন মহিলা রক্ত দেখে তাহলে সে তার নামায এবং রোযা রাখা বন্ধ করবে। এবং যদি এটা তৃতীয়দিন শেষ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, সে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ধ্যৈর্যের সাথে অপেক্ষা করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তপাত পুনরায় দেখা যায়, সে অযু করবে এবং নামায আদায় করবে, আর যদি পুনরায় রক্ত দেখা দেয় তবে, তাহলে নামায ছেড়ে দিবে। যদি রক্তপাত পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় তবে নামাযের সময় প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে অতঃপর অযু করবে এবং তার নামায আদায় করবে যদি এর মধ্যে রক্তপাত না ঘটে থাকে। সে এভাবে চালিয়ে যাবে তৃতীয় দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত, এবং এই সময়ের ভিতরে তার গোসল করা আবশ্যক নয়। শুধু অযু করাই তার জন্য যথেষ্ট। যদি রক্তপাত তৃতীয় দিনের পরে বন্ধ হয় , তাহলে সে পুনরায় অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না নামাযের শেষ সময় সন্নিকটে চলে আসে এবং গোসল করে তার নামায পরবে যদি রক্তপাত পুনরায় না হয়, আর যদি পুনরায় শুরু হয় তবে সে নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। যদি এভাবে দশ দিন চলতে থাকে, তাহলে সে গোসল করবে এবং তার নামায আদায় করবে, যদিও রক্তপাত হয়। একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে নিফাসের বেলায়ও। যাই হোক, প্রত্যেকবার রক্তপাত বন্ধ হওয়ার পরে গোসল করা আবশ্যক, যদিও এটা প্রথমদিনের পরেই বন্ধ হোক না কেন।রমজানের সময়, যদি এটা ফযরের আগে বন্ধ হয়, তবে সে রোযা পালন করবে। যদি রক্তপাত কুশলুক এর সময় পুনরায় দেখা দেয়, (পূর্বাহ্নের সময়,) অথবা বিকেলের শেষে, তাহলে তার রোযাটা রোযা হিসেবে গ্রহনীয় হবে না। সুতরাং তাকে এর কাযা আদায় করতে হবে (বরকতময় রামজান মাসের পরে)।

যদি গর্ভপাত হয়, আঙ্গুল, বা চুল, বা মুখ অথবা নাক যদি সুস্পষ্ট গঠিত হয় তবে শিশুটি প্রসব করেছে বলে ধরা হবে। তবে যদি কোন অঙ্গই সুস্পষ্ট না হয় তাহলে নিফাস (প্রসব) এর নিয়ম প্রযজ্য হবে না। কিন্তু যদি তিন বা তার অধিক দিনব্যাপি রক্তপাত হয় তাহলে তা হায়েয এর অন্তর্ভুক্ত হবে (মাসিক)। তবে এটা ততক্ষণ

পর্যন্ত হায়েয সাব্যস্ত হবে না যদি গর্ভপাতটা পূর্বের মাসিকের রক্তপাত বন্ধের পনেরো বা তার বেশী দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং এ নতুন রক্তপাতটা তিনদিন শেষ হওয়ার পূর্বে বন্ধ হয়, অথবা যদি (পূর্বের) মাসিকের রক্তপাত বন্ধের পরে পনেরো দিন অতিক্রান্ত না হয়। এটা অনেকটা নাক থেকে রক্তপরার মত। এবং তাকে এ অবস্থায় রোযা রাখতে হবে। তার স্বামীর সাথে সহবাসের পূর্বে আর গোসল করার প্রয়োজন নেই।

---

[১] কোন ফরয ইবাদতের ক্বাযা আদায় করা মানে এটার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তা সম্পন্ন করা।

[২] যখন রক্তপাত শুরু হওয়া দৃষ্টিগোচর হয় এবং যখন বন্ধ হওয়া দৃষ্টিগোচর হয় এর মধ্যবর্তী সময়কে আদাত বলা হয়। এটা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সর্বনিম্ন তিনদিন আর সর্বোচ্চ দশদিন, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী সর্বনিম্ন একদিন আর সর্বোচ্চ পনেরো দিন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ২০০৮ সালের অশেষ **রহমত কিতাবের** চৌদ্দতম সংস্করণ এর পঞ্চাশ পৃষ্টা দেখুন দয়া করে।

প্রসিদ্ধ ইসলামিক আলেম জইন-উদ-দীন (মুহাম্মাদ বিরগিভি বিন আলী রহমতুল্লাহ আলাইহি)৯২৮-৯৮১ হিজরি) (১৫২১-১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দ ,(যিনি তুরস্কের আইদিন এর বিরগি নামক শহরে জন্ম গ্রহন করেন এবং বালকে শিরে প্লেগ রোগে ভুগে মৃত্যু বরন করেন ,তিনি "**যূহর-আল-মুতাহহহিলিন**"মানে নারীদের মাসিক "রজঃস্রাব " এবং প্রসবকালীন সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে আরবি ভাষায় একটি বই লিখেন। আল্লামা শাময়ি সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ এমিন)মতান্তরে আমিন (বিন উমার বিন আব্দুল আজিজ ইবনি আবিদিন "রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা)"১১৯৮)১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ-(( )১২৫২)১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ ((দামাস্কাসে জন্ম ও মৃত্যুবরন করেন তিনি এই বইটির বর্ধন করেন এবং এর নাম দেন "**মেনহেল-আল-ওয়ারিদিন**"। এই বইয়ের সংক্ষেপ অনুসারেঃ ফিকহবিদদের ঐক্যমত্য অনুসারে বলা যায় প্রত্যেক মুসলিম নর,নারীর জন্য '**ইলম-উল-হা'ল**) "জ্ঞানার্জনের ইসলামিক বিধি (অর্জন করা ফরয। এই কারনেই ,কুরআন এবং হাদিসের আলোকে নারীরা এবং তাদের স্বামীদেরকে হায়েজ এবং নিফাসের কারনগুলো জানাতে হবে। পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রী'দের এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে ;অন্যথায় তাদেরকে অন্য অভিজ্ঞ নারীদের কাছ থেকে শিক্ষা পাবার জন্য প্রেরণ করতে হবে। এমনকি কারো স্বামী যদি এই শিক্ষা না দেয় তবে তাকে নিজ উদ্যোগে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই এই

শিক্ষা নিতে হবে। এই পদ্ধতিগুলো এমনভাবে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাচ্ছে যার কারনে ভবিষ্যতে কোন ধার্মিক মানুষ এই সম্পর্কে জানবে না। সমসাময়িক কালের ধর্মপ্রান মানুষেরা এই বিষয়ে এমনই অজ্ঞতায় নিমজ্জিত যে তারা হায়েজ)স্বাভাবিক রজঃস্রাব ,(নেফাস)সন্তান জন্ম পরবর্তী স্রাব (এবং ইস্তিহাদা)অতি রজঃস্রাব (এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। তারা এই বিস্তৃত বিষয়ে বইয়ের ধারনায় অভিজ্ঞতো নন'ই এবং যারা বইয়ের মালিক তারাও এই বিষয়ে বুঝতে এবং পড়তে চান না। অন্যদিকে ,ধর্মীয় বিষয় যেমন নামায ,গোসল , কুরআন তেলাওয়াত ,রোযা ,ইতিকাফ ,হাজ ,বয়ঃসন্ধি ,বিয়ে বিচ্ছেদ, ইদ্দত ,মুদ্দত পালনের মত অনেক বিষয়ে এই কথিত সামান্য রক্তপাতের জ্ঞান খুব জরুরী। এই বিষয়ে বুঝতে আমার পুরো জীবনের অর্ধেক সময় আমি ব্যায় করেছি। এই বিষয়ে আমি আমার মুসলিম বোনদের জন্য পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ রুপে উপস্থাপন করতে চাই।

"হায়েজ "হল এমন রক্ত যা অন্তত আট বছর বয়স্ক স্বাস্থ্যবতী নারীর বিশেষ অঙ্গ হতে নির্গত হয় অথবা মাসিকের আগে সফলভাবে পূর্ণ পবিত্রতায় চক্রপূর্ণকারী নারীর শেষ মুহূর্তের বিশেষ রক্তপাত যা অন্তত তিন দিন ধরে চলে। এই রক্তপাতকে সহীহ রক্তপাত হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই ক্ষেত্রে পূর্ণ একটি ইদ্দত পালন করা কিংবা ১৫ দিন বা বেশি সময়ের মাঝে দুই শারীরিক ঋতুচক্রের মধ্যবর্তী যে পবিত্রতার সময় থাকে, একে বলা হয় সহিহ শুদ্ধতার বা বিশুদ্ধতার সময়। যদি এই ১৫ দিন সময়ের আগে বা পরে কিংবা সহিহ বিশুদ্ধতার দুইটি পর্যায়ের মাঝে যদি ফাসিদ রক্তপাত বা অপবিত্রতার দিন থাকে তবে তাকে ফাসিদ শুদ্ধতা কিংবা হুকমি শুদ্ধতা বলা হয়। কোন রক্তপাত দেখা ছাড়া যদি শুদ্ধতার সময় চলমান থাকে এবং পনের দিনের কম সময় ধরে অব্যাহত থাকে তবে তাকে বলা হয় ফাসিদ পবিত্রতা বা **বিশুদ্ধতা**। একটি পূর্ণ বিশুদ্ধতার আগে কিংবা পরে যদি রক্তপাত দেখা যায় এবং তিন দিন ধরে অন্তত চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে দুইটি আলাদা হায়েজ হিসেবে ধরা হয়।

সাদা বাদে যে কোন রঙের রক্ত এমনকি হলুদ কিংবা মেঘরঙ্গা হলেও তা হায়েজ এর অন্তর্ভুক্ত । তখন কোন নারীর রক্ত পতন শুরু হয় ,তখন তাকে **বালিকা** বলা হয়। এই সময় হল যৌবনারম্ভের সময় । অন্য কথায় সে নারীত্বে উপনীত হয় । রক্তপাত আরম্ভ হবার সময় থেকে পতন বন্ধ হবার সময়কে বলা হয় "**আদাত**"।

আদাতের সময় অন্তত তিন দিন সর্বোচ্চ ১০ দিন ধরা হয়। তবে শাফেয়ি এবং হাম্বলি মাজহাবে এটি সর্বনিম্ন ১ দিন এবং সর্বোচ্চ ১৫ দিন।

হায়েজ এর ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন রক্তপ্রবাহ জরুরী নয়। যদি রক্তপ্রবাহ কোন কারনে এক দিন বন্ধ থাকে এবং আবার এক কিংবা দুই দিবস পরে পুনরায় শুরু হয় কিংবা তিন দিনের কম সময় ধরে বন্ধ থাকে সকল ক্ষেত্রেই ইসলামি পণ্ডিতদের মতে একে রক্তপাতের সময়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তবে ,ইমাম মুহাম্মাদ রহিমুল্লাহু তায়ালা আলাইহি ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে বলেন ,যদি এই অবস্থা তিন কিংবা তারও বেশি দিন ধরে চলে ১০ দিনের সময়প্রবাহ শেষ পর্যায়ে উপনীত হয় তখনও একে রক্তপ্রবাহ চলমান ছিল এই অবস্থায় মাঝেই ধরা হবে ।অন্যদিকে ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমা-হুল্লাহু-তাআলার মতে ১৫ দিনের বেশি দিন ধরে যদি রক্তপাত চলে তবে একে অবিরত রক্তপাত ধরে হায়িজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । কোন নারী যদি তার চক্রের প্রথম দিন রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং তারপর আবার ১৪ দিন বন্ধ থাকে এবং আবার সংঘটিত হয় তখন ,কিংবা যদি কারো প্রথম একদিন রক্ত প্রবাহের পর আবার যদি দশদিনের জন্য বন্ধ থাকে অথবা তিনদিনের রক্তপাতের পর যদি পাঁচ দিনের জন্য রক্তপাত মুক্ত থাকে এবং আবার যদি একদিনের জন্য চলমান হয় সেই ক্ষেত্রে তার প্রথম ১০ দিনের রক্তপাতকে "আদাত "বলে অভিহিত করা হয় ,ইমাম আবু ইউসুফের মতামত অনুসারে। আবার তারই ভিন্ন রিওয়ায়েত অনুসারে ,বৃদ্ধা বা নারীত্বের সীমা অতিক্রমকারী মহিলার ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসারে ,আদাতের সময়কাল অনুসারে ১০ দিন পর্যন্ত রক্তপাতের সময়কে হায়িজ হিসেবে ধরা হবে । বাকি সময়কে ইস্তিহাদা বলা হয় ।অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মাদের প্রথম রিওয়ায়েত অনুসারে যৌবনের সীমা অতিক্রমকারী নারীদের আদাতের সময় হায়েজ । তার দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে পূর্ণ নারীদের আদাতের সময় মুলত আদাত ,তারপরের বাকি সময়কে আদাতের অন্তরভুক্ত নয়। **মুলতেকা**[১] (নামক মূল বই অনুসারে ,আমরা এই বইতে তার রিওয়ায়েত অনুসারে এই সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছি । এইখানে একদিনকে চব্বিশ ঘণ্টা হিসেবে ধরা হয়েছে । রক্তপাতের এই সময়ে অবিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে শুধু মাসিকের সময় এবং বিবাহিত নারীদের সবসময়ের জন্য তাদের বিশেষ অঙ্গে এক টুকরো কাপড় বা কুরসুফ)পরিষ্কার কাপড়,প্যাড কিংবা স্যানিটারি টাওয়েল (ব্যাবহার করা এবং এতে সুগন্ধি ব্যাবহার করা মুস্তাহাব।

তবে কুরসুফকে তাদের বিশেষ অঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করালে তা মাকরুহ বলে গণ্য হবে। একজন নারী যিনি কুরসুফ ব্যাবহার করেন ,তার রক্ত পতনের প্রথম ১০ দিনকে মাসিকের সময়কাল এবং তারপরের পরবর্তী বিশ দিনের রক্তপাতকে ইস্তিহাদা হিসেবে গণ্য করতে হবে । এই নিয়ম মুলত অবিরত রক্তপ্রবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাকে বলা হয় **ইস্তিমরার** ।যদি কোন নারী তিন দিনের জন্য রক্তপ্রবাহ অনুভব করেন এবং একদিনের জন্য বন্ধ থাকে এবং তারপরে দুই দিন আবার রক্তপ্রবাহ চালু থাকে এবং আবার আরও একদিন বন্ধ থাকে আবার পরদিন চালু হয় ।এই পুরো দশ দিন সময়কে মাসিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় । আবার যদি কোন নারীর ক্ষেত্রে তার একদিন রক্তপ্রবাহ চালু থাকে এবং আবার বাকি দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং এই অবস্থা চলমান থাকে তবে তাকে এই ক্ষেত্রে মাসিক সংঘটিত হলে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায দায় করতে হবে)মেসাইল-ই-শারহ-ই-ওয়িকায়া।[২(] তিন দিনের কম রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রে মানে ৭২ ঘণ্টার কম রক্তপ্রবাহের ক্ষেত্রে ,সদ্য যৌবন প্রাপ্ত নারীর ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিটের জন্য চলা রক্তপ্রবাহ যদি একই ভাবে ১০ দিন ধরে চলে অথবা এমন নারী যিনি অনভ্যস্ত নন দশ দিনের কম সময় যা আদাতকে অতিক্রম করেনা। কিংবা গর্ভবতী বা বৃদ্ধা নারীর ক্ষেত্রে অথবা নয় বছরের চেয়ে ছোট নারীর ক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহকে মাসিক বলা হয় না। একে ইস্তিহাদা কিংবা ফাসিদ রক্তপাত বলা হয়। একজন নারী ৫৫ বছরে উপনিত হলে **বৃদ্ধা** হিসেবে পরিগণিত হন।যদি কোন নারীর আদাত ৫ দিনের হয় তবে তার চক্রের অর্ধেক যদি পূর্ণ হয় এবং দুই-তৃতিয়াংশ যদি ১১তম দিনের সকালে পূর্ণ হয় তবে তার পাঁচ দিনের পর বাকি দিনকে **ইস্তিহাদা** বলা হবে। কারণ তার রক্তপ্রবাহ সর্বোচ্ছ ১০ দিনের সময় অতিক্রম করে ১১ তম দিনে উপনিত হয়েছে। যদি ১০ দিন অতিক্রম হয়ে যায় তবে তাকে গোসল করে পূর্ববর্তী দিন গুলোর কাজা নামাজ আদায় করতে হবে।

১। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ হালাবি রহমতুল্লাহ)৮৬৬,আলেপ্পো -৯৫৬}১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দ {ইস্তানবুল (কর্তৃক লিখিত। এই বইয়ের একটি ফরাসি অনুবাদ রয়েছে ।

২ ।এই বইটি আবু –উল-হক্ক সুজাদিল শরহন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি দ্বারা ফারসি ভাষায় লিখিত।

কেউ যদি ইস্তিহাদার সময়ের মাঝে অবস্থান করে তবে তার এই অবস্থাকে বলা হয় **"ওজর**„। একে নাক দিয়ে পড়া রক্তের সাথে তুলনা করা হয়। এই অবস্থায় তাকে নামায ,রোযা পালন করতে হবে এবং তার জন্য যৌন সম্পর্ক করা জায়েজ।

ইমাম মুহাম্মদের কাউল অনুসারে যদি কোন মেয়ে তার জীবনে প্রথম বারের জন্য রক্তপাত অবলোকন করে এবং এটি যদি একদিন ধরে চলে এবং আট দিনের জন্য বন্ধ থাকে আবার দশম দিনে আবার শুরু হয় তবে ,সম্পূর্ণ দশ দিনই মাসিকের সময়। তবে যদি প্রথম দিন রক্তপাত হয় আবার ৯ দিন পরে এগারতম দিনে শুরু হয় তবে তা মাসিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। দুইদিনের রক্তপাতও এই ক্ষেত্রে ইস্তিহাদা। পূর্বের বক্তব্য মতে ,দশ দিনের মধ্যবর্তী সময়ের পবিত্রতার দিনগুলোকে মাসিকের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হবে। যদি তিনি দশম ও এগারতম দিনে রক্তপাত দেখতে পান তবে দশদিনের মাঝের সময়টাই শুধু মাসিকের সময় এবং এগারতম দিনটি ইস্তিহাদার অন্তর্ভুক্ত।

ইস্তিহাযার রক্তপাতকে বলা হয় অসুস্থতাজনিত রক্তপাত। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলা ক্ষতিকর। এই অবস্থায় চিকিৎসকের সাহায্য নেয়া উচিত। লালরঙ্গা আঠা বা ড্রাগন বল নামের পদার্থ এই রক্তপাত বন্ধে ভুমিকা রাখে ,যদি একে ছোট বলের মতন গোল করে পানিতে ভিজিয়ে দিনে দুইবার করে ব্যাবহার করা যায়। একবার বিকেলে ও একবার সকালে। দিনে অন্তত পাঁচ বার ব্যাবহারে সুফল পাওয়া যায়। একজন নারীর মাসিকের ও পবিত্রতার সময় সাধারনত প্রতি মাসে একই রকমের হয় । এক মাসে ,এটার সময় এক হায়েদের শুরু থেকে আরেকবার হায়েদের শুরু পর্যন্ত। একজন নারীকে অবশ্যই তার এই সময়কে জানতে হবে এবং সময়ের বিভাজনকেও হৃদয়ঙ্গম করতে হবেঅবস্থা নারীর আদাত সাধারনত সহজে পরিবর্তিত হয়না । যদি হয় তবে তাকে এই সময়কে মনে রাখতে হবে।

আদাতের পরিবর্তন সম্পর্কে **মেনহাল** নামের বইতে বিস্তারিত বলা হয়েছে। যদি নারীর মাসিক তার পূর্ববর্তী আদাতের সাথে মিল রেখে বর্তমান থাকে তবে তাকে অপরিবর্তিত ধরা হবে। যদি এটি একই রকম না থাকে তবে বুঝে নিতে হবে তা পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া পূর্বে বলা আছে। যদি এটা একবারের বেশি পরিবর্তিত হয়,তবে ধরে নিতে হবে আদাতের সময় পরিবর্তিত হয়েছে । এটা ফতওয়া দ্বারা ব্যাখা দেয়া হয়েছে। যদি পাঁচ দিনের আদাতের কোন নারী তার তার পবিত্রতার সময়ের পাঁচ দিনের পরে ষষ্ঠ দিনে রক্তপাত অবলকন করেন তবে এই ষষ্ঠদিনটি তার নতুন হায়েজ ,বা নতুন আদাত।পবিত্রতার সময়ও এই ভাবে একবারেই পরিবর্তিত হতে পারে। যখন এটি

পরিবর্তিত হয়।তার আদাতের সময় ও পরিবর্তিত হয়। ধরা যাক কোন নারীর আদাতের হিসেবমতে ,২৫ দিনের শুদ্ধতার পরে ৫ দিনের জন্য রক্তপাত হয় ,তার নতুন আদাতে তিন দিনের রক্তপাত হলে এবং ২৫ দিনের শুদ্ধতার বদলে ২৩ দিনের শুদ্ধতার সময় থাকলে ,ওই শুদ্ধতা বা রক্তপাতের সময়ের দিন সংখ্যা বরাবর পরিবর্তিত হবে। যেমনঃ রক্তপাত যদি দশ দিনের বেশি হয় ,তবে তা হবে ফাসিদ রক্তপাত এবং শেষ তিন কিংবা বেশি দিনের জন্য ঘটা ফাসিদ রক্তপাত , যদি তার পূর্বের আদাতের সাথে মিলিত করা হয় এবং পূর্বের আদাতের সাথে তার বর্তমান রক্তপাতের দিনগুলোকে মিলিয়ে তার নতুন আদাতের সময় ঠিক করতে হবে। তার আদাত এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যদি তার আদাত হয় পাঁচ দিনের এবং রক্তপাত সাতদিন আগে থেকেই শুরু হয় এবং এগার দিন চলে তবে তার পরবর্তী রক্তপাতের সময় হল ফাসিদ রক্তপাত ;কারন তা দশম দিন অতিক্রম করে গেছে । যদি আদাতের চতুর্থ দিনে রক্তপাত শুরু হয় এবং এবং একদিন শুদ্ধতার সময়ের মাঝে অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তার আদাত চার দিন হিসেবে ধরা হবে। নিচে এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বলা হল।

যদি রক্তপাতের নতুন দিনগুলোর সংখ্যা পূর্বের থেকে পার্থক্য থাকে ,তবে দশ দিন ধরে চলা রক্তপাতের মাঝে যদি দুই কিংবা তিন দিন আদাতের আগের নিয়ম অনুসরণ না করে ;তবে আদাতের সময় পরিবর্তিত হবে । তবে এতে দিনের কোন পরিবর্তন হবেনা । এবং এটি রক্তপাত শুরুর প্রথম দিন থেকে হিসেব করতে হবে । যদি কোন নারী যার আদাত পাঁচ দিনের যিনি এক মাসের এই পাঁচ দিনে কোন রক্তপাত অবলোকন না করেন কিংবা তিনি যদি তিন দিন ধরে রক্তপাত অবলোকন না করেন এবং তার পর ১১ দিনের জন্য রক্তপাত চলে তবে তার আদাতের সময় পরিবর্তিত হবে। এবং তার আদাত গননা করা হবে যখন থেকে তার রক্তপাত আরম্ভ হয়েছে। যদি তিন বা বেশি সংখ্যক দিন তার পুরাতন আদাতের থেকে পরিবর্তিত হয় তবে সেই দিন গুলোই মাসিকের মাঝে গণ্য হিসেবে ধরা হবে। বাকি দিনগুলোকে বলা হবে ইস্তিহাদা। যদি তার পূর্বতন আদাতের সময়ের পাঁচ দিন আগে রক্তপাত দেখা যায় তবে ;এবং আবার পাঁচ দিনের শুদ্ধতার পরের দিন তার রক্তপাত হয় তবে ইমাম আবু ইয়ুসুফের মতে , তা মাসিকের অন্তর্ভুক্ত এবং তার আদাত অপরিবর্তিত আছে। যদি তার পূর্বতন আদাতের শেষের তিন দিনে রক্তপাত দেখা যায় এবং তারপর ৮ দিন ধরে চলে ,

তবে ওই তিন দিনকে মাসিকের আওতায় আনা হবে এবং আদাতের দিন সংখ্যা পরিবর্তন হবে। যদি রক্তপাতের দিন খুব অল্প হয়)তিন দিনের কম (এবং দশ দিন অতিক্রম না করে তবে বাকি সময়কে মাসিকের আওতায় ফেলা হয় এবং পবিত্রতার সময়কে শুদ্ধতার আওতায় আনা হয়। যদি তার আদাত পাঁচ দিনের হয় এবং তা সত্ত্বেও ছয় দিনের মত রক্তপাত হয় এবং ১৪ দিনের শুদ্ধতার পরে আবার একদিন রক্তপাত হয় তবে তার আদাত পরিবর্তিত হয়নি। নিচে আমরা কিছু নারীর যাদের আদাতের সময় পাঁচ দিন তদের উদাহরন দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়।

১। যদি সেই নারী মাসিকের পাঁচ দিনের সময় অতিবাহিত করেন এবং পনের দিন শুদ্ধতা ও ১১ দিন এর পরে তার রক্তপাত সংঘটিত হয় ,তার আদাতের সময়ে যদি রক্তপাত না হয়ে তা ৫৫ দিন পরে নতুন করে শুরু হয় ,তবে আদাতের সময় বদলেছে তবে দিন সংখ্যা বদলায় নি। তার প্রথম পাচ দিনসহ এগারদিনকে মাসিকের আওতায় আনা হবে।

২। যদি ৪৬ দিনের পবিত্রতার পর কেউ ৫ দিনের জন্য রক্তপাত অবলোকন করেন এবং ১১ দিন ধরে চলে তবে ১১ দিনের শেষ দুই দিনকে আদাতের সময় হিসেবে ধরা হবে। যা হোক যদি তা তিন দিনের কম হয় তবে আদাতের দিন সংখ্যা পরিবর্তন হলেও সময় পরিবর্তিত হবে না। তাহলে ১১ দিনের প্রথম ৫ দিনকে মাসিকের সময় হিসেবে ধরা হবে।

৩। যদি কারো ক্ষেত্রে ৫ দিনের মাসিক সংঘটিত হয় এবং ৪৮ দিনের পবিত্রতার পর তার রক্তপাত ১২ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ,তবে ১২ দিনের ৫ দিন এবং পবিত্রতার দিন)যা সাধারণত ৫৪ দিন (এবং পরবর্তী পাঁচদিন হল মাসিকের চক্রের সময়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আদাতের সময়ের কোন পরিবর্তন হবে না।

৪। ৫ দিন রক্তপাতের পরে যদি ৫৪ দিন পবিত্রতার সময় এবং ১ দিনের রক্তপাতের পরে যদি আবার ১৪ দিনের শুদ্ধতার সময় চলে এবং তারপরে আবার তার ১ দিন পরে যদি আবার ১ দিনের রক্তপাত চলে। তবে মাঝের এই ১ দিনের শুদ্ধতার দিনটি তার পবিত্রতার সর্বশেষ দিন। আর ১৪ দিনের সময়টিকে তার নাফিস বা অসঠিক শুদ্ধতার সময় হিসেবে ধরা হবে। কারণ তা মূল সময়ের তুলনায় ৫ দিন কম। এই রক্তপাতের দিন এবং প্রথম ৫ দিনকে মাসিকের হিসেবে ধরা হবে| তখন আদাতের সময় ও দিন সংখ্যা পরিবর্তন হবে না।

৫। এই অনুক্রমে ,৫৭ দিন পবিত্রতার ক্ষেত্রে ৫ দিনের রক্তপাত এবং আবার তারপরে ৩ দিনের রক্তপাতের পরে ১৪ দিনের শুদ্ধতার দিন আসে এবং তার পর আবার একদিনের জন্য যদি রক্তপাত হয়। তবে এই ৩ দিনের রক্তপাতকে আদাতের সময় হিসেবে ধরা হবে।তাদের অনুসরণে যে ১৪ দিনের শুদ্ধতা সময় অতিবাহিত হয় তাকে রক্তপাতের অংশ হিসেবে ধরা হবে। যা হোক যখনি এই সংখ্যাটি ১১ দিনের বেশি হবে তখন থেকেই আদাত পরিবর্তিত হবে এবং তার দিন সংখ্যার সমান হবে।

৬। আবার যদি পাঁচ দিন রক্তপাতের পর ৫৫ দিনের শুদ্ধতার সময় এবং তারপর ৯ দিনের জন্য রক্তপাত এবং তারপর একটি সহিহ শুদ্ধতার সময় আসে। সেই শেষ ৯ দিনের রক্তপাতকে মাসিকের অংশ হিসেবে ধরা হবে।শুধু আদাতের দিন পরিবর্তন হবে।আদাতের সময়ের ক্ষেত্রে সেখানে কোন পরিবর্তন হবেনা।

৭। আবার এমন ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের রক্তপাত ও ৫৫ দিনের শুদ্ধতার পর আবার ১৪ দিনের রক্তপাত ঘটে তবে আগের নিয়মমতে ,এই ১০ দিনের সংখ্যাকে হায়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন শুদ্দতার ৫০ দিনের আদাত পরিবর্তন হয় । রক্তপাতের দিনগুলোই আদাতের সময় এবং তাদের সংখ্যাও সেই মোতাবেক পরিচালিত হয়।

৮। পাঁচদিনের রক্তপাত ,৫৪ দিনের বিশুদ্ধতার সময় ও সেই পথে ৮ দিনের রক্তপাত হলে শেষের ৮ দিন মাসিকের সময় এবং এর সাথে ৩ দিনের বেশি সময় হল আদাতের সময়। মাসিকের সময় ও শুদ্ধতার সময় এক দিন করে পরিবর্তন হয়।

৯। আবার পাঁচ দিনের রক্তপাত ও ৫৫ দিনের শুদ্ধতার ক্ষেত্রে এবং তারপর সাত দিনের রক্তপাত হলে এই সাত দিন হল মাসিকের সময় কাল। যা নিসাবের সমতুল্য কিন্তু আদাতের পূর্বে ঘটে ও নিসাবের চাইতে তিন দিন কম হয়। তাই এই ক্ষেত্রে হায়েজ এর সময় ও দিন সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হবে। যেখানে আদাত দিন সংখ্যা পরিবর্তন হবে।

১০। অন্যদিকে পাঁচ দিনের রক্তপাত ও ৫৮ দিনের শুদ্ধতার সময় এবং তারপর তিন দিনের রক্তপাত হলে ,এই তিনদিন হায়েয ,দুই দিন আদাতের দিন এবং বাকি একদিন উহ্য থাকবে। হায়েদের ও আদাতের সময় ও দিন সংখ্যা দুটোই পরিবর্তন হবে।

১১। পাঁচ দিনের রক্তপাত ও ৬৪ দিনের শুদ্ধতার পর ৭ থেকে ১১ দিনের মধ্যবর্তী

পুনরায় রক্তপাতের ক্ষেত্রে ,আগের নিয়মের মতই আগের সাত দিন হল মাসিক এবং এই ক্ষেত্রে আদাতের দিন ও সময় পরিবর্তিত হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে ,প্রথম এগার দিনের সর্ব প্রথম পাঁচ দিন হল মাসিকের সময় বাকি ছয় দিন হল ইস্তিহাদা । আদাত শুধুমাত্র এর নিজস্ব সময়ে পরিবর্তন হয়। যদি রক্তপাত ১০ দিনের বেশি হয় এই সংখ্যা পরিবর্তন হয় না। শুধু শুদ্ধতার দিন সংখ্যা পরিবর্তন হয়।

ইমাম ফখর-উদ –দিন উসমান জেয়লা'ই রাহুমু'ল্লাহু তা'আলার)১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ - মিশর (তার বই)**তেবিন-উল-হাকাইক** (এর বর্ণনায় ও আহমাদ বিন মুহাম্মাদ সেলবি রাহিমাল্লাহু তাআলা)১৬২১ খ্রিষ্টাব্দ -মিশরের এই বইয়ের দেয়া টীকা অনুসারে দেয়া ব্যাখায় বলেন ,যদি কেউ আদাতের এক দিন আগে রক্তপাত অবলোকন করে এবং ১০ দিনের শুদ্ধতা এনং আবার ১ দিনের জন্য রক্তপাত হয় তবে তার হায়েয ইমাম আবু ইয়ুসুফ রাহমাতুল্লাহু তা'আলার মতে ,শুরু হয় যখন সে কোন রক্তপাত দেখেনি তখন থেকে এবং আদাতের সময় কাল ধরে চলে। তার হায়েদের প্রথম ও শেষ দিন রক্তপাত বিহীন কাটবে। রক্তপাত আদাতের পূর্বে থেকে ধরা হবে ১০ দিনের পরে শেষ হবে যার মানে মধ্যবর্তী সময়ের ফাসিদ রক্তপাতের সময়টিকে রক্তপাতের দিনের আওতায় ধরা হবে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, এই পুরো সময়ই মাসিকের সময় নয়। ধরা যাক একজন নারীর আদাত ৫ দিনের রক্তপাত ও ২৫ দিনের শুদ্ধতার সময় ধরে নিল-

১। প্রথম ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রথম দিনের রক্তপাত অনুভব করেন এবং ১ দিনের শুদ্ধতার পর সরাসরি এক দিনের পর আবার ধারাবাহিক রক্তপাত অবলোকন করেন তবে এই অবস্থাকে ইস্তিমার বা অবর্ণনীয় অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থা যদি ১০ দিন চলে। এর পাঁচ দিন হল তার আদাতের সময়ের সমানুপাতিক যা মাসিকের সময়ের সমতুল্য। ইমাম ইউসুফের মতে ,এর আগের ও পরের রক্তপাত হল ইস্তিহাযার রক্তপাত। ইমাম মুহাম্মদের মতে আদাতের এই দিন সংখ্যা তিন দিন হবে। যেমনঃ যা তার আদাতের সমতুল্য তা মূলত মাসিকের অন্তর্ভুক্ত। এই তিন দিন হল আদাতের দ্বিতীয় ,তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের দিন । যদি কেউ আদাতের প্রথম দিন রক্তপাত অবলোকন না করে তবে সে যদি পঞ্চম দিন তার রক্তপাত অবলোকন করেও থাকে তা তার আদাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২। যদি সে তার আদাতের প্রথম দিন রক্তপাত দেখে ও পরের একদিন শুদ্ধতার অনুভব করে যা ধারাবাহিক রক্তপাতের বা ইস্তিমারের ধারায় চলমান হয় ও ১০

দিন ধরে অব্যহত থাকে তবে তার শুরুর পাঁচ দিন হল তার আদাতের সময় ও মাসিকের সময় । এই সময় ধ্রুপদী পণ্ডিতদের মতে ,এর প্রথম ও শেষ দিনে রক্তপাত চলবে ।

৩। যদি সে তার আদাতের তিন দিন রক্তপাত ও তারপর দুই দিনের শুদ্ধতার পর যদি ১০ দিনের বেশি ধারাবাহিক রক্তপাত কিংবা ইস্তিসমার চলে ,তবে তার আদাতের পাঁচ দিন হল তার মাসিকের সময়কাল ,ইমাম ইয়ুসুফের মতানুসারে ও ইমাম মুহাম্মদের ইজতিহাদ অনুসারে ,মাসিকের প্রথম ও শেষ দিনে অবশ্যই রক্তপাত হতে হবে।

বাহর এবং **দুররুল মুন্তেকা** নামের বইতে বলা হয়েছে ,যদি রক্তপাত আদাতের সময় অতিক্রম করে এবং ১০ দিনের পূর্বে থেমে যায় এবং পরবর্তী ১৫ দিনে ফিরে না আসে তবে বেশি দিনগুলোকে মাসিকের আওতায় ধরা হবে)ইসলামী স্কলারদের মতে (এই ক্ষেত্রে আদাতের সময় পরিবর্তিত হবে। যদি রক্তপাত ১৫ দিনের মাঝে একবার সংঘটিত হয় সেইসব ক্ষেত্রে তার আদাতের সংখ্যা পেরিয়ে গেলে সেইসব ক্ষেত্রে রক্তপাত ইস্তিহাযার অন্তর্ভূক্ত। ইস্তিহাযার এই সময়ে তাকে নিয়মিত ও কাযা নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক । তবে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে কিনা বুঝার জন্য যদি নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য মুস্তাহাব। যদি এই বন্ধের প্রক্রিয়া আদাত শেষ হবার সময়ের পর পর্যন্ত চলে এবং তাও যদি ১০ দিন অতিক্রম না করে তবে তাকে গোসল করে নামায আদায় করতে হবে। তার জন্য রোযা ও দাম্পত্য সম্পর্ক জায়েজ । যদি সে গোসল করতে না পারে এবং নামায আদায় করতে না পারে সেই ক্ষেত্রেও গোসল ছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক জায়েজ। যদি কোন বালিকা তার জীবনে প্রথমবারের মত রক্ত অবলোকোন করে কিংবা কোন নারী আদাতের ১৫ দিন পরও রক্তপাত অবলোকন করে তবে সেই ক্ষেত্রে রক্তপাত যদি তিন দিনের বেশি পার না হয় তবু দু'জনকেই নামাযের সময়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যখন রক্তপাত নিশ্চিতভাবেই বন্ধ হবে এই ক্ষেত্রে শরীর পরিষ্কার করে গোসল না করেও নিয়মিত ও কাজা নামায আদায় করতে পারবে)তিন দিনের কম সময়ের রক্তপাতে(যদি নামাযের পরে আবার রক্তপাত শুরু হয় তবে তারা নামায আদায় শুরু করতে পারবে না। আবার যদি রক্ত বন্ধ হয় তবে তারা নামাযের সময়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিয়মিত নামায ও কাযা নামায পড়তে পারবে। তবে অবশ্যই তিন দিনের চক্র

সম্পূর্ণ হতে হবে। এই ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক নাজায়েজ যদিও গোসল করা হয়। আবার যদি রক্তপাত তিন দিনের বেশি চলে এবং তা সত্ত্বেও আদাতের শেষ হবার আগে রক্তপাত শেষ হয় তবে দাম্পত্য সম্পর্ক তখনও হালাল নয় যতক্ষণ না আদাতের পরে কেউ গোসল না করে। যা হোক যদি সে নামাযের সময়ের শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন রক্তের আলামত না পায় তবে সে গোসল শেষ করে নামায আদায় করবে। সে চাইলে মধ্যবর্তী সময়ের কাযা নামায তাকে আদায় করতে হবেনা। তবে রোযা রাখতে হবে। রক্তপাত বন্ধের ১৫ দিন পর্যন্ত যদি রক্তপাত না হয় তবে যখন থেকে তা শেষ হয়েছে নতুন আদাত শুরু হবে। যদি রক্তপাত আবার হয় তবে সেই ক্ষেত্রে তাকে নামায থেকে দূরে থাকতে হবে এবং রোযার ক্ষেত্রে তাকে পরবর্তীকালে তার রোযা আদায় করতে হবে। যদি রক্তপাত বন্ধ হয় তবে সে গোসল করে নামায আদায় ও রোযা রাখতে পারবে। তাকে মূলত ১০ দিনের একটি চক্র সম্পূর্ণ করতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হলে রক্তপাত হলেও তা ইস্তিহাদা হিসেবে গণ্য হবে এবং সে শারীরিক সম্পর্ক ও রোযা রাখতে পারবে। তবে এই ক্ষেত্রে গোসল করা মুস্তাহাব।যদি রক্তপাত ভোরের দিকে শেষ হয়ে যায় এবং এবং গোসলের যথেষ্ট সময় থাকে তবে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে শুধু আল্লাহু আকবার না বলে ভোরের আগ থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রোযা রাখবে। যদি সে যথেষ্ট বার তাকবীর বা আল্লাহু আকবার বলার সময় থাকে তবে তাকে তার কাজা নামাযগুলোকে আদায় করা উচিৎ। যদি কারো রক্তপাত ইফতারের)১(পূর্বে চালু হয় তবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আবার নামাযের সময় হলে নামায ভেঙ্গে যাবে। এই ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তার রোযা পরে আদায় করতে হবে। যদি কেউ শুদ্ধতায় উপনীত হয় বা গোসলের পর পবিত্রতা অর্জন করে তাকে তার ফরয নামায কিংবা রোযা আদায় করতে হবেনা। যদি এটা নাফিলা নামায বা অতি প্রয়োজনীয় নামায হয় তবে সে কাযা আদায় করতে পারে। যদি ভোরের পরে সে তার ব্যবহৃত কাপড়ে)কুরসুফ(এ যদি রক্তের দাগ দেখে এবং তার মাসিকের আরম্ভ তখন থেকেই। যদি একইভাবে কুরসুফ পবিত্র থাকে তবে তার মাসিকের সময় অতিবাহিত হয়েছে।

১। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছদে এই বিষয়ে ক্ষেত্রে নামাযের সময় ও নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে ।

উভয় ক্ষেত্রেই রাতের নামায পড়া বাধ্যতামূলক। ফরজ নামাজ মূলত তার পবিত্র থাকার উপর নির্ভর করে।একজন নারী যদি তার নামাজের

কাজা আদায় করার সময়ের আগে রক্তপাত দেখে তবে তাকে ওই নামাজের কাজা আদায় করতে হবেনা। পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতার সময় হল দুই মাসিকের মাঝামাঝি সময়। যদি এই পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতার সময়টি সহিহ শুদ্ধতা নামে ও অভিহিত করা যায় যার মানে ইসলামিক পণ্ডিতদের মতানুসারে ,দুই হায়েজ এর রক্তপাতের মাঝের সময়।পবিত্রতার সময়ের অভ্যন্তরে রক্তপাতের ১০ দিনের জন্য চলা সময়কে মাসিকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তখন এই দশ দিনের পরবর্তী রক্তপাতের ঘটনাকে ইস্তিহাদা নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোন মেয়ে তিন দিনের রক্তপাতের পর ১৫ দিনের জন্য রক্তপাত ছাড়া কাটান যা আবার এক দিনের রক্তপাত এবং আবার একদিনের **পবিত্রতা** এবং তারপর তিন দিনের রক্তপাতের মাঝ দিয়ে যায় তবে ,প্রথম ও শেষ তিন দিনের রক্তপাতের যে সময় তা হায়েদের দুটি ভিন্ন সময়।কারন তার আদাত মূলত তিন দিন এবং দ্বিতীয় হায়েজ এক দিনের মাঝে আরম্ভ হবেনা। এই একদিনের রক্তপাত পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতাকে ফাসিদে পরিণত করেছে। মোল্লা হুসরাও রাহিমাল্লাহু তা'আলা)১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ(র মতে ,যা তিনি তার শেরেনেবলি ধারাভাষ্যে তার নিজের লেখা "**গুরের** "বা ছত্রে এ বর্ণনা করেনঃ কোন নারী যদি ১ দিনের রক্তপাত অনুসরণ করে ১৪ দিনের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে যায় এবং যদি ১ দিনের রক্তপাত অনুসরণ করে ৭ দিনের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে যায় এবং যদি ১ দিনের রক্তপাত অনুসরণ করে ৩ দিনের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে যায় এবং যদি ১ দিনের রক্তপাত অনুসরণ করে ২ দিনের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে যায় এবং যদি ১ দিনের রক্তপাত অনুসরণ করে ৪৫ দিনের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে যায় তবে এই ১৪ দিনের মাঝে ১০ হল মাসিকের সময়।বাকি দিন হল ইস্তিহাদার সময় ,ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাল্লহু তা'আলার মতানুসারে। কারণ মাসিকের সময় এই ১০ দিনের পরে নতুন করে শুরু হয়না যতক্ষণ না একটি পূর্ণাঙ্গ শুদ্ধতার সময় অতিবাহিত না হয়। শুদ্ধতার দিনগুলোতে যেদিন রক্তপাত হয় তাদের এই সময়ে ধরা হয় না যদি না তার হায়েদের সময় হয়।ইমাম আবু ইউসুফের মতে ,অন্যদিকে পবিত্রতার সময়ের প্রথম ১০ দিন ও তারপরের ১৪ দিন আসলে নিজস্ব স্থানে প্রত্যেকের স্থানে মাসিকের

সময়ের অন্তর্ভুক্ত। তার মতে ফাসিদ পবিত্রতার দিন যা একে অনুসরণ করে তা মুলত সেই দিন থেকে যখন থেকে রক্ত ধারাবাহিকভাবে পতন শুরু হয়। প্রথম ঘটনা অনুসারে ,১০ টি মাসিকের সময় ,২০ দিন সময় হল পবিত্রতার সময় এবং বাকি থাকে আরও ১০ দিন যা মাসিকের সময়। যদি রক্ত ১৫ দিন ধরে নির্গত হয় কোন পবিত্রতার দিন বাদে যেমনঃ ধারাবাহিক রক্তপাত বা **ইস্তিসমারের** মতো ,এই গণনা তার আদাতের অনুসারে সংগঠিত হবে।,যা তার আদাতের শুরুর পরে একটি পবিত্রতার সময় যা তার পূর্ববর্তী মাসের পবিত্রতার সময়ের সমানুপাতিক এবং এই মোতাবেক তার মাসিক যা তার আদাতের সমতুল্য অবশ্যই জরুরী। যদি কোন মেয়ের ক্ষেত্রে ইস্তিসমার সংঘটিত হয় তবে , **মেনহেল-উল-ওয়ারিদিন** নামের পুস্তিকায় বলা হয়েছে -এই চারটি কারণ মূলত দায়ী হতে পারেঃ

১। যদি রক্তপাত দেখা হয় তবে প্রথম ১০ দিনকে মাসিকের সময় হিসেবে এবং বাকি ২০ দিনকে শুদ্ধতার সময় হিসেবে নেয়া হবে।

২। যদি কোন বালিকা বা মেয়ে ইস্তিসমার অবস্থায় থাকেন তবে সহিহ রক্তপাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেই মেয়ের আদাত নির্ধারিত হবে। যেমনঃ যদি সে ৫ দিনের পাঁচ দিনের রক্তপাতের পর ৪০ দিনের শুদ্ধতার দিন পায় তবে প্রথম পাঁচ দিনকে মাসিকের সময় হিসেবে ধরা হবে। বাকি ৪০ দিন হল শুদ্ধতার দিবস। এই নিয়ম রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত চলবে।

৩। যদি সে ফাসিদ রক্তপাতের সময় অতিক্রম করে যা ফাসিদ শুদ্ধতার পরে আসে তবে এদের কোনটিই মাসিক রক্তপাতের অংশ নয়। যদি এই শুদ্ধতা ১৫ দিনের কম বা ফাসিদ রক্তপাতের প্রথম বারের দেখা রক্তপাতকে তখন ধারাবাহিক রক্তপাত কিংবা ইস্তিসমার এর সাথে তুলনা করা যায়। ১৪ দিনের পবিত্রতার অনুসরণে যদি ১১ দিনের রক্তপাতের ঘটনা ঘটে যাকে ইস্তিসমার বলা হয়। তাহলে প্রথম রক্তপাতকে ফাসিদ বলা হবে কারন এটি ১০ দিন অতিক্রম করে গিয়েছে। ১১ দিনের রক্তপাত ও ইস্তিমারের প্রথম পাঁচ দিন শুদ্ধতার সময়ের সাথে যোগ করলে এটি সম্পূরক আরও পাঁচ দিন সহ ১০ দিনের মাসিক রক্তপাত ও ২০ দিনের শুদ্ধতার একটি চক্রে পরিণত হয়। এই শুদ্ধতা যদি পুরনাঙ্গ হয় তবে এটি ফাসিদ থাকবে কারন এর সাথে রক্তপাতের দিন মিশ্রিত হয়ে আছে। তখন প্রথম

রক্তপাত টি ইস্তিস্মারে রুপান্তরিত হবে যদি না ফাসিদ শুদ্ধতা ও রক্তপাতের দিন মিলিয়ে তিরিশ দিন অতিক্রম না করে। শুতরাং এমন ক্ষেত্রে **১১** দিনের রক্তপাত যা **১৫** দিনের শুদ্ধতার প্রেক্ষাপটে আসে এবং রক্তপাত চলমান থাকলে এবং মোট দিন সংখ্যা তিরিশ অতিক্রম করে ও তাদের ইস্তিস্মারের দিনগুলোকে ফাসিদ রক্তপাতের আওতায় নিতে হবে।

৪। যদি সে সহিহ রক্তপাত এবং ফাসিদ রক্তপাতের শুদ্ধতায় ভুগে থাকে**,** তবে সহিহ রক্তপাতের সময়গুলোকে মাসিকের আওতায় ধরা হয়। তারপরে যা তিরিশ দিন বা বা যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে । যেমনঃ ইস্তিসমার যদি **১৪** দিনের শুদ্ধতার অনুসরণে যদি পাঁচ দিনের রক্তপাত হয় তবে ইস্তিসমার ঘটে তবে প্রথম পাঁচ দিনকে রক্তপাত এবং পরের ২৫ দিন হল শুদ্ধতার সময়। ইস্তিস্মারের প্রথম **১১** দিন শুদ্ধতার দিন হিসেবে ধরা হয় যা পুরন করে ২৫ দিনের সংখ্যা। তবে ৫ দিনের মাসিক ও ২৫ দিনের শুদ্ধতার দিন এভাবেই চলবে। এমনভাবে যদি ইস্তিসমার যদি তিন দিনের রক্তপাত ও **১৫** দিনের শুদ্ধতার অনুসরণে আসে তবে সহিহ রক্তপাতের প্রথম তিন দিন)মাসিকের দিন হবে ,(কারন বাকি সব দিনে ইস্তিসমার যদি ফাসিদ রক্তপাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবার পর্যন্ত এই ভাবে ,তার চক্র মূলত তিন দিনের হায়েয ও **৩১** দিনের শুদ্ধতা হিসেবে ধরা হবে। ইস্তিস্মারের সময়ে যাইহোক ,তিন দিন হল হায়েয এবং ২৭ দিনের শুদ্ধতা একে অনুসরণ করে। যদি শুদ্ধতার দ্বিতীয় সময় **১৪** দিনের হয় তবে ইমাম আবু **ইউ**সুফের মতে রক্তপাত তখন গ্রহন যোগ্য হবে যখন **১৪** দিনের প্রথম দুই দিনে আরও একদিন যোগ করলে চক্র সম্পূর্ণ হয় জাতে ৩ দিন মাসিকের দিন ও **১৫** দিনের সহিহ শুদ্ধতা থাকে। এই সময়কে আদাত হিসেবে কবুল করা যায়। যে নারী তার আদাত ভুলে যায় তাকে বলা হয় **মুহাইয়্যিরা** অথবা **দাল্লা বলা হয়**।

নিফাসের মানে হল জরায়ুর ভার মুক্তি বা সন্তান জন্ম দানের অবস্থার পর্যবেক্ষণ। যে রক্ত ভ্রূণের বিনষ্ট হওয়া থেকে আসে তাকে নিফাস বলে ,কারণ তার হাত , পা ,ও ভ্রূণ গর্ভস্থ সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে। নিফাসের ক্ষেত্রে কোন স্বল্প সময়ের তাড়া নেই। যখনি রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে তখনি সে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং তার নিয়মিত নামাজ চালু রাখবে। যা হোক ,সে এই সময়ে কোন কারো সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবেনা **য**তদিন তার আদাতের চক্র সম্পূর্ণ হয়। এর সর্বোচ্ছ মাত্রা ৪০ দিন। ৪০ দিনের পরে সে গোসল করে পবিত্র

হয়ে নামাজ আদায় করবে **য**দিও রক্তপাত চালু থাকে। ৪০ দিনের পরে রক্তপাত হলে তা ইস্তিহাযা। যদি কোন নারী প্রথম সন্তান জন্মদানের ২৫ দিন পরে পবিত্রতা অর্জন করে তবে তার আদাত ২৫ দিন। যদি কেউ দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পরে ৪৫ দিনের জন্য রক্তপাত ভুগে চলে তবে তার নিফাস ২৫ দিনের। বাকি ২০ দিন হল ইস্তিহাযা। তাকে এই ২০ দিনের নামাজের কাজা আদায় করতে হবে। নিফাসের দিন সংখ্যা অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারন যদি ৪৫ দিনের বদলে ৩৫ দিনে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে ৪৫ দিনই নিফাস। তবে তার আদাত ২৫ থেকে ৩৫ দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রমযান মা**সে** যদি কোন নারীর মাসিক রক্তপাত ভোরের আগে বন্ধ হয়ে যায় সে **ঐ**দিন রোযা অব্যাহত রাখবে। তবে রোযার শেষে তাকে **ঐ** রোযার পুনরায় কাযা রাখতে হবে। যদি তা ভোরের পর শুরু হয় তবে **সে** সব কিছু খেতে পারবে। হায়েয কিংবা নিফাসের দিনগুলোতে ,সকল মাযহাবেই নামায পড়া ,রোযা রাখা , কুরআন পড়া বা ,কাবা শরিফের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা এবং হস্তমৈথুন করা হারাম। সে তার রোযার কাযা করবে তবে নামাযের নয়। তার নামাযের দায় থেকে সে মুক্ত থাকবে। যদি নামায পড়ার সময় তার স্রাব আরম্ভ হয় তবে সে যতক্ষণ পারে নামায পড়বে এবং জায়নামাযে বসে থাকবে ,এবং বেশি বেশি জিকির ও তাসবিহ পাঠ করবে। সে এতে যে পরিমান সাওয়াব পাবে তা তার সর্বশ্রেষ্ঠ নামাযের সাওয়াবের সমতুল্য।

জাওহারা-ত-উন-নেয়্যিরা নামক বইতে উল্লেখিত যে,একজন নারী অবশ্যই তার স্বামীকে তার অবস্থা সম্পর্কে অভিহিত করবে। যদি তার স্বামী জিজ্ঞে**স** করে সে যদি না বলে তবে তা একটি স্থুল ও বিশাল গুনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। আবার সে তার শুদ্ধতা চলমান থাকা অবস্থায় তার হায়েয শেষ এই দাবি করে তাও অত্যন্ত গুনাহের কাজ। আমাদের নবী বলেছেন'' **;যে নারী তার স্বামীর কাছে তার হায়েযের শুরু ও শেষ গোপন করেছে সে অভিশপ্ত**''। এটা হারাম যে কেউ যদি তার স্ত্রীর মাসিক চলাকালিন সময়ে পেছন পথে সম্পর্ক স্থাপন করে অথবা সে যদি পবিত্র থাকেও। এটি অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ। যে ব্যক্তি এই কাজটি করবে সে অভিশপ্ত। **সমকামিতা** আরও বড় পাপ। এটিকে বলা হয় **লিভাতা** এবং সুরা আম্বিয়াতে একে অত্যন্ত চরম গুনাহ ও নোংরা কাজ হিসেবে বলা হয়েছে। **বিরগিভি**র বর্ণনামতে ,আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন“ **'যদি তোমরা কোন দুই ব্যক্তিকে সমকামী অবস্থায় পাও তবে দুজনকেই হত্যা কর**” । কিছু ইসলামিক পণ্ডিতের মতে দুজনকেই এ ক্ষেত্রে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে। দুজনই অপবিত্র এই কাজের পরে। এই কাজের দ্বারা শুধু কেউ অপবিত্র হয়না এটি রোযাকে হরণ করে। যদি কোন নারী দেখে যে তার হায়েয নামাযের সময়ে শুরু হয়েছে তবে সে নামায তখনও পড়েনি তখন তাকে সেই নামায কাযা কিংবা আদায় করার প্রয়োজন নেই। এই ক্ষেত্রে চতুর্থ অধ্যায়ে দৃষ্টি নিবন্ধন করা যেতে পারে।

অযু সংক্রান্ত

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অযুর ফরজ ৪টি, শাফেয়ী মাযহাব অনুয়ায়ী ৭টি এবং মালেকী ও হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী ৬টি । হানাফী মাযহাব অনুয়ায়ী অযুর ফরযগুলো হলোঃ

১- মুখমন্ডল ধৌত করা,

২- উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা,

৩- মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা,

৪- উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

চার ধরনের অযু রয়েছেঃ

প্রথম ধরন হলো ফরয, দ্বিতীয় ধরনের অযু ওয়াজিব, তৃতীয় ধরনের হলো সুন্নত এবং চতুর্থ ধরন হলো মানদুব।

ফরয অযুঃ

কুরআনে কারিম ধরার জন্য, পাচঁ ওয়াক্ত নামাজের জন্য, জানাযার নামাযের জন্য (**সীমাহীন করুণা**,র পনেরোতম অধ্যায়ের পঞ্চম ধাপ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে), তিলাওয়াতে সিজদা করার জন্য (**সীমাহীন করুণা**,র ষোলতম অধ্যায়ের চতুর্থ ধাপে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) ।

ওয়াজিব অযুঃ

তাওয়াফ –ই জিয়ারাতের সময়ের অযু। (**সীমাহীন করুণা**,র সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম ধাপে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

সুন্নত অযুঃ

কুরআন পড়ার (না ধরে) পুর্বে অযু করা, অথবা মুসলিমদের কবরস্থানে যাওয়ার

আগে, অথবা গোসলের আগে অযু করা।

মানদুব অযুঃ

ঘুমতে যাওয়ার আগে অথবা ঘুম থেকে উঠে অযু করা। যদি আপনি মিথ্যা বলেন বা কারো ব্যাপারে গীবত করেন অথবা যৌণ উত্তেজনা তৈরী করেন এমন মিউজিক শুনেন তাহলে উক্ত পাপের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং তখন অযু করা মানদুব। ইলম (জ্ঞান) অর্জনের জন্য যাওয়ার আগে অযু করা ও মানদুব অথবা অযু থাকা সত্ত্বেও নতুন করে অযু করা কিন্তু পুর্বের অযু দ্বারা এমন একটি ইবাদাত সম্পন্ন করা হয়েছে যেটা অযুহীন অবস্থায় করার অনুমতি নাই (যেমন, আগের অযু করার পর নামাজ পড়া হয়েছে)। যদি সেই ইবাদতটি সম্পন্ন করা না হয় (যেটার জন্য অযু করা হয়ে ছিল) তবে অযু অবস্থায় পুনরায় অযু করা মাকরুহ।

পানি সংক্রান্ত

পানির প্রকারঃ চার ধরনের পানি রয়েছে– মা-ই মুতলাক; মা-ই মুক্বাইয়াদ; মা-ই মাশকুক; মা-ই মুস্তা,মাল। [১]

১- মা-ই মুতলাকের উদাহরণ হলো বৃষ্টির পানি, সমুদ্রের পানি, বহমান নদীর পানি এবং কূপের পানি। এ পানিগূলোতে ময়লা পরিস্কারের গুণাবলি আছে।এগুলো যে কোন কাজে ব্যাবহার করা যায়।

২- মা-ই মুক্বাইয়্যদের উদাহরণ হলো বাঙ্গীর রস, তরমুজের রস, আঙ্গুরের রস, ফুলের রস, এবং এ ধরনেরগুলো। এ ধরনের পানিরও ময়লা পরিস্কারের গুণাবলি রয়েছে যদিও অযু বা গোসলের জন্য এগুলো ব্যাবহার করা হয় না।

৩- গাধার অথবা এমন খচ্চরের যা গাধার মতো পানি পানের পর রেখে যাওয়া পানিকে বলা হয় মা-ই মাশকুক। এ পানি দ্বারা অযু এবং গোসল উভয়টাই করা বৈধ। কেউ চাইলে একটার পর আরেকটা করতে পারে।

৪- পানি তখনই মা-ই মুস্তা,মাল হবে যখন সেটা জমিনে পরবে অথবা কারো শরীর থেকে পরবে (অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়)। এটা একটা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় (ইসলামি আলেমদের মাঝে)। বিশেষ করে যখন এটা শরীর বেয়ে পরে (এ ফাত্তোয়াটি ইজতিহাদের ভিত্তিতে গ্রহনীয়)। এটার উপর ভিত্তি করে তিনটি ক্বাওল (অর্থাৎ এমন বিবৃতি যেখানে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ [১] প্রকাশ

করেন) রয়েছে। ইমামে আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা এধরনের পানিকে নাজাসাতুল গালিজা[2] (খারাপ নাজাসাত) বলেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহু তায়ালার মতে এটা নাজাসাতুল খাফিফা। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহু তায়ালার মতে এধরনের পানি পরিস্কার। শেষের ক্বাওলটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে (চুড়ান্ত ফাত্বোয়ার ভিত্তিতে)।

অযুর ওয়াজিবসমুহঃ

অযুর ওয়াজিব নয়টি (অর্থাৎ অযু সম্পন্ন হওয়ার শর্ত), যেমনঃ

১- মুসলিম হওয়া

২- বয়ঃ সন্ধিতে পৌছানো।

৩- সুস্থ (মানসিকভাবে অর্থাৎ পাগল না) হওয়া।

৪- অযু না থাকা।

৫- অযুর পানি (যেটা ব্যাবহার করা হবে) পরিস্কার থাকা।

৬- অযু করার সামর্থ থাকা।

৭- (মহিলাদের জন্য) মাসিক অবস্থায় না থাকা।

৮- (মহিলাদের জন্য) প্রসবকালিন পিরিয়ডে না থাকা।

৯- সকলের জন্য দৈনিক (পাঁচবার) ওয়াক্ত নামাজের জন্য, নামাজের সময় হওয়া। (এই নবম শর্তটি ওজর ওয়ালা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে,যেটা **সীমাহীন করুণা**,র তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ধাপের শেষের ছয় প্যারাগ্রাফে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

অযুর সুন্নাতসমুহঃ

সুন্নাতসমুহের মধ্যে পঁচিশটি নিম্নে দেয়া হলোঃ

১- আউযু (সম্পুর্ণঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম) বলে অযু শুরু করা।

২- বাসমালা বলা (সম্পূর্ণরুপঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)।

৩- উভয় হাত ধৌত করা।

৪- আঙ্গুলগুলো খিলাল করা (চিরুনীর দাঁতের মত করে এক হাতের ভিতরে আরেক হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে ভালো করে ধৌত করা)।

৫- মুখের ভিতরে পানি দেয়া।

৬- নাকের ভিতরে পানি দেয়া।

৭- নিয়্যত করা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, মুখ ধৌত করার সময় নিয়ত করা সুন্নত, ফরজ নয়। তবে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী এটা ফরজ। মালেকী মাযহাব অনুযায়ী হাত ধৌত করার সময় নিয়ত করা ফরজ।

৮- ক্বিবলা মুখি হওয়া।

৯- দাঁড়িতে খিলাল করা (চিরুনীর মত হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করে) [যদি ঘন হয় তবে]।

১০- দাঁড়িকে মাসেহ করা।

১১- ডান পার্শ্ব থেকে শুরু করা।

১২- বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা, ছোট আঙ্গুল থেকে শুরু করে বুড়ো আঙ্গুলের দিকে যাওয়া।

১৩- সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা।

১৪- মাথা মাসেহের পর লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি দ্বারা কান ও ঘাড়ে মাসেহ করা।

১৫- তারতীব বজায় রাখা (অর্থাৎ অঙ্গগুলোর ক্রমধারা বজায় রেখে অযু করা)।

১৬- দুই অঙ্গ ধৌত করার ফাঁকে বিরতি না দেয়া অর্থাৎ এক অঙ্গ ধৌত করার পরপরই অপর অঙ্গ ধৌত করা।

১৭- মাথা মাসেহ করার সময় সামনের অংশ থেকে শুরু করা।

১৮- মিসওয়াক করা।

১৯- চোখের পাশে এবং আই ভ্রুতে পানি পৌছানো।

২০- অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় হাত দ্বারা ঘষা-মাজা করা।

২১- কিছুটা উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে অযু করা।

২২- প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করে ধৌত করা।

২৩- অযুর বদনা/ পাত্র পুনরায় পূর্ণ করা।

২৪- অযুর সময় কথা না বলা।

২৫- নিয়ত রক্ষা করা।

মিসওয়াকের ব্যবহারঃ

মিসওয়াক ব্যবহারের পনেরোটি উপকারিতা রয়েছে। এই উপকারিতাগুলো **সিরাজ-উল- ওয়াহহাজ** (এটা তিন খন্ডে প্রকাশিত আবু বাক্কার বিন আলি হাদ্দাত ইয়েমেনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখা, মৃত্যু ৮০০ হিঃ /১৩৯৭খ্রীঃ) নামক কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে এবং আবুল হুয়েন আহমদ বিন মুহাম্মদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (জন্ম ৩৬২ হিঃ /৯৭৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ৪২৮ হিঃ/ ১০৩৭খ্রীঃ) এর কিতাব `**মুখতাসার-ই-কুদুরীতে** লিখিত আছে এভাবে-

১- এটা মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদত বলার কারণ হবে।

২- দাঁতের মাড়িকে শক্ত করে।

৩- বুকের কফ নরম করতে সহায়তা করে (এটা একটি উত্তম কফ নির্গমনকারী)।

৪- দাঁতের ব্যাথা দূর করে।

৫- শ্বাস কষ্ট দূর করে।

৬- আল্লাহ তায়ালা মিসওয়াককারীর উপর সন্তুষ্ট হন।

৭- করোটির রক্তনালীকাকে মজবুত করে।

৮- শয়তান অসন্তুষ্ট হয় (যখন মিসওয়াক করা হয়)।

৯- আপনার চোখ নুরের আলোয় উজ্জল হবে (যখন মিসওয়াক করা হয়)।

১০- এটা পূণ্য কাজ বাড়িয়ে দেয় (খায়ের ও হাসানাত)।

১১- এটা অতিরিক্ত পিত্ত রসক্ষরণকে বাধা দেয়।

১২- এর মাধ্যমে সুন্নত পালনের অভ্যাস তৈরী হয় (মিসওয়াক ব্যবহার)।

১৩- আপনার মুখ পরিস্কার থাকবে।

১৪- আপনার কথা শ্রুতিমধুর হবে।

১৫- মিসওয়াক করে (অযু করে) দু,রাকাত নামাজ পড়লে সেটা মিসওয়াকবিহীন সত্তর রাকাত নামাজ অপেক্ষা অধিক সওয়াব হবে।

অযুর মুস্তাহাবসমুহঃ

অযুর মুস্তাহাব ছয়টি, যেমনঃ

১- মনে মনে যে নিয়ত করা হয়েছে সেটা মুখে উচ্চারণ না করা।

২- কান মাসেহের পর অবশিষ্ট লেগে থাকা পানি দ্বারা ঘাড়ে মাসেহ করা।

৩- ক্বিবলামুখি রেখে পা ধৌত না করা।

৪- যদি সম্ভব হয় অযুর পর বেচে যাওয়া পানি পান করে ফেলা।

৫- অযুর পর নিজের কাপড়ে কিছু পানি ছিটিয়ে দেয়া।

৬- পরিস্কার তোয়ালে বা গামছা দ্বারা ধৌত অঙ্গগুলো মুছে ফেলা।

ইবনে আবেদীন তার `অযুর ভুল থেকে মুক্তি, নামক লেখায় উল্লেখ করেন, ”আপনার মাযহাবে মাকরুহ নয় এমন কিছু যদি অন্য মাযহাবে (অন্য তিন মাযহাবের যে কোন একটিতে) ফরয হয় তবে তা পালন করা আপনার জন্য মুস্তাহাব„। ইমাম রব্বানি মুজাদ্দেদ আলফে সানি (রঃ) তার দুইশত ছিয়াশি নম্বর রচনায় উল্লেখ করেছেন, ”যেহেতু মালেকী মাযহাব অনুযায়ী অযুর সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় হাত দিয়ে হালকা করে ঘষা (মাজা) ফরয, অতএব আমাদেরও (হানাফী মাযহাবে) অবশ্যই তা করা উচিত„। ইবনে আবেদীন তালাক-ই- রাজয়ী [1] এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, ”হানাফী মাযহাবের কোন মুসলমানের মালেকী মাযহাব অনুকরন করাটা প্রশংসনীয়। কেননা ইমাম মালেক (মালেকী মাযহাবের ইমাম) ইমাম আযম আবু হানিফার (হানাফী মাযহাবের ইমাম) একজন শিষ্য ছিলেন। যখন হানাফী মাযহাবের আলেমগণ হানাফী মাযহাবে কোন ক্বাওল খুজে না পান তাখন তারা মালেকী মাযহাব অনুযায়ী চুড়ান্ত ফাত্বোয়া দিয়ে থাকেন। অন্য সকল মাযহাবের (বাকী তিনটি) মধ্যে মালেকী মাযহাবই হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে নিকটবর্তী„।

অযুর মাকরুহসমুহঃ

অযুর মাকরুহ আঠারোটি, যেমনঃ

১- মুখের মধ্যে জোরে পানির ছিটা দেয়া।

২- অযুর পানির মধ্যে শ্বাস ফেলা।

৩- অযুর অঙ্গগুলো (যেগুলো তিন বার ধৌত করতে হয়) তিন বারের কম ধোয়া।

৪- অযুর অঙ্গগুলো তিন বারের বেশি ধৌত করা।

৫- অযুর পানির মধ্যে থুথু ফেলা।

৬- অযুর পানির মধ্যে নাক ঝারা দেয়া।

৭- গরগরা করার সময় গলার ভিতরে পানি যাওয়া।

৮- দেহের পিছনের অংশকে কিবলামুখি করা (যখন অযু করা হয়)।

৯- শক্ত করে চোখ বন্ধ করে রাখা ।

১০- বড় করে চোখ খুলে রাখা ।

১১- বাম পাশ থেকে অযু শুরু করা।

১২- ডান হাতের সাহায্যে নাক ঝারা দেয়া।

১৩- মুখে পানি দেয়ার সময় বাম হাতে দেয়া।

১৪- নাকে পানি দেয়ার সময় বাম হাতে দেয়া।

১৫- পাকে মাটিতে (বা ফ্লোরে) গেঁথে রাখা।

১৬- সূর্য রশ্মিতে গরম পানি দ্বারা অযু করা।

১৭- মা-ই মুস্তামাল পানি ব্যবহার ত্যাগ না করা।

১৮- অযুর সময় জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা।

অযু ভঙ্গের কারণসমুহঃ

অযু ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে ২৪টি উল্লেখ করা হলোঃ

১- পিছনের রাস্তা (পায়ু পথ) হতে কিছু বের হওয়া।

২- সামনের রাস্তা (যৌণাঙ্গ) হতে কিছু বের হওয়া।

৩- কৃমি, পাথর বা এ জাতীয় কিছু সামনের বা পিছনের পথে বের হওয়া।

৪- ডুশ নিলে।

৫- ঔষধ হিসেবে কোন মহিলা তার জরায়ুতে কিছু প্রবেশ করালে তা যদি বের হয়ে আসে ।

৬- যদি কানে কোন ঔষধ প্রবেশ করানোর পর তা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে, তবে তা অযু ভঙ্গ করবে । [তা যদি নাক বা কান দিয়ে বের হয় তবে অযু ভঙ্গ হবে না । (**ফত্বোয়া-ই হিন্দিয়া**)]

৭- কোন পুরুষ যদি সুতি সলতে (বা পলিতা) তার প্রশ্রাবের রাস্তায় প্রবেশ করায় এবং সেটা ভিজে যায় এবং প্রশ্রাব বের হয়ে আসে । [যদি সলতের কিছু অংশ বাইরে থাকে এবং প্রশ্রাবের রাস্তার বাইরে থাকা অংশটি শুষ্ক থাকে তবে সেটা অযু ভঙ্গের কারণ হবে না যেহেতু প্রশ্রাব বের হবে না।]

৮- সুতি সলতেটি পরে গেলে, বাইরে থাকা অংশটি যদি ভিজা পাওয়া যায়।

৯- মুখ ভর্তি বমি হলে। মুখের শ্লেষ্মার কারণে অযু ভঙ্গ হবে না, যেহেতু এটার পরিমান কম । ঘুমন্ত মানুষের মুখ দিয়ে তরল কিছু বের হলে, সেটা পরিস্কার মুখকে হলদে করে দিলেও।

১০- কোন রোগের কারণে চোখ বেয়ে পানি বের হলে অযু ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি কান্নার কারণে বা চোখ জ্বলার করণে হয় যেমন পেয়াজের ঝাঁঝের কারণে তবে অযু ভাঙ্গবে না।

১১- নাক থেকে রক্ত, পুঁজ বা হলদে তরল বের হলে অযু ভেঙ্গে যাবে এমনকি সেটা যদি নাসারন্দ্র পথেও বের হয়। তবে নাকের মিউকাস (শ্লেষ্মা) এগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি নাসা পথে মিউকাস (শ্লেষ্মা) বের হয় তবে সেটা অযুকে ভঙ্গ করবে না।

১২- থুথুতে যদি বেশি পরিমাণে রক্ত থাকে তবে সেটা অযু ভেঙ্গে দিবে।

১৩- যদি আপনি দংশিত স্থানে তৎক্ষনাত রক্ত দেখতে পান, এটা আপনার অযু ভেঙ্গে দিবে যদি আপনার মুখ ও দাঁত থেকে রক্ত বের হয়। তবে অন্য জায়গা থেকে বের হলে ভাঙ্গবে না।

১৪- যদি শরিরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে উক্ত অংশে ছড়িয়ে পরে, যদি সেটা অল্প পরিমাণেও হয়, তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে, তবে যদি আপনি শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবের হন তবে অযু ভাঙ্গবে না।

১৫- আপনি জিন ছাড়া ঘোড়ার উপর আসীন, যদি এটা পর্বতের নীচে নামার সময় তন্দ্রা চলে আসে তবে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে।

১৬- আপনি অযু করেছেন না করেন নি, এটা নিয়ে সন্দেহপ্রবন হোন, আপনার ধান-ই- গালিব (সচরাচর মতামত) হওয়া উচিত যে আপনি অযুহীন অবস্থায় আছেন।

১৭- আপনি যদি অযুর সময় কোন একটি অঙ্গ ধুতে ভুলে যান এবং কোন অঙ্গ সেটা জানা না থাকে, (তবে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে)।

১৮- যদি আপনার ফোস্কা পরা অঙ্গ থেকে কোন ধরনের পুঁজ, রক্ত বা

হলদে জিনিস বের হয়ে আসে, সেটা নিজে নিজেই হোক বা আপনি চাপ দেয়ার ফলেই হোক, (তবে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে)।

১৯- মনে করেন আপনার কোন ঘাঁ বা ক্ষত রয়েছে, সেটার মাঝে যদি কোন ধরনের পুঁজ, রক্ত বা হলদে তরল লেগে থাকে, তবে সেই ক্ষত স্থান বা তার তুলা বা তার ব্যান্ডেজ যেখানে ঐ পুঁজ লেগে আছে তা যদি সুস্থ কোন স্থানে (শরীরের) লাগে তবে অযু ভেঙ্গে যাবে। আলেমদের এমন একটি মত রয়েছে যদি ঘাঁ থকে বের হওয়া জিনিস রঙবিহীন হয় তবে অযু ভাঙ্গবে না । এটা ঐ সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য যারা চুলকানি, বসন্ত বা একজিমা রোগে ভুগছে।

২০- যদি কেউ উলংগ অবস্থায় তার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে (তাদের অযু ভেঙ্গে যাবে) ।

২১- মনে করুন, আপনি কোন কিছুতে হেলান দেয়া অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন; (আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে) যদি আপনার তন্দ্রা এতো গভীর হয় যে হেলান দেয়া বস্তুটি সরিয়ে ফেললে আপনি পরে যাবেন।

২২- রুকু সেজদাসহ নামাজে যদি কেউ এমন জোরে হাসি দেয় যে সে নিজে এবং তার পাশের জন সে হাসি শুনতে পায়। তবে যদি হাসির শব্দ এমন হয় যে শুধু নিজেই শুনবে পাশের জন শুনতে পাবে না তবে অযু নষ্ট হবে না, কিন্তু নামাজটি ফাসিদ হয়ে যাবে (অন্য কথায়, এমন জোরে হাসি যে শুধু নিজেই তার শব্দ শুনতে পায় পার্শ্বের জন শুনতে পায় না তবে সেটা নামাজকে নষ্ট করে দিবে, কিন্তু অযু নষ্ট হবে না)।

২৩- মৃগী রোগী মুর্ছা গেলে বা কেউ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে অযু ভেঙ্গে যাবে।

২৪- যদি কান থেকে পুঁজ, হলদে তরল বা রক্ত বের হয়ে শরীরের এমন জায়গায় লাগলো যেটা গোসলের সময় ধৌত করা হয় (তবে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে)।

আমাদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়ানরা শিখেছে কিভাবে জনসম্মুখে নিজেকে ধৌত করা হয়। এর আগে তাদের ঘরগুলো থেকে এমন পুতি-গন্ধ বের হত যে মনে হত আর একজনের নিশ্বাসের দুর্গন্ধ।আর এ পরিচ্ছন্নতাকে মুসলমানরাই বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার মানে মানবতাকে খারাপ শত্রু থেকে রক্ষা করেছে।

অযুর সময় পঠিত দুয়াসমুহঃ

অযু শুরুর আগে বলবেন,"**বিসমিল্লাহিল আযীম ওয়াল হামদুলিল্লাহি আলা দ্বিনিল ইসলামি ওয়াআলা তাউফিকিল ইমানি আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি জ্বাআলমা তাহুরুন ওয়াজ্বাআল ইসলামা নু,রুন,,** ।

অযু সম্পন্ন হলে পড়বে, "**আল্লাহুমমাজ আলনি মিনাততাওয়্যাবিনা ওয়া জায়ালনি মিনাল মুতাতাহহিরিনা ওয়া জায়ালনি ইবাদিকাস সালেহিনা ওয়া জায়ালনি মিনাল্লযিনা লাখাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযুনুন,,** ।

অতপর আসমানের দিকে তাকিয়ে পড়বে, **সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লাশারিকা লাক ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুকা,,**

এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে "**ইন্না আনযালনা**,, সুরাটি এক, দুই বা তিনবার পড়বেন।

ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন অত্যন্ত জরুরী এবং নিজের পরিবার ও সন্তানদেরকেও শিখানো উচিত। কেননা ব্যক্তিকে তার স্ত্রী সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে।

তায়্যাম্মুম সংক্রান্ত

হানাফী মাযহাব মতে নামাযের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই তায়্যাম্মুম করলে সেটা সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য তিন মাযহাবে সহীহ হবেনা।

তায়্যাম্মুমের তিনটি ফরজ রয়েছে। অযুর পরিবর্তে তায়্যাম্মুম করার নিয়ম আর গোসলের পরিবর্তে তায়্যাম্মুমের নিয়ম একই। পার্থক্য শুধু নিয়্যতে। ফলে একটার পরিবর্তে অন্যটি হলে দুই তায়্যাম্মুমের প্রয়োজন নেই।

১- নিয়্যত করা, যেটা করা আবশ্যক।

২- দুই হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করা অতঃপর সমগ্র মুখে মাসেহ করা, দুই হাত দিয়ে পুরো মুখ ঢাকতে হবে।

৩- দুই হাতের তালু দ্বারা পুনরায় মাটি স্পর্শ করা এবং তারপর প্রথমে বাম হাতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডান হাত মাসেহ করা এরপর ডান হাতের সাহায্যে পুরো বাম হাত মাসেহ করা (কনুইসহ)। এইসবগুলো রুকন এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ

তায়্যাম্মুমের সময় এগুলো করা ফরয। যদি তার মধ্যে কোন একটি ছুটে যায় তবে তায়্যাম্মুম শুদ্ধ হবে না)।

আল-কুরাআন অনুসারে তায়্যাম্মুম ফরয। যেমন, সুরা নিসা এর ৪৩তম আয়াত এবং সুরা মায়েদা এর ৬ষ্ঠ আয়াত। মালেকী এবং শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী নামাযের ওয়াক্ত শুরু (অর্থাৎ যে নামাযে অযুর পরিবর্তে তায়্যাম্মুম ব্যবহার করবেন) হওয়ার আগে তায়্যাম্মুম করার অনুমতি নেই এবং এক তায়্যাম্মুম দিয়ে একাধিক নামায আদায় করা যাবে না। (অন্য কথায়, প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা তায়্যাম্মুম করতে হবে এবং নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত তায়্যাম্মুমের জন্য অপেক্ষা করতে হবে) ।

ছয়টি জিনিস দ্বারা তায়্যাম্মুম হবেনা, তবে যদি সেগুলোর উপর ধুলো লেগে থাকে তাহলে হবে। এ ছয়টি জিনিস হলোঃ লোহা, ব্রোঞ্জ, টিন, কপার, সোনা, তামা, রুপা এবং অন্য সকল ধাতু । যে ধাতুগুলো তাপ দিলে গলে যায়; গ্লাস, বা যেগুলো তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং চকমকে পোর্সেলিন ছাড়া অন্য যে কোন কিছু দ্বারা তায়্যাম্মুম করা যাবে। যদিও এগুলো মাটি থেকে তৈরী।

যেখানে প্রশ্রাব করা হয়েছে এমন জমিন শুকিয়ে গেলে সেখানে নামাজ পড়া যাবে কিন্তু সে মাটি দ্বারা তায়্যাম্মুম করা যাবে না।

প্রথমে পানি খুজতে হবে। যদি না পাওয়া যায়, কোন আদিল ও সালিহ মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তারপরও না পাওয়া গেলে তায়্যাম্মুম করা যাবে। একজন সালিহ মুসলিম মানে যে শুধু হারাম থেকেই বেঁচে থাকে তা নয় বরং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বেঁচে থাকে। এ ভয়ে যে অসাবধানতায় যাতে কোন গুনাহ না হয়ে যায়। দয়া করে **সীমাহীন করুণা**র প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ধাপে সন্দেহ যুক্ত কাজগুলো দেখুন।)

তায়্যাম্মুমের সময় পাঁচটি আবশ্যকীয় কাজ হলোঃ

১- নিয়ত করা।

২- মাসেহ করা।

৩- তায়্যাম্মুমের জন্য ব্যবহৃত জিনিস অবশ্যই মাটি জাতীয় হতে হবে। যদি সেটা মাটি জাতীয় না হয় তবে অন্তত পক্ষে সেটার গায়ে ধুলো লেগে থাকতে হবে।

৪ – মাটি জাতীয় জিনিসটি অথবা ধুলো লেগে থাকা জিনিসটি পবিত্র হতে হবে।

৫- প্রকৃত পক্ষেই পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে (অযুর জন্য)। [কোন অসুস্থতার পরের দুর্বলতাও একটি ওজর হিসেবে গন্য হবে (এক্ষেত্রে পানি দিয়ে অযুর

পরিবর্তে তায়্যাম্মুম করা যাবে)। বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতাও এটার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের লোকদের আরেকটি সুবিধা হলো চাইলে তারা বসে নামাজ পরতে পারবে।]

তায়্যাম্মুম করার সময় ৭টি সুন্নত রয়েছেঃ

১- বিসমিল্লাহ বলা, (অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে তায়্যাম্মুম শুরু করা)।

২- হাতের (তালু) দ্বারা (হাল্কা করে) পরিস্কার মাটিতে আঘাত করা।

৩- যার দ্বারা তায়্যাম্মুম করা হচ্ছে তার উপর সামনে পিছনে হাত ঘষা।

৪- আঙ্গুলগুলো খুলে রাখা।

৫- মাটিসহ দুই হাত পরস্পরের সাথে আঘাত করা।

৬- সর্বপ্রথম মুখ মাসেহ করা।

৭- কুনুইসহ উভয় হাত সম্পূর্ণ মাসেহ করা।

পানি খোজার জন্য ৪টি জিনিস পুরণ করতে হবেঃ

১। যদি আপনি আপনার নিজের এলাকায় থাকেন।

২। যদি আপনি পানি থাকার বিষয়ে অবগত হন।

৩।যদি আপনি পানি থাকার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হন।

৪। যদি আপনি ভীতিকর কোন জায়গায় না থাকেন।

যদি কোন ব্যক্তি পানি খুজে পায় এবং তা তার থেকে এক মাইলের বেশি দূরে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা গ্রহণযোগ্য। যদি দূরত্ব এক মাইলের কম হয় এবং নামাজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকে তবে তায়াম্মুম করা যায়েজ হবে না। [এক মাইল চার হাজার জারের সমান, ০.৪৮ X ৪০০০= ১৯২০ মিটার। হানাফি মাযহাবের মতে।] অন্যদিকে যদি কেহ পানির খোঁজ করে না পেয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে এবং পরবর্তীতে পানি খুঁজে পায় তাকে কি পুনরায় নামায আদায় করতে হবে? এটি ইসলামি চিন্তাবিদের কাছে প্রশ্ন। এটির উত্তর হল, তাকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি ভিজে যায় কিন্তু তারপরও অজু করার মত পানি না পায় এবং তায়াম্মুম করার মত কিছু না পায় তখন সে একটু করো শুকনো ঢিলা বা মাটির টুকরো নিয়ে তার তায়াম্মুম সম্পন্ন করবে। দলের কয়েকজন যদি তায়াম্মুম করে

নেয় কিন্তু এদের মধ্যে একজন পানি দেখতে পায় তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সকলের তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। যদি কোন দলের একজন কিছু পানি এনে শুধুমাত্র কোন এক ব্যক্তিকে বলে ওযু করে নিতে তবে সকলের তায়াম্মুম ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি এরুপ বলে দলের সকলে এখান থেকে ওযু করতে পারবে যদিও সেখানে মাত্র একজনের ওযুর পানি থাকে তথাপি সকলের তায়াম্মুম সহিহ থাকবে। যদি জুনুব হয়ে থাকে এবং সে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও পানির সন্ধান না পায়। তখন প্রথমে সে তার ফরয গোসলের জন্য একবার তায়াম্মুম করে নিবে। এরপর পানির জন্য মসজিদে প্রবেশ করবে। সে যদি মসজিদে পানির সন্ধান না পায় তখন নামায আদায়ের জন্য তাকে আরেকবার তায়াম্মুম করতে হবে। কারও যদি মসজিদে অবস্থান কালে ইহতিলাম হয় তবে সে তায়াম্মুম করবে এবং মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবে। কারও যদি হাত না থাকে তবে সে তায়াম্মুম করে নিতে পারবে। তবে এরুপ ব্যক্তিকে সাহায্য করার মত কেউ থাকলে সে ইস্তিঞ্জা থেকে মুক্ত নয় তাকে প্রয়োজনের সময় ইস্তিঞ্জা করতে হবে। তবে যদি তাকে সাহায্য করার মত কেউ না থাকে তবে সে ইস্তিঞ্জা থেকে অব্যাহতি পাবে। কোন ব্যক্তির যদি হাত এবং পা উভয়ই না থাকে তবে তারাফাইন এর মত অনুসারে তাকে নামায হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে ইমাম আজম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু আইয়ুব এর মতে এ অবস্থায়ও উক্ত ব্যক্তিকে নামায আদায় করতে হবে। অপর পক্ষে জুমার নামাযে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েজ নেই। অন্য কথায় ওযুর জন্য সময় নেই কিংবা ওযু করতে গেলে জুমা ছুটে যাবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। এক্ষেত্রে কেউ জুমার নামায আদায়ে সক্ষম না হলে জহরের সালাত আদায় করে নিবে। তাছাড়া **দররুল মুখতার** গ্রন্থে উল্লেখ আছে খেজুরের রস কিংবা এরুপ কোন বস্তু দিয়েও ওযু করা জায়েজ নয়। কোন ব্যক্তির যদি সফরে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দোষ হয় তবে সে তায়াম্মুম করেই ফজরের সালাত আদায় করে নিবে। এরপর সে তার যাত্রা দুপুরের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে।

[১] জুনুব অর্থ যার কোন কারণে অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক বা স্বপ্ন দোষের কারণে গোসল প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত গোসল অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে।

[২] ইস্তিঞ্জা বলতে মল বা মুত্র ত্যাগের পরে শরীরের সামনের বা পেছনের অংশ পরিষ্কার করা। অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

যখন যহরের সালাত এর ওয়াক্ত শেষ হতে অল্প কিছু সময় বাকি থাকবে তখন সে তায়াম্মুম করে যহরের সালাত আদায় করে নিবে। ধরা যাক ওই ব্যক্তি যদি দিবসের শেষ ভাগে এসে অর্থাৎ আসরের সালাতের সময় এসে পানির সন্ধান পায় তবে কি তার পুনরায় ফজর এবং যহরের সালাত আদায় করতে হবে কিনা? এই ব্যাপারে ইসলামিক স্কলারগণের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। এক পক্ষের মত অনুযায়ী তাকে আদায় করে নিতে হবে অপর পক্ষের আলেমদের মতে আদায় করা লাগবে না। এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত সাহেব এ তারতিব অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কোন ব্যক্তির যদি বহনকারী গাধার পিঠে তার প্রয়োজনীয় পানি থাকে এবং সে গাধাটি হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় নামাযের সময় হলে সে তায়াম্মুম পূর্বক নামায আদায় করে নিবে। তবে নামাযরত অবস্থায় সে গাধার ডাকের আওয়ায শুনতে পাওয়ার সাথে সাথে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়ায় ভ্রমন করে এবং ঘোড়া হতে নেমে ওযু করে নামায আদায় করতে গেলে তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সে ঘোড়ায় আরোহনরত অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিবে। কেউ যদি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে ভ্রমন করে থাকে যে এই অবস্থায় ফরয গোসল করতে গেলে তার অসুস্থহ ওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিবে। ভ্রমনে যাওয়ার সময় যাত্রার অন্যান্য সরাঞ্জামাদির সহিত এক টুকরো ইট বা ঢিলা নেওয়া উচিত। যাতে করে সে যদি এমন স্থানে পৌছায় যেখানে চারপাশের সব কিছুই ভেজা তখন ওই ঢিলা বা ইটের টুকরা দিয়ে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। যদি ঈদের নামাযের সময় ওযু ভেঙ্গে যায় এবং পুনরায় ওযু করে নামাযে অংশ নিতে গিয়ে যদি তার নামায ধরতে দেরি হয়ে যাওয়া বা ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সে ওই অবস্থায়ই তায়াম্মুম করে নামাযে যোগ দিবে। (১) এটা ইমাম আযমের মত। তাছাড়া অন্যান্য ইমামগণের কওলের মতে সম্ভব হলে ওযু করে নিতে হবে।

এটি (আহমেদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল) দ্বারা বর্ণিত, এবং তাহতাবীর টীকায় (আবুল ইখলাস হাসান বিন আম্মার) শেরবালির **মেরাকএলফেলা**, গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, অসুস্থতা তায়াম্মুমের জন্য একটি ওজর। তবে সুস্থ ব্যক্তি যদি এই ভয়ে ওযু করতে না চায় যে ওযুর ফলে তার অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এটি তার জন্য ওজর নয়। যে সকল আলেমগণের মতে, সুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে অসুস্থ হওয়ার ভয় থাকে তার জন্য রোযা কাযা করা জায়েয, তাদের মতে সুস্থ ব্যক্তির অসুস্থ হওয়ার ভয় থাকলে প্রয়োজনে তায়াম্মুম করাও জায়েয। অসুস্থ

হওয়া বলতে সাধারানত ৪টি বিষয় বোঝায়, পানি হয়ত তার জন্য ক্ষতিকর হবে। নড়াচড়া হয়ত তার জন্য ক্ষতিকর হবে। কেউ হয়ত পানি ব্যবহারে অক্ষম হতে পারে। কেউ কেউ হয়তবা তায়াম্মুম করতেও অক্ষম হতে পারে।

[১] ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানি ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ এর দুইজন মহৎ ছাত্র।

ক্ষতি বিবেচনার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় রয়েছে। ব্যক্তি যদি প্রচণ্ড অনুভব করতে পারে যে পানি ব্যবহার তার জন্য ক্ষতিকর তবে অথবা কোন মুসলমান আদিল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যদি তাকে সতর্ক করে থাকে। যদি আদিল মুসলমান ডাক্তার না পাওয়া যায় তবে এরুপ ডাক্তার যার পাপসমুহ জনসম্মুখে প্রকাশিত নয় তার দেওয়া পরামর্শও গ্রহণ যোগ্য। যে ব্যক্তি নিজে নিজে ওযু সম্পন্ন করতে অক্ষম সে যদি তাকে সাহায্য করার মত কোন ব্যক্তিকে না পায় তবে তার জন্যও তায়াম্মুম করে নেওয়া জায়েয। তার যদি সন্তান, দাসী কিংবা অন্য কোন বাক্তি থাকে যে বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে ওযু করতে সাহায্য করবে তবে এদের যে কারো দ্বারা তাকে ওযু করে নিতে হবে। এরুপ কোন ব্যক্তি না পাওয়া গেলে সে তায়াম্মুম করে নিবে। ইমাম আযম আবু হানিফার মতে তাকে ওযু করতে সাহায্য করার জন্য অর্থের বিনিময়ে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি যদি তায়াম্মুম করতেও না পারে তবে সে তার নামায ক্বাযা হিসাবে ছেড়ে দিবে। এমন কি স্বামী স্ত্রীরও ওযু করার জন্য নামায আদায়ের জন্য একে অপরকে সাহায্য করার আবশ্যকতা নেই । তবে স্বামীর উচিৎ স্ত্রীকে সাহায্য করতে বলা। কোন ব্যক্তি গ্রাম এবং শহরের বাইরে থাকায় গরম পানি না পেলে এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করায় অসুস্থ হওয়ার ভয় থাকলে সে তায়াম্মুম করে নিবে। শহর এলাকার ক্ষেত্রেও একই ফতোয়া প্রযোজ্য।

কোন বাক্তির গোসল বা ওযুর অঙ্গের অর্ধেকের বেশি অংশে ক্ষত বা যন্ত্রণা থাকে তবে সে গোসল বা ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নিবে। তার ক্ষতের পরিমান যদি ওযু বা গোসলের অঙ্গের অর্ধেক হয়ে থাকে তবে সে তার সুস্থ অংশসমুহ পানি দ্বারা ধৌত করবে এবং ক্ষতের উপরে মাসেহ করে নিবে। মাসেহ তার জন্য ক্ষতিকর হলে ব্যান্ডেজের উপর দিয়ে মাসেহ করে নিবে। যদি এটিও তার জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তাকে মাসেহ করতে হবে না। তার মাথায় যদি কোন ক্ষত থাকে যা মাসেহ করার ফলে ক্ষতির আশংকা থাকে তবে এক্ষেত্রে সে মাসেহ করা থেকে মুক্ত। কোন ব্যক্তির যদি এরুপ অংশে ক্ষত থাকে যা ওযুর সময় ধৌত করা

ফরয যেমন হাত বা মুখ মণ্ডল, তবে সে তায়াম্মুমও করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে সে ওযু ছাড়াই নামায আদায় করে নিবে এবং তাকে ওই নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না। তার মুখমণ্ডল সুস্থ থাকলে সে তা ধৌত করবে। তাকে সাহায্য করার মত কেউ না থাকলে সে মাটিতে বা বালিতে তার মুখমণ্ডল ঘষে নিবে। কার এক হাত যদি ভাঙ্গা, ক্ষত, কাটা কিংবা অবশ থাকে তবে সে অন্য হাত দিয়ে ওযু সম্পন্ন করবে। তার উভয় হাতই একই রকম হলে সে মাটির সাথে মুখ মণ্ডল মর্দন করে নিবে। যদি তার হাত বা কোন অঙ্গে প্লাস্টার, অয়েন্তমেন্ট ব্যান্ডেজ বা এরুপ কোন প্রলেপ থাকে যা খুলে ফেলে মাসেহ বা ধৌত করা সম্ভব নয় তবে সে তার উন্মুক্ত উল্লেখযোগ্য অঙ্গসমুহ এবং এর মাঝের অংশগুলো মাসেহ করে নিবে। তবে সম্ভব হলে প্লাস্টার, ব্যান্ডেজ, কাঠের প্রলেপ দেওয়া আক্রান্ত স্থান হতে এগুলো খুলে ফেলে আক্রান্ত স্থানে মাসেহ এবং সুস্থ স্থানসমূহ ধুয়ে নিতে হবে। এই বিষয়গুলি ওযু অবস্থায় করা আবশ্যকীয় নয় এবং এর কোন নির্দিষ্ট সময় রেখা নেই। সুস্থ পা ধুয়ে ফেলা এবং অপর আক্রান্ত পা মাসেহ করে নেওয়াও জায়েয। আক্রান্ত স্থানে যে প্রলেপ বা অন্যান্য আস্তরন রয়েছে তা যদি ক্ষত সুস্থ হওয়ার পূর্বে খসে পড়ে তবে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে না। তাছাড়া একবার যে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা হয়েছে তা পরিবর্তন করলেও ওযু ভাঙ্গবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তির যদি নখ কিংবা অন্য কোন আক্রান্ত স্থানে ব্যান্ডেজ, অয়েন্তমেন্ট বা প্রলেপ থাকে যা অপসারন করে উক্ত স্থান ধৌত করা বা মাসেহ করা তার জন্য ক্ষতিকর তবে সে উক্ত স্থান ব্যান্ডেজ বা প্রলেপের উপরই মাসাহ করে নিবে। মাসেহ করাও ক্ষতিকর হলে মাসেহ ব্যতীতই তার ওযু বা তায়াম্মুম হয়ে যাবে। যেহেতু অন্যান্য তিন মাযহাবেও একই মত রয়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবে তাকলিদ করা নিষ্প্রয়োজন। ইবনে আবেদীন নামক কিতাবে উক্ত অয়েন্তমেন্টকে চটাবা এরুপ বন্ধন ফলক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কারো দাঁতের ফিলিং বা বাধাই অন্য বিষয়।

কোন ব্যক্তি যদি নিজের দ্বারা না ঘটিয়ে অন্য কোন কারণে অবচেতন বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত নামাজের সময় অবধি থাকে তবে তাকে জ্ঞান ফেরার পর ওই ছয় ওয়াক্তের নামায কাযা করতে হবে না।সে অচেতন অবস্থায় যে কয় ওয়াক্ত নামাযই হোক না কেন এগুলো আদায়ের জন্য অন্য কাউকে ওসিয়তের প্রয়োজন নেই। সে সুস্থ হয়ে নামাযের কাযা আদায় করে দেবে। (অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের একুশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইবনে

আবেদীন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, সুস্থ কোন ব্যক্তির জন্য তার ওযু বা তায়াম্মুমের সময় অপরিহার্য অঙ্গসমুহ অন্য কাউকে দিয়ে ধোয়ানো মাকরুহ। তবে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি যদি ওযুর পানি এগিয়ে দেয় কিংবা অঙ্গসমুহে পানি ঢেলে দেয় তবে তার অনুমতি রয়েছে। যদি তার নামাজের বিছানা কিংবা কাপড়ে কোন নাজাছাত বা ময়লা লেগে থাকে যা পরিবর্তন করা তার জন্য ঝামেলা বা তৎক্ষণাৎ সম্ভব নয় তবে সে ওই অবস্থায় নাজাছাত যুক্ত অবস্থায়ই নামায আদায় করে নেবে। তাছাড়া আহত স্থানে ব্যাবহৃত সমান কাঠের টুকরো, প্লাস্টার কিংবা অয়েন্তমেন্ট যদি খসে পড়ে এবং ক্ষত স্থান সুস্থ হয়ে যায় তবে পূর্বেকৃত তায়াম্মুম বা মাসেহযুক্ত ওযু ভেঙ্গে যাবে। তার আক্রান্ত স্থান যদি সুস্থ হয়ে থাকে কিন্তু উপরের ব্যান্ডেজের প্রলেপ যদি আলাদা না হয় এমতাবস্থায় যদি তাকে কোন ক্ষতি ছাড়া খুলে ফেলা যায় তবে তার পূর্বেকৃত ওযু বা তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের অসুখ এবং যন্ত্রণা এজন্য দিয়েছেন যাতে করে তাদের গুনাহ মাফ হয় এবং জান্নাতে তাদের নিয়ামত আরও বেড়ে যায়। তাদের প্রার্থনা যন্ত্রণাময় এবং কষ্টকর। এর বিনিময়ে তিনি তাদের জীবনকে আরও সহজ করে দেন, দুনিয়াবি কাজ কর্মে সফলতা প্রদান করেন এবং রিযিকে বরকত দেন। (খাদ্য, পানীয়, অন্যান্য প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তায়ালা তার সকল বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে রিযকের বিষয়ে আরও বিস্তারিত রয়েছে) যারা তার ইবাদতকে অবহেলা করে তিনি তাদের সমপরিমান বরকত এবং সহজ সাধ্য তা দেন না। এ ধরনের মানুষ পরিশ্রম কপটতা ধোঁকা এবং বিশ্বাস ঘাতকতার মাধমে অনেক অর্থ উপার্জন করে এবং সুখী ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন অতিবাহিত করে যা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। অল্প সময়ের ভিতরেই তারা হসপিটাল এবং কারাগারে কিংবা অনুতাপের অন্তর দহনের মাধ্যমে তাদের বাকি জীবন পার করে। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে অপরিসীম আজাব।

ইস্তিঞ্জা, ইস্তিবরা এবং ইস্তিনকা

ইস্তিঞ্জা মানে যৌনাঙ্গ পানি দিয়ে ধৌত করা, ইস্তিবরা অর্থ প্রস্রাবের পর ততক্ষণ অপেক্ষা, হাটাহাটি বা অন্য কিছু করা যতক্ষণ মূত্রনালি আর ভেজা না থাকে। আর ইস্তিনকা বলতে বোঝায় শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে অন্তরে পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হওয়া।

চার ধরনের ইস্তিঞ্জা রয়েছেঃ

<u>ফরযঃ</u> কাপড়, শরীর কিংবা নামাযের স্থানে যদি এক দিরহাম থেকে অধিক নাজাছাত লেগে থাকে তবে তা পানি দিয়ে পরিস্কার করা ফরয। গোসলের সময়ও ইস্তিঞ্জা ফরয। (এখানে এক দিরহাম বলতে চার গ্রাম আশি সেন্টি গ্রাম)

<u>ওয়াজিবঃ</u> যদি কাপড়, শরীর কিংবা নামাজের স্থানে এক দিরহাম এর সমপরিমাণ নাজাছাত লেগে থাকে তবে তা পানি দিয়ে পরিস্কার করা ওয়াজিব।

<u>সুন্নাতঃ</u> এটি যদি এক দিরহাম অপেক্ষা কম হয় তবে তা ধুয়ে ফেলা সুন্নাত।

<u>মুস্তাহাবঃ</u> যদি খুব সামান্য পরিমান নাজাছাত লেগে থাকে তবে তা পরিস্কার করে ফেলা মুস্তাহাব। তাছাড়া বায়ু ত্যাগের ফলে পায়ু পথ ভিজে গেলে পানি দিয়ে ওই স্থান ধুয়ে ফেলা মানদুব।

ইস্তিঞ্জার সুন্নাত হল এক টুকরা ঢিলা বা পাথরের টুকরা দিয়ে প্রথমে ময়লা পরিস্কার করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। নাজাসাত যদি পুরোপুরি দুর করা না যায়, এক দিরহাম পরিমান অপেক্ষা বেশি স্থান জুড়ে যদি পায়ু পথে নাজাসাত লেগে থাকে তবে তা ধুয়ে ফেলা ফরয। তারপর ওই অংশটা পরিস্কার কাপড় অথবা হাত দিয়ে শুকনো করতে হবে। ইস্তিঞ্জা তৈরির সময় একটি মুস্তাহাব কাজ করতে হয়, তাহলো বেজোড় সংখ্যক ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করা। অন্যভাবে বলা যায় ইস্তিঞ্জায় ৩টি, ৫টি বা ৭টি ঢিলা ব্যবহার করা। (মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষম একজন ব্যক্তি একটি ১২X১২ সেমি হবে. বর্গ ক্ষেত্র কাপড়ের টুকরা নিবে এবং এর সম্মুখের স্ট্রিংয়ের দেড় মিটার লম্বা টুকরা গিট দিয়ে নিবে। এটার এক কোণে শিশ্নবিন্দু কাপড়ে আবৃত করা হয় এবং স্ট্রিং কাপড় অর্থাৎ প্রান্ত কাছাকাছি আনা হয়। শিশ্নের সামনের অংশের সাথে একটি পেচ দিয়ে এটিকে আটকানো হয়। একটি নিরাপত্তা পিন সঙ্গে আন্ডার প্যান্ট সংযুক্ত থাকে। মূত্রত্যাগ এর প্রয়োজন সেফটিপিন খোলা হয়, লুপ বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং কাপড় কেবল স্ট্রিং এর টান দ্বারা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যায়।এটি যদি কঠিন হয়ত বেস্ট্রিং এর

লুপসেফটিপিন দিয়ে বন্ধ না করে পেপার ক্লিপ দিয়ে সংযুক্ত করতে। শিশ্নের সামনে এখন আরও প্রায় এক টুকরো কাপড় মোড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে। একটি ছোট নাইলন তাদের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ব্যাগ এবং ব্যাগ মুখ বেঁধে নিবে। এটি বর্ণিত রয়েছে, "কিতাবুল ফিকাহ আলা মাযহাবিল আরবা„ এবং যা রচিত হয়েছে মিশরীয় স্কলারদের মাধ্যমে এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আব্দুর রাহমান জাজিরি রহমাতুল্লাহ এর তত্তাবধানে। হানাফী মাযহাবের একজন ব্যক্তি যারা অনৈচ্ছিক মূত্র ত্যাগ রোগে ভুগছেন তার গোসল ওযু এবং নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মালেকি মাযহাব অনুকরণের কোন ওজর নেই।

কিতাবুল ফিকাহ আলা মাযহাবিল আরবা নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, মালেকি মাজহাবের দ্বিতীয় কাওল অনুযায়ী এরুপ কোন বয়স্ক বা অপারগ ব্যক্তি যার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে সর্বাস্থায় ওযু ভেঙ্গে যায় এরুপ বাক্তি ওযু ভাঙ্গা হতে ফারেগ হিসাবে গণ্য। হানাফি এবং শাফেয়ি মুসলিমরা এক্ষেত্রে হারায থাকা অর্থাৎ কঠিন কোন অবস্থার সৃষ্টি হওয়াকে প্রধান্য দেন। হানফি মাযহাবের অনুসারিরা এরুপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন নামাযের ভিতরে মূত্র নিয়ন্ত্রণে থাকে না এরুপ ক্ষেত্রে পরিস্থিতিতে মালেকি মাযহাবের উক্ত কওলকে অনুকরণ করেন। শুধুমাত্র নিয়তের মাধ্যমে এরুপ ব্যক্তি ওজর থাকা অবস্থায় নামায চালিয়ে যেতে পারবে।)

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ

নামাযে চারটি গুরুত্বপুর্ণ আহকাম রয়েছে। যথাঃ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী দুই হাত কান বরাবর উঠানো সুন্নাত। হাতের তালু কিবলাহমুখী রাখা সুন্নত। পুরুষদের তাকবিরে দুহাতে কানের লতি স্পর্শ করা এবং মেয়েদের কাধ বরাবর উচ্চতায় হাত তোলা মুস্তাহাব। এবং আল্লাহু আকবর বলা। আল্লাহু আকবর বলার পর দুই হাত নামিয়ে নেওয়া সুন্নত। এরপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতে হবে। পুরুষদের জন্য নাভির নিচে এবং মেয়েদের জন্য বক্ষের উপরে হাত বাধা সুন্নত। পুরুষদের জন্য ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা মুস্তাহাব। নামাযে ইমাম, মুসল্লি কিংবা কেউ যদি একাকি নামায আদায় করে সকলের জন্য "সুবহানাকা„ (১) পাঠ সুন্নাত। এরপরে ইমামের জন্য কিংবা কেউ যদি একাকী নামায আদায় করে তার জন্য আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্ পাঠ সুন্নাত। এরপর ফাতিহা শরিফ তিলাওয়াত এবং এর সাথে

কুরআনের ন্যূনতম ৩ আয়াত পরিমান তিলাওয়াত ওয়াজিব। সুন্নাত নামাযসমূহে বিতর সালাতের প্রতি রাকাত এবং একাকি আদায়ের সময় ফরয নামাযসমূহের প্রথম দুই রাকাতে কুরআনে কারিম থেকে কম পক্ষে এক আয়াত পরিমান তিলাওয়াত ফরয।

১ (সুবহানাকা এভাবে বলা হয় যে, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গাইরুকা।

রুকুতে মাথা এবং শরিরের উপরের অংশ ঝোকানো ফরয। তিনবার **সুবহানাল্লাহ** বলার সমপরিমাণ সময় রুকুতে অবস্থান ওয়াজিব। তিনবার **সুবহানা রাব্বিয়াল আলা** পাঠ সুন্নাত। পাঁচবার বা সাতবার পাঠ মুস্তাহাব। রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর এবং দুই সিজদার মাঝে বিরতিতে কমপক্ষে একবার **সুবহানাল্লাহ** পাঠ করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করা ইমাম আবু ইউসুফ এর মতে ফরয। তাছাড়া তারাফাইন অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা এবং তার সাগরেদগণের মতে এটি ওয়াজিব। তবে কিছু আলেমগণের মতে এটি সুন্নাত। সেজদায় কপাল জমিনে ঠেকানো ফরয। একবার **সুবহানাল্লাহ** বলা পরিমান সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। তিনবার **সুবহানা রাব্বিয়াল আলা** বলা সুন্নাত এবং পাঁচ কিংবা সাত বার বলা মুস্তাহাব। ইবনে আইদীন রাহমাহুল্লাহ তায়ালার বর্ণনা মতে, সেজদার সময় প্রথমে হাঁটু তারপর দুই হাত, এরপর নাক এবং সবশেষে কপাল মাটিতে রাখতে হবে। হাতের আঙ্গুল এবং কান একই লাইন বরাবর থাকবে। শাফি মাযহাব অনুযায়ী দুই হাত কাধ বরাবর থাকবে। কমপক্ষে একটি পায়ের পাতা মাটিতে স্পর্শ করে রাখা ফরয। জমিন এতোটা শক্ত হতে হবে যাতে কপাল জমিনের ভেতরে দেবে না যায়। কার্পেট বা ম্যাট বিছিয়ে কিংবা গম বা শস্য জমিনে ছড়িয়েও এটি প্রস্তুত করা যায়। জমিনে স্থাপিত টেবিল, সোফা বা অন্য কোন পরিবহনও জমিন হিসাবে সাব্যস্ত। দোলনা, কাপড় বা ম্যাট গাছের সাথে ঝুলিয়ে দলনার মত করে বাধলে এগুলো জমিন হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ধান, ভুট্টো শন বীজ ইত্যাদি পিচ্ছিল জিনিষের উপরে সেজদাহ সহি হবে না। এগুলো যদি বস্তায় থাকে তাহলে তার উপরে সহিহ হবে। যদি সেজদার জায়গা অর্ধেক জারা পরিমান হয় অর্থাৎ পায়ের পাতা রাখার স্থান থেকে বারোটি আঙ্গুলের মিলিত প্রস্থের সমান হলে নামায সহিহ হবে। তবে এরুপ করা মাকরূহ। সেজদার সময় দুই কনুই দেহ হতে দূরে থাকবে এবং উদর সমন্ধিয় অঞ্চল উরুকে স্পর্শ করবেনা আলাদা

থাকবে । পায়ের পাতা কিবলার দিকে মুখ করে থাকবে। রুকু এবং সেজদার সময় পায়ের গোড়ালি একে অপরকে স্পর্শ করে রাখা সুন্নাত।

নারীরা নামাযের শুরুতে তাদের কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে।...... তারা বুকের উপরে দুই হাত বাধঁবে। বাম হাতের উপরে ডান হাত থাকবে। রুকুতে যাওয়ার সময় সামান্য ঝুকবে। রুকুতে তার কোমর এবং মাথা একই সমতলে থাকবে না। রুকু এবং দুই সেজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে থাকবে না। আঙ্গুলগুলি একটি অপরটির সাথে যুক্ত থাকবে। সে তার হাত হাটুর উপরে রাখবে এবং হাত বেকে থাকবে। সে হাটুর উপর ভর দেবে না । সেজদার সময় দুই হাত মাটিতে ছড়িয়ে দিবে এবং কনুই উদরের সাথে লেগে থাকবে। তার উদর এবং উরু স্পর্শ করে থাকবে। তাশহুদে বসার সময় নারীরা তাদের পা ডান দিকে ছড়িয়ে রাখবে। নখগুলো হাঁটুর দিকে ফেরানো থাকবে। আংগুল পরস্পরের সাথে লেগে থাকবে। মেয়েদের জন্য নিজেদের মধ্যে এমনকি পুরুষদের সাথে জামাতে অংশ নেওয়া মাকরুহ। তাদের জন্য ঈদের নামায এবং জুময়ার নামায আদায় ফরয নয়। অন্য কথায় আল্লাহ্ তাদের উপর এই দুই নামায আদায়ের আদেশ দেননি। (এর বিস্তারিত **অফুরন্ত নিয়ামত** কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের একুশ এবং বাইশ নামক অধ্যায়ে বর্নিত রয়েছে) তারা কুরবান ঈদের সময়ের ফরয নামাযের শেষের **তাকবীরে তাশরিফ** আস্তে বলবে। ফজরের নামায শুরুর ওয়াক্তে আদায় করা তাদের জন্য মুস্তাহাব নয়। তারা নামাযের সময়ের পাঠ করা দুয়াসমুহ উচ্চস্বরে পাঠ করবে না। এখানেই ইবনে আবেদীন অনুবাদের ইতি। সাইয়্যিদ আহমাদ হামাওয়া বিন মুহাম্মাদ মক্কী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি (১০৯৮, ১৬৮৬খ্রি) তার **উয়ুন উলবেসাইর** কিতাবে যাযেয় আল আবেদীন বিন ইব্রাহিম ইবনি নুজাইম ইমিসরি রহমাতুল্লাহ [৯২৬-৯৭০ হিজরি, ১৫৬২ খ্রিস্তব্দ, মিশর] এর লিখিত **এশবাহ** কিতাবের একটি বর্ণনা, এখানে তিনি বলেছেন, মেয়েদের শেভ করা কাটা বা কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করে চুল কাটা বা ফেলে দেওয়া মাকরুহ। তবে তাদের চুল কান বরাবর ছোট করা জায়েজ যাতে তাদের ছেলেদের সাদৃশ্য না দেখা যায়। মেয়েদের জন্য আযান এবং ইকামত দেওয়া মাকরুহ। সে বাহিরে লম্বা কোন সফরে তার স্বামী বা মাহরামকে ছাড়া একাকি সফর করতে পারবে না।

[১] সে হজের সময় তার মাথা উন্মুক্ত করবে না। সে সাফা এবং মারওয়া এর মাঝে সায়ি করবে যদিও তার মাসিক থাকে। সে কাবা থেকে নির্দিষ্ট পরিমান দূরত্ব থেকে তাওয়াফ করবে। মহিলারা খুতবা দিতে পারবে না। কারণ এটি সহিহ যে

তার কণ্ঠও আওরাত। একজন মহিলা অবশ্যই জানাজা বহন করবে না। সে মুরতাদ হলেও তাকে হত্যা করা হবে না। হদ্দ এবং কিসাসের ক্ষেত্রে সে কোন সাক্ষী হিসাবে গণ্য হবে না। সে অবশ্যই মসজিদে ইতিকাফ করতে পারবে না।

[২] তার জন্য মেহেদি হাত এবং পায়ের পাতা রাঙ্গানো জায়েয। সে অবশ্যই নেইল পালিশ ব্যবহার করবে না। সে সম্পত্তি, সাক্ষী এবং নাফাকা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক হিসাবে গণ্য হবে।

[৩] একজন মুহসিনা নারী কখনো কোর্টে যায় না, জজ কিংবা ডেপুটি তার বাড়িতে যায়। একজন মুহসিনা নারী হল সে যে বিবাহিত। অনুগ্রহ করে দশম অধ্যায়ের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তাছাড়া একই অধ্যায়ের কাজাফ এর জন্য হাদ্দ নামে উল্লেখিত অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য। একজন যুবতী মেয়ে কোন নামাহরামকে অভিবাদন দেয় না কিংবা তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন না। হাচি দিলে উচ্চস্বরে আলহামদুলিল্লাহ বলে কোন নামাহরামকে আকৃষ্ট করেন না। সে নামাহরামের সাথে কোন একাকি কক্ষে অবস্থান করেন না। এখানে আমাদের হামাওয়াই এর অনুবাদের পরিসমাপ্তি টানছি। কাদায়ে উলা এবং কাদায়ে আখিরাতে অর্থাৎ নামাযে প্রথম এবং শেষ আসরে বসা ওয়াজিব।

[১] অনুগ্রহ করে , দুরের পথের যাত্রার জন্য অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের, চতুর্থ খণ্ডের পনের নম্বর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[২] অনুগ্রহকরে,ইতিকাফ এর জন্য চতুর্থ খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদের শেষ অংশ

[৩] শেষ বৈঠকের জন্য অফুরন্ত নিয়ামত নামক কিতাবের, ষষ্ঠ খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শেষ বৈঠকে তাহিয়্যাত পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয নামাযের শেষ বৈঠকে সালাওয়াত পাঠ করা সুন্নাত, ওয়াজিব নামাযে এবং যহরের নামাযের প্রথম সুন্নাতে, জুময়ার সালাতের প্রথম এবং শেষ সুন্নাতে। অন্যান্য নামাযের উভয় বসার বৈঠকে। (যেমন চার রাকাত সুন্নাত, আসরের নামায কিংবা রাতের নামায)। সালাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব, (আসসালামু আলাইকুম যখন দুই দিকে মাথা ঘুরিয়ে সালাম দেওয়া হয়)। সালামের সময় উভয় ঘাড়ের দিকে তাকানো সুন্নাত। এবং মনযোগের সাথে তাকানো মুস্তাহাব। নামাযের কবুল হওয়া এবং পরিপূর্ণ হওয়া নির্ভর করে খুশু, তাকওয়া, মালায়ানি বন্ধ, তেরক একেসেল এবং ইবদাত। খুশু অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার ভয়, তাকওয়া অর্থ নয়টি অঙ্গ হারাম এবং মাকরুহ থেকে দূরে রাখা, মালায়ান এড়িয়ে চলা মানে এমন কথা না বলা যা

দুনিয়া কিংবা আখিরাতের কোন উপকারে আসবেনা।তেরক একেসেল অর্থ নামাজের ভেতর অন্য চিন্তা বা অন্যকিছু পর্যবেক্ষণ পরিত্যাগ করা। ইবাদত অর্থ সবকাজ বন্ধ করে আযান-ই মুহাম্মাদী শোনার সাথে সাথে জামাতের দিকে মনোনিবেশ করা। নামাযে লক্ষ করার মত ছয়টি বিষয় রয়েছে, ইখলাস, তাফাক্কুর, খাওফ, রেযা, রুইয়াত এ তাকসির এবং মুজাহাদা। ইখলাস অর্থ খুলুস থাকতে হবে। যার অর্থ শুধু আল্লাহর জন্য নামায আদায় করতে হবে। তাফাক্কুর অর্থ নামাজের মাঝে বিষয়ে চিন্তা করা। খাওফ অর্থ আল্লাহ্ আজিমুসশানের ভয় করা। রেযা অর্থ আল্লাহ সুবহানা তায়ালার দয়ার ব্যপারে আশাবাদী হওয়া। রুইয়্যাত এ তাকছির অর্থ কারো অপরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে জানা । মুজাহাদা অর্থ নফস এবং শয়তানের সহিত বিরোধ। যখন আযান এ মুহাম্মদী দেওয়া হয় তখন ইস্রাফিলের শিঙ্গার ফুকের কথা স্মরণ হওয়া উচিত। যখন ওযু এবং নামাযের জন্য ওঠা হয় তখন কবর হতে ওঠার কথা মনে পড়ে। যখন তুমি মসজিদে যাবে তখন স্মরণ করবে যেন মহাহাশরে যাচ্ছো। মুয়াজ্জিন যখন ইকামাত দেয় এবং সবাই লাইনে দাঁড়ায়, তুমি মনে কর যেন মহাহাশরে একশত বিশটি লাইন দাড়িয়ে আছে এবং যার মধ্যে আশিটি উম্মাতে মুহাম্মদীর। তুমি ঈমাম এর সাথে নিজেকে মানিয়ে নাও এবং ঈমাম যখন ফাতিহায়ে শরীফ তিলাওয়াত শুরু করে তুমি কল্পনা কর যেন তোমার ডান পার্শে জান্নাত এবং বাম পার্শে জাহান্নাম, আজ্রাইল আলাইহিস সালাম পেছনে নিকটে দাঁড়ানো, বায়তুল্লাহ তোমার বিপরীতে, কবর সামনে এবং পুলসিরাত পায়ের নিচে। তুমি অবশ্যই চিন্তিত থাকবে তোমার সওয়াল জওয়াব সহজ হবে নাকি কঠিন হবে, তোমার ইবাদত তোমার জন্য মাথার তাজ হবে? তোমার কবরে আলো হবে নাকি এটি পুরান বস্তুর ন্যায় তোমার দাঁতের নিচে পিষ্ট হবে।তোমাদের সকল সঞ্চয় কত সামান্য। জৌলুসের নামে উপার্জিত তোমার সবকিছু মৃত্যু নামক ঝড় নিঃশেষ করে দেবে।

আযান-**ই মুহাম্মাদিঃ**

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো **দুররুল মুখতার** এবং এর বর্ণনাকারী **ইবনে আবেদীন** থেকে অনুবাদকৃত। একজন বিচক্ষণ মুসলিমের ইসলামি শিক্ষাচর্চা এবং ইসলামের উৎস থেকে নেওয়া কিছু নির্দিষ্ট বাক্য আবৃতই আজান-ই মুহাম্মদি। অন্য কথায় বাক্তিকে মিনারে আরোহণ করতে হবে এবং

আরবিতে এটি পাঠ করতে হবে। একই অর্থ হলেও অন্য ভাষায় আযান দেওয়া জায়েয নেই। আযান সাধারনত দৈনিক পাঁচবার সালাতের আহবানকেই বোঝায়। পুরুষের জন্য শহরের উচু কোন স্থানে আরোহন করে আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মেয়েদের আযান বা ইকামাত মাকরুহ । পুরুষদের (না- মাহরাম) মেয়েদের আওয়াজ শুনতে দেওয়া হারাম।

মুয়াজ্জিনকে উচু কোন স্থানে বা মিনারে দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে যাতে করে তার প্রতিবেশিরা শুনতে পারে। তবে খুব উচ্চস্বরে আযান দেওয়া জায়েয নেই। আযানে **আকবর** বলার সময় সে হয় জজমের নিয়ম অনুসারে একেবারে শেষে থাম্বে অথবা আরবি উচ্চারণ উস্তুন করবে। সে অয়েত্রা উচ্চারণ করবে না। এটি জায়েয নয় যে এমন কোন স্বরবর্ণ যোগ করে প্রলম্বিত করা যাতে করে আযানকে গান বা সঙ্গিতের মত শোনা যায়। **আযানে সালাহ এবং ফালাহ** বলার সময় ভক্তিসহকারে মাথা ডানে এবং বামে ঘুরানো সুন্নাত। পায়ের পাতা এবং বুক কিবলাহ হতে না ঘুরানো। অথবা যদি মিনার হতে আজান দেওয়া হয় তবে মুয়াজ্জিনের মিনারের গ্যলারির দিকে ঘুরা।

প্রথম মিনার তৈরি হয় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ তায়ালার সময়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় উচু জায়গা বানানো ছিল। বেলাল হাবসি রাদিয়াল্লাহ তায়ালা এর উপরে আরোহণ করতেন এবং আযান দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে আযানের সময় তার আঙ্গুল কানের উপরে রাখতে আদেশ করেন। আযানের মাঝে কথা বললে পুনরায় আযান দেওয়া জরুরি। একের অধিক ব্যক্তি একত্রে আযান দেওয়াও জায়েজ। তবে কারো আযানের কোন শব্দ বাদ গেলে আযান শুদ্ধ হবে না। বসে আযান দেওয়া মাকরুহে তাহরিমি।

এটি সুন্নাত যে মুয়াজ্জিন একজন সালিহ মুসলিম হবেন, আযানের সুন্নাতসমুহ সমন্ধে অবগত হবেন, আযানের সময় সমন্ধে জানবেন,

নিয়মিত আযান প্রদান করবেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযান দিবেন, অর্থ উপার্জনের জন্য নয়। নাবালেগ বাচ্চার জন্য আযান দেওয়া সহিহ নয়। এর শব্দ পাখির ডাক বা কোন বাদ্যযন্ত্রের মত হতে পারবে না। এ কারণে লাউড স্পিকার ব্যবহারে আযান বা ইকামাত সহিহ নয়। একজন ফাসিক ব্যক্তির জন্য আযান দেওয়া উচিত নয় এক্ষেত্রে যদিও ইমামের পেছনে নামায আদায় করা হয় তবে ঐ ব্যক্তির আযানের কারণে নামাযের ক্ষতি হবে। এরূপ ব্যক্তির আযান দেওয়া মাকরুহ। মুয়াজ্জিনের এটা জানা জরুরি যে কখন আযান দিলে মুসল্লিগণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নামাযে আসতে পারবে। একজন ব্যক্তি যদি নামাযের সময়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত থাকে অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা। এরূপ ক্ষেত্রে তার নামায সহিহ হবেনা যদিও সে পরবর্তীতে জানতে পারে যে তার নামায এর সময় ঠিক ছিল। **ফাসিক** এবং অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরিকৃত ক্যালেন্ডার দিয়ে নামায আদায় সহিহ নয়। দারুল হারবে ব্যবহৃত ক্যালেন্দারের সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে কেহ অবশ্যই কোন মুসলিমকে জিজ্ঞাস করবে যে বিশ্বাসে সালিহ এবং শিক্ষিত এবং তার কাছ থেকে সত্য জানা। যদি একত্রে অনেকগুলা সুন্নাত তরিকায় দেওয়ার আযান কানে আসে তবে শুধুমাত্র প্রথম শুনতে পাওয়া আযানের জবাব দিতে হবে। এটি যদি বসবাসের কাছাকাছি মসজিদ থেকে আসে তবে জামাতে শরিক হতে হবে।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত অবস্থায় থাকলেও আজানের জবাব দিতে হবে। তবে নামাযে থাকা অবস্থায়, বাথরুমে বা খাওয়ার সময় অথবা কোন ধর্মীয় শিক্ষার সময় জবাব দিতে হবেনা। আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বা কোন মিউজিক এর মত করে আজান দেওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ। আযান শোনার সাথে সাথে কাজ ফেলে বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা হাটা অবস্থায় থাকলে হাটা বন্ধ করে দেওয়া মুস্তাহাব। বর্নিত রয়েছে মুসলিম গভর্নরের জন্য প্রতি মহল্লায় একটি মসজিদ করে দেওয়া ওয়াজিব। মসজিদগুলো বায়তুল মালের অর্থের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। গভর্নর তৈরি করে না দিলে জনগনের নিজেদের উদ্যোগে মসজিদ

করা ওয়াজিব। যদি ইসলামের আনুগত্বের মাধ্যমে প্রতি মহল্লায় একটা করে মসজিদ থাকে এবং প্রতিটা মসজিদ থেকে আজান দেওয়া হয় তবে প্রত্যেকটা মুসলিম আযানের শব্দ শুনতে পারবে। তখন মুয়াজ্জিনের খুব জোরে আওয়াজ করে অথবা লাউড স্পিকার ব্যাবহার করে আযান দিতে হবে না। লাউড স্পিকার ব্যাবহার বিদাত এবং সুন্নাতের বরখেলাপ। এটি সুন্নাতের সৌন্দর্য হারানোর কারণ। এ কারণে তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক পরিচালকের নির্দেশে ধর্মশিক্ষা পর্যালোচনায় গঠিত কমিশনের **১-১২-১৯৫৪** সালের পনেরো নম্বর আর্টিকেলের ৭৩৭ নম্বর রেজুলেশনে উল্লেখিত রয়েছে- মিম্বারের উপরে লাউড স্পিকার ব্যাবহার নিষিদ্ধ। যদি জামাত এত বিশাল হয় যে ইমামের বা মুয়াজ্জিনের আওয়াজ সকলের কানে না পৌছায় তখন দুরের অন্য কেউ আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারে।„

আলফিকাহ আলাল মাযহাবিল আরবা নামক কিতাবের **সাজদায়ে তিলাওয়াত** নামক পরিচ্ছেদে এবং অপরিসিম নেয়ামত নামক কিতাবের **ষোল অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে** উল্লেখ রয়েছে, কুরআনে কারিম তিলাওয়াত, অথবা আযান কোন রেডিও বা টেপরেকর্ডারে অথবা লাউড স্পিকারে উচ্চস্বরে করার এই প্রক্রিয়া মানুষের প্রকৃত কণ্ঠ নয়। এটি একটি ইন্সট্রুমেন্টের শব্দ যা ম্যগ্নেটিক বা ইলেকট্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত। যদিও একে পারফর্মারের স্বর হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তার পরেও এটি প্রকৃত মানুষের স্বর নয়। **আযান এ মুহাম্মাদী** একজন সালিহ মুসলিমের প্রকৃত কণ্ঠ হতে হবে। কোন নলের বা পাইপের মধ্য দিয়ে আসা শব্দ আযান নয়। বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার হজরত হামিদি রহমাতুল্লাহ তার তাফসির গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের **২৩৬১** পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, পরিলক্ষিত হয় যে, কিরাতে শোনা এবং নিরবতার বিষয়ে যে আদেশ রয়েছে এক্ষেত্রে এটি পালাক্রমে একটি ঐচ্ছিক কার্যকলাপ যা ভাষাগত বা বাচ্য দ্বারা সঞ্চালিত হয় এবং স্পষ্ট উচ্চারণে নির্ধারিত স্থান নিরীক্ষক বাচ্য উদ্দেশ্য এবং ধিরে ধিরে পঠিত হয়। পারতপক্ষে কোরআন অবতরণের সময় জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাদের নবীজিকে দিয়ে কিরাত পড়িয়ে ছিলেন নিজে নিজে না পড়ে। অর্থাৎ নবীজির মাধ্যমে কিরাত সম্পন্ন করে ছিলেন। এ স্বর্গীয় কাজ অপর পক্ষে ছিল এক ধরনের তেনজিল বা অবতরণ এবং কিরাতের সৃষ্টি। সুতরাং কোন মস্তিস্কবিহীন কিছু হতে আগত শব্দকে কিরাত বলা যায় না এবং কোন শব্দের প্রতিফলনকেও কিরাত বলা যায় না। এই বিষয়ে তাই **ফিকহ** শাস্ত্রের আলেমগণ বলেন কিরাতের কোন রেকর্ড বা ইকোকে

কিরাত বলা উচিত নয় এবং এর জন্য তিলাওয়াতের সেজদাও প্রয়োজন নেই। আয়াতের সেজদা হল যা কোন মুসলিম কুরআনে আয়াতে সেজদার আয়াত শুনলে বা পড়লে যে সেজদা দিতে হয়। একইভাবে কোন বই পড়াকেও কিরাত বলা যাবে না এবং কোন ধরনের সাউন্ড ইকো বা মিউজিকাল কিছুর শব্দ বাজলে তাও কিরাত হিসাবে গণ্য নয়। সুতরাং কোন রেকর্ড প্লেয়ার রেডিও বা টেলিভিশন থেকে আসা কিরাতের শব্দ বা এর প্রতিফলন নিজে কিরাত নয় তাই এক্ষেত্রে শ্রবণকারী মুসলিমের উপর নিরবতা এবং শোনা এর এই বিধান কার্যকর নয়।

[১] পরবর্তী অংশ অফুরন্ত নিয়ামাত কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ষোল পরিছেদে দ্রষ্টব্য।

অন্যভাবে বলা যায়, কুরআনে কারিম তিলাওয়াতের সময় নিরবে শোনা ওয়াজিব হওয়ার যে বিধান আছে এটি কোন ব্যাক্তির কুরআন সামনা-সামনি তিলাওয়াত বা এরুপের জন্য কোন কিরাতের প্রতিফলন বা রেকর্ডিংয়ের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। তথাপি যেহেতু কিরাতের রেকর্ডিং বা প্রতিফলন শোনা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব নয় এর মানে এই নয় যে এটি শোনা যাবে না কোরআনে কারিমের আয়াতসমুহ প্লে করার এবং এটি শোনা দুইটি ভিন্ন কাজ। এটা অবশ্যই যে কোন মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে কুরআনে কারিমের আয়াত তিলাওয়াত বা বাজানো জায়েজ নেই। এরুপ করা গুনাহ। তাছাড়া এরুপ কিছু শোনাও অন্যায়। একইভাবে পাবলিক বাসে কুরআন তিলাওয়াত গর্হিত কাজ। এবং এরুপ শোনার মধ্যেও কোন সওয়াব নেই। তাছাড়া এরুপ কোথাও কোরআনের কিরাতের ইকো বা সাউন্ডরেকর্ড বা রেডিওতে প্রচারিত কুরআনের কিরাত শোনার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কুরআনের কিরাতের সাদৃশ কিছুও স্বয়ং কিরাত নয়। এগুলো কালামের নফসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যদিও এটা অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত মনযোগ দিয়ে শোনা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব নয় তথাপি এটি শুধুমাত্র অনুমতি প্রাপ্ত নয় এটি একটি আদেশ স্বরূপ যেভাবেই একে বিচার করা হোক না কেন। এটিও মুসলিমের একিনের একটি অংশ যে, সে কোথাও কোন কুরআনের আয়াত সংবলিত পৃষ্ঠা দেখলে তাকে অতিক্রম করে না গিয়ে পৃষ্ঠাটি যত্ন সহকারে তুলে কোন পবিত্র বা যথার্থ স্থানে রেখে দিবে। ফিকাহের অনেক বইয়ে যেমন **কাযীখাঁতে** উল্লেখিত রয়েছে যে, আজান দেওয়া একটি সুন্নাত। এটি ইসলাম ধর্মের একটি বৈশিষ্ট বা নিদর্শন। কোন মহল্লার লোকজন যদি আজান বন্ধ করে দেয় তবে সরকারের অবশ্যই জোর পুর্বক হলেও তা আবার পুনর্বহাল করতে হবে। একজন

মুয়াজ্জিনের কিবলার দিক এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় জানা বাঞ্ছনীয়। আযানের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কিবলার দিকে মুখ করে আযান দেওয়া সুন্নাত। সাধারণত মুসল্লিদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় এবং ইফতারের সময় জানিয়ে দিতে আযান দিতে হয়। নামাযের সময় জানে না বা ফাসিক এরুপ ব্যক্তির দ্বারা আযান দেওয়া ফিতনা স্বরূপ। অদূরদর্শী শিশু, মাতাল, মানসিক ভারসাম্যহীন, জুনুব ব্যক্তি অথবা নারী দ্বারা আযান দেওয়া মাকরুহ। এরুপ ক্ষেত্রে মুয়াজ্জিনের পুনরায় আযান দিতে হবে। তাছাড়া মাওলিদ করা অথবা এরুপ স্থানে যাওয়া যেখানে মাওলিদ করা হয় এটা অনেক সওয়াবের কাজ। তবে নারীদের তাদের কণ্ঠ মাওলিদ, আযান বা গান গাওয়ার মাধ্যমে পর পুরুষকে শোনানো হারাম। একজন নারী শুধুমাত্র নারীদের মাঝেই এগুলো করতে পারবে এবং সে এগুলো রেকর্ড করতে পারবে না এবং পরে এগুলো প্রচার করতে পারবে না। তবে বসে থাকা বা ওযু ছাড়া কোন ব্যক্তি বা কোন জন্তুর বাহনে আরহিত কেউ আযান দিলে তা মাকরুহ হবে তবে এদের দেওয়া আযান পরে আবার পুনরায় দিতে হবে না। আযান মিনারে বা বাহিরে দিতে হবে মসজিদের ভেতরে দেওয়া যাবে না। তালহিনের মত করে আযান দেওয়া মাকরুহ অর্থাৎ এমনভাবে আযানের শব্দগুলোকে প্রলম্বিত করা যে এটি অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে। আযান আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় হতে পারবে না। **ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়্যা** নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, মুয়াজ্জিনের চিৎকার দিয়ে আযান দেওয়া মাকরুহ। ইবনে আবেদীন রাহমাতুল্লাহ আলাহির মতে, কোন উচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া সুন্নাত যাতে করে অনেকে এটি শুনতে পায়। একের অধিক মুয়াজ্জিনের একত্রে আযান দেওয়া জায়েয। তাছাড়া লাউড স্পিকারের সাহায্যে আজান বা ইকামত দেওয়া ঠিক নই। হাদিস শরিফের মধ্যে উল্লেখ আছে**, যদি কেউ বিদয়াত করে, তার কোন ইবাদাতই কবুল হবে না**। যদিও লাউড স্পীকার থেকে আসা শব্দ মানুষের স্বরের মতই তবুও এটি প্রকৃত স্বর নয়।

(একদল বিশেষজ্ঞ উলামার মতে) এটি ম্যগ্নেটিসম এর মাধ্যমে তৈরি শব্দ। যখন কেউ লাউড স্পীকারগুলো কাবার দিকে না ফিরিয়ে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে তখন গুনাহ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এজন্য প্রতি মহল্লায় একটি মসজিদ থাকা উচিত। এতে করে প্রতি মহল্লায় আজান দেওয়া হবে এবং মহল্লার সবাই শুনতে পাবে। একত্রে আজান দেওয়াকে বলে **আজান এ জাওহাক।** হৃদয় কাড়া স্বরে আজানের

ধ্বনিগুলো দূর হতে শোনা যাবে। হৃদয় ও আত্মাকে আলোড়িত করবে এবং ঈমান মজবুত করবে। মুয়াজ্জিন তার আযান এবং ইমাম তার কিরাত এমনভাবে পাঠ করবে যে জামাতের লোকজন এবং আশেপাশের লোক শুনতে পারে। বেশি উচ্চ স্বরে বা চিৎকার দিয়ে আজান বা কিরাত মাকরুহ। এটিও লাউড স্পীকারের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমান করে।

এক কথায় বিশেষজ্ঞ উলামার মতে লাউড স্পিকারের আযান আযান নয়। **আযান এ মুহাম্মাদি** হল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ উচ্চারিত আযান। হাদিসে বর্ণিত আছে, **শেষ দিবস যত ঘনিয়ে আসবে কুরআনে কারিম মিজমারের সাথে পড়া হবে। এটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে পড়া না হবে না। অনেকেই আছে যারা কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। এমন একটা সময় আসবে যখন মুয়াজ্জিনরা হবে সব থেকে নিচ। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিলাওয়াত করা হবে না। শুধুমাত্র আত্মতুষ্টির জন্য পাঠ করা হবে।** মিজমার অর্থ বাদ্যযন্ত্রসহ। লাউড স্পীকারও একটি বাদ্যযন্ত্র। মুয়াজ্জিনদের এই হাদিস শরীফ অনুযায়ী ভীত হওয়া উচিত। এবং লাউড স্পীকার পরিত্যাগ করা উচিত।

অনেকে বলেন, লাউড স্পীকার প্রয়োজন কারণ এটি শব্দ দূরে নিয়ে যায়। আমাদের নবিজি বলেছেন, **আমাকে যেভাবে ইবাদত করতে দেখ তোমরাও সেভাবে ইবাদত কর। যে ব্যক্তি ইবাদতে পরিবর্তন করল সে** নতুন কিছু বিষয় সংযোজন **করল**। এটা বলা সঠিক নয় যে আমরা দ্বীনে নতুন কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করছি। ইসলামিক স্কলাররা শুধুমাত্র জানেন কথায় পরিবর্তন দরকার। তাদের **মুজতাহিদ** বলা হয়। তারা নিজের মত করে কিছু পরিবর্তন করেন না। সুতরাং এটি পরিস্কার যে মিজমার এর মাধ্যমে আজান দেওয়া পরবর্তী যুগে চালু হয়েছে। একমাত্র ব্যক্তির হৃদয়ই অপরকে আকৃষ্ট করে। অন্তর পরিস্কার আয়নার মতন। ইবাদত অন্তরের পরিশুদ্ধিতা বাড়িয়ে দেয়।

বিদআত এবং পাপ কাজ অন্তরকে অন্ধকারে ঢেকে দেয় ফলে আল্লাহ্ তায়ালার ফয়েজ ও নুর আসতে পারে না। সালিহ মুসলিমরা এটি বুঝতে পারেন এবং পেরেশান হন। তারা কখনো পাপ করতে চান না। তারা অধিক অধিক ইবাদত করতে চান। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত তারা কামনা করে আরও বেশি যদি নামায পড়তে পারতো। গুনাহের দ্বারা নফসকে সন্তুষ্ট করা হয়। সকল বিদআত এবং গুনাহ নফসকে আরও শক্তিশালি করে যা আল্লাহর শত্রু। **আব্দুল্লাহ দেহলভি** রহমাতুল্লাহ এর বিশিষ্ট **খলিফা রাউফ আহমদ দারউল মারিফ** নামক কিতাবে

উল্লেখ করেছেন, মিজমার অর্থাৎ মিউজিকাল যন্ত্রের সাহায্যে কুরআনে কারিম তিলাওয়াত বা অন্য কোন ইবাদাতমুলক কাজ হারাম।

শাফেয়ি মাযহাবের কিতাব **আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান** এর **আল মুকাদ্দিমা উল হাদরামিয়্যায়** এবং **ইউসুফ এরদেবেলি** এর **আল আনোয়ার লিয়ামাল ইল আবরার** এ উল্লেখ রয়েছে, শাফেয়ি মাযহাব অনুযায়ী ইমামকে নামাজে অনুসরণ করা সহিহ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত প্রযোজ্য।

১। তার ইমামকে দেখতে হবে,

২। ইমামের আওয়াজ শুনতে হবে,

৩। তার এবং তার সামনের জামাতের লাইনের মাঝে তিন শত দিররাহ অর্থাৎ ১২৬ মিটার এর অধিক দূরত্ব হতে পারবে না। হানাফি এবং শাফেয়ি কোন মাযহাবে মতেই দূর হতে অর্থাৎ টিভিতে দেখে ইমামকে অনুসরণ করলে নামায হবে না। এটি এক ধরনের **বিদআত যা** সালফে সালেহিনদের আমলে দেখা যায় না।

সুরা নিসার ১০৪ নম্বর আয়াত হতে বোঝা যায়, যারা বিদআত করবে যেমন, টেলিভিশন অথাবা রেডিওর মাধ্যমে নামাজ আদায়- তারা জাহান্নামে যাবে। লাউড স্পিকার অথবা রেডিও হতে শোনা আযান যেমন নিজে আযান নয় শুধুমাত্র আযানের মত তেমনি আয়নায় মানুষের বা ফটোগ্রাফ যদিও ব্যক্তির অনেকটা অবিকল কিন্তু এটি ঐ ব্যক্তি নিজে নয়।

নামাযের ওয়াজিবসমুহঃ

হানাফি মাযহাব অনুযায়ী নামাযের ওয়াজিবসমুহঃ

সুবহানাকা... এরপরে অন্য কিছু তিলাওয়াত না করা, যখন জামাতে নামায আদায় করা হয়। ইমাম এবং একাকি নামায আদায়রত ব্যক্তির জন্য দুই রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের অন্তত একবার সুরা ফাতিহা পাঠ করা এবং অন্যান্য নামাযে প্রতি রাকাতে একবার সুরা ফাতিহা পাঠ করা। দুই রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে প্রতি রাকাতে এবং তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকাতে এবং অন্য নামাযে প্রতি রাকাতে দমএ সুরা তিলাওয়াত সুন্নাত। তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দুই রাকাতে ফাতেহা শরিফ পড়া। একটা ফরয হতে অন্য

ফরযে যাওয়া। দম এ সুরার পূর্বে ফাতিহা শরিফ পাঠ করা। প্রথম বৈঠক অর্থাৎ কাযা এ উলায় বসা। একটির পর অপর সেজদা করা। কাযা এ আখিরা অর্থাৎ শেষ বৈঠকে আত্যাহিয়্যাত পাঠ করা। সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করা। সালাতুল বিতর এ কুনুত দোয়া পাঠ করা। ঈদ এর সালাতে অতিরিক্ত তাকবির বলা।

তাদিল এ আরকানসমুহ যথাযথভাবে পালন করা। অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার পর বা রুকু থেকে দাড়িয়ে দুই সেজদার মাঝে এবং জলসায় বসা অবস্থায় কিছু সময় স্থিরভাবে অবস্থান করা। নামাযে এই ধিরস্থিরভাবে অবস্থানকে তুমানিনাত বলা হয়। তিলাওয়াতের সেজদা দেওয়া। নিজে সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে অথবা ইমাম সাহেবকে তিলাওয়াত করতে শুনলে। প্রয়োজনে সেজদায়ে সাহু করা। চার রাকায়াত ফরয নামাযে তাকবিরে তাহিয়্যাত এর পর পরই কাযা এ উলায় বিলম্ব না করে দাড়িয়ে যাওয়া। সরবাবস্থায় ইমামকে অনুকরন করা। কাওল অনুযায়ী যেকোন ওজর ছাড়া জামাতে নামায আদায় করা। আরাফার দিনের ফযরের নামাযের পর হতে শুরু করে কুরবানির ঈদ এর চতুর্থ দিন সন্ধ্যার নামায পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরয নামাযের শেষে **তাকবিরে তাশ্রিক** পাঠ করা। (যা অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের বাইশ নম্বর অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে)

নামাযের সুন্নাতসমুহঃ

হানাফি মাযহাব অনুযায়ী নামাযের সুন্নাতসমুহ- তাকবীরে ইফতিতাহ এবং বিতরের নামাযে তাকবীরে কুনুতের সময় পুরুষদের কানের লতি পর্যন্ত দুই হাত তোলা এবং মেয়েদের স্কন্ধ বরাবর দুই হাত তোলা এবং দুই হাত কিবলার দিকে মুখ করে রাখা। কিয়ামরত অবস্থায় বাম হাতের তালু ডান হাতের তর্জনী এবং বৃধাঙ্গুলি দিয়ে উপর করে বেষ্টিত থাকবে।মেয়েরা শুধু ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখবে। পুরুষেরা নাভির নিচে হাত বাধবে অপর দিকে মেয়েরা তাদের বক্ষের উপরে হাত বাধবে।।নামাযের শুরুতে প্রথম রাকআতে ইমাম এবং মুসল্লি সকলেরই ছানা পড়া সুন্নাত। ছানার পরে ইমাম এবং মুসল্লি সকলেই **আউজু বিল্লাহ** এবং **বিসমিল্লাহ** পাঠ সুন্নাত। নামাযে ইমাম মুসল্লি এবং একাকি আদায়কারী সকলেরই প্রতি রাকআতে সুরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ শরিফ, এবং ফাতিহার

শেষে **ওয়ালাদ্দয়াল্লিন** এর পরে অনুচ্চস্বরে আমীন বলা সুন্নাত। কিয়াম অবস্থা থেকে রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবির বলা, রুকুতে থাকা অবস্থায় হাঁটুর উপরে হাতের আঙ্গুলগুলো সুন্দরভাবে ছড়িয়ে রাখা এবং তিন বার **সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম** বলা।

[১] একা নামায পড়া বলতে বোঝায় যখন কোন মুসলিম নিজে নিজে নামায আদায় করে।

[২] এটা আবশ্যক যে কিছু নিয়ম শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য।

মহিলাদের জন্য অফুরন্ত নিয়ামত নামক কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের চৌদ্দতম অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে মেয়েদের নামাযের বিস্তারিত রয়েছে।

দাঁড়ানোর সময় মেরুদণ্ড এবং মাথা একই সমান্তরালে থাকবে। ইমাম এবং একাকি নামায রত ব্যাক্তি রুকু থেকে উঠার সময় **সামিআল্লাহু লিমান হামিদা** বলবে। জামাতে এবং একাকি নামায রত ব্যক্তি রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর **রব্বানা লাকাল হামদ** পড়বে। কিয়াম হতে সেজদায় যাওয়ার সময় **আল্লাহু আকবর** বলা। প্রথম সেজদা হহতে উঠে বসার সময় এবং দ্বিতীয় সেজদাতে যাওয়ার সময় **আল্লাহু আকবর** বলা। সেজদায় হাতের আঙ্গুলসমুহ একত্রে রাখা। সেজদারত অবস্থায় পুরুষেরা হাঁটু মাটিতে রাখবে, এবং তলপেট উরু হতে আলাদা থাকবে। অপর পক্ষে মহিলারা তাদের তলপেট এবং উরু একত্রে আড়ষ্ট করে রাখবে।দ্বিতীয় সেজদাহ হতে ওঠার সময় **আল্লাহু আকবর** বলা। সেজদাহ তে ওঠার পর পুরুষেরা বসার ক্ষেত্রে বাম পায়ের উপরে বসা এবং ডান পা ছড়িয়ে রাখা। দুয়া এ সালাওয়াত এবং শেষ বৈঠকে শেষ বৈঠকের দুয়াসমুহ পড়া। এরপর ডান এবং বামে মাথা ঘুরিয়ে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। তেহইয়্যাত অর্থাৎ নামাযে বসা অবস্থায় দুই হাত কোলের উপরে রাখা এবং হাতের কব্জিও আঙ্গুল হাঁটুর উপরে রাখা। সেজদায় হাত এবং পায়ের পাতা কিবলামুখি রাখা এবং হাত কানের সাথে একই সমান্তরালে থাকবে। ৭টি অঙ্গের সমন্বয়ে সেজদা পরিপূর্ণ করা। চার রাকায়াত ফরয নামাযের শেষ দুই রাকআতে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। সুন্নাতে শরিফার সাথে **আযানে মুহাম্মদি** দেওয়া। এবং ফরয নামযের আগে জামাত কিংবা একাকি উভয় ক্ষেত্রে ইকামাত দেওয়া।

নামাযের মুস্তাহাবসমূহঃ

হানাফি মাযহাব অনুযায়ী নামাযের মুস্তাহাবসমূহ হল- জামায়াতে নামাযের ক্ষেত্রে মুয়াযযিন ইকামাতে হাইয়া আলাস সালাহ বলার পরও বসে না থাকা এবং সাথে সাথে দাড়িঁয়ে যাওয়া । তাকবিরে ইফতিতাহ এবং বিতরের নামাযের তাকবির কুনুতের সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের লতি স্পর্শ করা। তারা যখন নামাযে হাত বাঁধবে, হাত শক্ত করে বাধাঁ। কিয়ামরত অবস্থায় সেজদার জায়গায় নযর রাখা। রুকু এবং সেজদায় রুকুর তাসবিহ এবং সেজদার তাসবিহ যথাযথভাবে পাঁচ থেকে সাতবার পাঠ করা **(রাব্বিয়াল আযিম** এবং **রাব্বিয়াল আলা**)। রুকুর সময় পায়ের পাতার দিকে নযর রাখা। রুকুতে শরীর বাঁকানোর সময় দুইপা একত্রে রাখা। পুনরায় কিয়াম করার জন্য ওঠার পর বাম পায়ের পাতা ডান পা হতে আলাদা করা। সেজদায় মাটিতে বা মেঝেতে কপাল ঠেকানোর পূর্বে নাক স্পর্শ করানো। সেজদার সময় নাকের উভয় পাশে দেখা। সালাম ফিরানোর সময় উভয় কাধের দিকে তাকানো। সালামের সময় জামায়াতে নামাযের ক্ষেত্রে ইমামের বাম পার্শের মুসল্লিরা এই নিয়ত করবে যে সে ইমাম সাহেব, হাফাযার ফেরেশতাসমুহকে এবং জামাতের মুসলিমদের সালাম দিচ্ছে। ইমামের ডান পার্শে অবস্থানকারী মুসল্লিরা এই নিয়ত করবে যে হাফাযার ফেরেশতাসমুহ এবং জামাতের মুসল্লিদের সালাম দিচ্ছে। কোন ব্যক্তির দুই পার্শে যদি কোন মুসল্লি না থাকে তবে সে নিয়ত করবে যে হাফাযার (১) ফেরেশতাসমুহকে সালাম দিচ্ছে। নামাযের সময় শরীরের ঘাম না মোছা। কাশি এবং গোঙ্গানি জাতীয় শব্দ এড়িয়ে যাওয়া। **তাহিয়্যাআত** অর্থাৎ নামাযের বৈঠকে বসা অবস্থায় উরুর উপর নযর রাখা। এবং ইমামের ক্ষেত্রে নামাযের শেষে জামায়াতের মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরানো।

[১] অনুগ্রহপূর্বক হাফাযা বা কিরামান কাতেবিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হাকিকাত কিতাবের প্রকাশিত বিশ্বাস এবং ইসলাম নামক কিতাবের ঈমানের মৌলিকত্ব নামক অধ্যায়ের একুশ নম্বর পরিচ্ছেদ দেখুন।

নামাযের আদবসমূহঃ

১। একাকী নামাযরত ব্যক্তি এবং পাশাপাশি মুসল্লি যে ইমামের পেছনে নামায আদায় করছে উভয়ের ক্ষেত্রেই নামাযের শেষে পাঠ করা, **আল্লাহুম্মা আনতা**

সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাক তাইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম। এরপর তিনবার, **আস্তাগ ফিরুল্লাহিল আজিম আল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুউল কাইয়্যুম ওয়াতুবু ইলাইহি।** এটি ওযু ছাড়াও পাঠ করা জায়েজ।

২। এরপর **আয়তুল কুরসি** পাঠ করা।

৩। তেত্রিশ বার **সুবহানাল্লাহ** বলা।

৪।তেত্রিশ বার **আলহামদুলিল্লাহ** বলা।

৫। তেত্রিশ বার **আল্লাহু আকবর** বলা।

৬। এরপর একবার নিম্নক্ত দুয়াটি পাঠ করা, **লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলাকুল্লি শাইয়্যীন কাদির।**

৭। এরপর দুই হাত কিবলার দিকে ধরে আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের সাথে মোনাজাত করা।

৮। জামায়াতে নামায আদায় করলে দুয়ার জন্য অপেক্ষা করা,

৯। দোয়ার শেষে আমীন বলা।

১১। তাছাড়া এগার বার **সুরা ইখলাস** পাঠ করা, এবং সুরার প্রতি বারের শুরুতে **বিসমিল্লাহ** পাঠ করা, যা উপরোক্ত আলোচনায় এসেছে। এরপর আয়াতে কারিমা অর্থাৎ **কুলহু আল্লাহ্‌** শুরু করা। এরপর সাতষট্টি বার **আস্তাগ ফিরুল্লাহ** পাঠ করা। এরপর তিন বার **এস্তেগ ফার** দুয়াটি পরিপুর্ন পাঠ করে সত্তরবার পুর্ন করা। এরপর ১০ বার বলা **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম**। এরপর **সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জতি...** আয়াতে কারিমা পরিপুর্ণ পড়া। এই আদবগুলি **মেরাকুল ফালাহ** নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষের দুয়াসমুহ কবুল হয়। তবে দুয়াসমুহ সচেতন এবং সজাগ কলবে এবং নিঃশব্দে হতে হবে। শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শেষে দুয়া করা [তবে কারো কারো মতে] দুয়ার নামে কবিতার মত কিছু আবৃতি করা মাকরূহ। দুয়ার শেষে সুন্দরভাবে দুই হাত দিয়ে মুখ মন্ডল মর্দন করা সুন্নাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফের শেষে, খাবার শেষে এবং ঘুমানোর পূর্বেও এরুপ দুয়া করেছেন। নামাযের সময় দুয়ার ক্ষেত্রে তিনি দুই বাহু মোবারক দূরে ছড়িয়ে দিতেন না এবং হাত দিয়ে পবিত্র মুখ মোবারক মুছতেন না। দুয়াসমুহ এবং যে কোন জিকির নিঃশব্দে করা যাবে। (জিকিরের জন্য পর্যবেক্ষণ করুন, অফুরন্ত নিয়ামত নামক কিতাবের, প্রথম খণ্ডের ছেচল্লিশ এবং আটচল্লিশ

নম্বর অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ডের, বিশ, তেইশ, সাইত্রিশ এবং ছেচল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় খণ্ডের সাতান্ন এবং ষষ্ঠ খণ্ডের পঁচিশ নম্বর অধ্যায়)। দুয়াসমুহ এবং ইস্তিগফার অযুসহ করা মুস্তাহাব। ভ্রান্ত তরিকত পন্থিদের মত নাচ, দফ বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজান যেমন বাঁশি ড্রাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে হারাম। তাছাড়া জামাতে নামাযের ক্ষেত্রে নামাযের শেষে ইমামের দুয়া এবং ইস্তেগফারসমুহ নিঃশব্দে পাঠ প্রশংসনীয়। তাছাড়া প্রত্যেকের নিজের মত করে দুয়া পাঠ এমনকি দুয়া পাঠ না করে চলে যাওয়াও অনুমোদিত। **ফতওয়ায়ে** হিন্দিয়্যা নামক কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে, (শায়খ নিজাম উদ্দিন নাকশবন্দিয়া এর তত্ত্বাবধানে একদল স্কলারের সমন্বয়ে রচিত): ”নামাযের মধ্যে যেটায় শেষ সুন্নাত রয়েছে, (যোহর মাগরিব এবং ইশার সালাত) ইমাম এর জন্য ফরয নামাযের সালামের পর বসে থাকা মাকরুহ। সে ডানে বা বায়ে বা পেছনে গিয়ে দ্রুত সুন্নাত নামায আদায় করে নিবে অথবা তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন এবং বাড়ি গিয়ে শেষের সুন্নাত আদায় করতে পারেন। জামাত এবং একই সাথে মুসলিমরা যারা একাকী নামায আদায় করছিল তারা বসে থাকতে পারেন এবং নামায আদায় করতে পারেন। তাদের জন্য তারা যেখানে বসেছিল সেখানে দাঁড়িয়েই সুন্নাত আদায় করতে কিংবা ডানে বায়ে সরে গিয়ে নামায আদায়ের অনুমতি রয়েছে। যেসব নামাযে শেষ সুন্নাত নেই এক্ষেত্রে নামাযের শেষে ইমামের কিবলার দিকে মুখ করে থাকা মাকরুহ এবং বিদআত। তার উচিত উঠে যাওয়া, জামাতের দিকে ঘুরে তাকান বা ডানে বায়ে ঘুরে আবার বসা।)

নামাযের পরে যেসব দুয়া পাঠ করা যায়- আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ইয়া রব্বি! দয়া করে আমাদের নামায কবুল করে নিন। দয়া করে আমার আখিরাতে খাইর প্রদান করুণ। আমাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় কালিমায়ে তাওহিদ পড়া নসিব করুণ। আমার মৃত আত্মীয়দের মাগফিরাত দান করুন। আল্লাহুম মাগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমিন। তেভেফফিনী মুসলিমান ওয়া আলহাকিনি বিসসালিহিন। আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা ওয়ালি উস্তাজিয়্যা ওয়া লিলমুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। ইয়া রাব্বি, আমাকে শয়তানের খারাপি এবং নিজের নফসে আম্মারা হতে রক্ষা করুণ। দয়া করে আমাদের বাড়িতে রহমত এবং হালাল উপার্জন দান

করুন। আহলে ইসলামকে সালামাত বর্ষণ করুণ। দয়াকরে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করুন।

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়্যুন কারিমুন তুহিব্বু্য আফওয়া ফায়াফু আন্নি । ইয়া রব্বি! আমাদের সকলকে সুস্থতা দান করুন এবং অসুস্থদের অসুস্থতা দূর করে দিন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা সিহাতাও অ্যালআমানা তাওয়াহুস্নান খুল্কি ওয়াররি দাবিল কাদিরি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। দয়াকরে আমার পিতা মাতা এবং সন্তান আত্মীয় বন্ধু এবং সকল মুসলিম ভাইদের জীবন খাইর এবং হিদায়াত এবং ইস্তিকামাত দান করুন। ইয়া রাব্বি আমিন! ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলাআলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদু ম্মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলাআলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মজিদ । আল্লাহুম্ম রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া কিনা আজাবান্নার। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ আলআজিম, আলকারিম আল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুয়্যাল হাইয়্যুল কাইয়উম ওয়াতুবু ইলাইহি।

নামাযের মাকরূহসমুহঃ

১- নামাযের মধ্যে ঘাড় বাকিয়ে এদিক ওদিক তাকানো,

২- কিছু নিয়ে নিজে নিজে খেলা করা,

৩- কোন ওযর ব্যতীত নামাযের মধ্যে সেজদার জায়গা পরিস্কার করা,

৪- পুরুষদের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় বুকের উপর হাত বাধা এবং সেজদার সময় দুই হাত সিনা বরাবর এক লাইনে রাখা,

৫- আঙ্গুল ফোটানো বা আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করা,

৬- কোন ওযর ব্যতীত দুই পা একে অপরের উপর রেখে অর্থাৎ ক্রস করে বসা,

৭- সেজদার সময় যে কোন পা উপরে তোলা,

৮- এমন কোন পোশাকে নামায আদায় করা যা কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা বড়দের সামনে পরিধানযোগ্য নয়,

৯- কারো মুখ বরাবর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে নামায পড়া,

১০- আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা,

১১- শরীরে বা কাপড়ে কোন ছবি আঁকানো বা ফটোগ্রাফ থাকা,

১২- কোন ওজর ব্যতীত গোঙ্গানো,

১৩- জামার হাতের মাঝে হাত ঢুকিয়ে নামায আদায় করা,

১৪- নামাযে সিনা ঝুলিয়ে অর্থাৎ কুকুরের মত করে বসা,

১৫- চোখ বন্ধ করে রাখা,

১৬- কিবলার দিক হতে অন্য দিকে হাত ঘুরিয়ে রাখা,

১৭- জামাতে নামায আদায়ের সময় সামনের কাতার ফাঁকা রেখে আলাদা কোন কাতারে দাঁড়ানো,

১৮- কোন কিছু সামনে না রেখে সরাসরি কবরের সামনে নামায আদায় করা,

১৯- নাযাসাত অর্থাৎ নাপাক এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা, নাজাসাত সম্পর্কে বিস্তারিত অফুরন্ত নিয়ামত কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত রয়েছে,

২০- নারী পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা,

২১- ইস্তেঞ্জার জরুরত অবস্থায় নামায আদায় করা,

২২- রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সেজদায় যাওয়ার সময় কোন ওজর ছাড়া সরাসরি হাত আগে মাটিতে দেওয়া,

২৩- ইমামের আগে রুকুতে যাওয়া।-

২৪- ইমামের পুর্বে রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

২৫- ইমামের পুর্বে সেজদায় যাওয়া।

২৬- ইমাম এর পুর্বে সেজদা হতে মাথা তোলা।

২৭- ওজর ব্যতীত কোন কিছুতে ভর দিয়ে উঠা।

২৮- সেজদা হতে ওঠার সময় দুই হাত তলার পুর্বে হাঁটু তোলা।

২৯- মুখ এবং চোখ হতে ধুলা বালি মোছা।

৩০- পরের রাকাতে এমন সুরাকে এড়িয়ে যাওয়া যা সিরিয়াল অনুযায়ী পূর্ববর্তী রাকায়াতে তিলাওয়াত কৃত সুরার ঠিক পরের সুরা।

৩১- একই সুরা দুই রাকাতে পড়া অথবা একই সুরা একই রাকাতে দুইবার তিলাওয়াত করা।

৩২-কোন রাকাতে এমন সুরা তিলাওয়াত করা যা পুর্ববর্তী রাকাতে তিলাওয়াতকৃত সুরার আগের সুরা।

৩৩- পূর্ববর্তী রাকাতে তিলাওয়াতকৃত দমে সুরার অপেক্ষা তিন আয়াতের অধিক তিলাওয়াত করা।

৩৪- ওজর ব্যতীত কোন কিছুতে ভর দিয়ে সেজদায় যাওয়া কিংবা কোন কিছুতে ভর দিয়ে সেজদা থেকে ওঠা।

৩৫-নামাযে মাছি তাড়ানো।

৩৬- হাতা গোটানো অবস্থায় কিংবা কাঁধ অথবা পা উন্মুক্ত অবস্থায় নামায আদায় করা।

৩৭- বাহিরে থাকা অবস্থায় নিজেকে আবৃত না করা।

৩৮- জনগণের চলার পথে নামায আদায় করা।

৩৯- রুকু এবং সেজদার সময় তাসবিহ আঙ্গুল দিয়ে গোনা।

৪০- ইমামের মেহরাবের খুব ভেতরে ঢুকে যাওয়া।

৪১- ইমামের একাকী জামাতের লোকদের সমতলের তুলনায় একদারা পরিমান উচু স্থানে নামায আদায় করা।

৪২- ইমামের মেহরাব ব্যতীত অন্য কোথাও হতে নামায পরিচালনা করা।

৪৩- নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে আমীন বলা।

৪৪- কিয়ামরত অবস্থায় পঠ্য আয়াতে কারিমাসমুহ রুকুতে গিয়ে তিলাওয়াত করা।

৪৫- রুকুতে পঠ্য দুয়া দাঁড়ানোর পর সমাপ্ত করা।

৪৬- ওজর ব্যতীত এক পায়ে নামাযে দাঁড়ানো।

৪৭-নামাযের মাঝে বিভিন্ন পার্শে যাওয়া।

৪৮-কোন পোকা মাকড় না কামড়ানো সত্ত্বেও মারা।

৪৯- নামাযের মাঝে কোন কিছুর গন্ধ নেওয়া।

৫০- খালি মাথায় নামায আদায় করা। হাজিরা ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে খালি মাথায় নামায আদায় করবেন।

৫১- দুই হাত ছাড়া অবস্থায় নামায আরম্ভ করা।

৫২- খালি পায়ে নামায আরম্ভ করা। কোন কোন বর্ণনা মতে মেয়েদের খালি পায়ে নামায আদায় মাকরূহ, আবার কোন কোন বর্ণনায় এটি নামায ভঙ্গের কারণ। ইবনে আবিদিন এর চারশত উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, যখন মসজিদে প্রবেশ করা হয় তখন পেছনে জুতা বা অন্য কিছু রাখা মাকরুহ। বারিকাতাত এর শেষ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে, সামনে অথবা ডানে রাখার চাইতে বামে রাখা সুন্নাত।

তেগরিব-উস-সালাত নামক কিতাবে উল্লেখ আছে ফরয এবং সুন্নাত নামযের মাঝে কোন নামায আদায় মাকরুহ।

নামায ভঙ্গের কারণঃ

হানাফি মাযহাব অনুযায়ি নামায ভঙ্গের ৫৫টি কারণ রয়েছে, যার একটির কারণেই নামায ভেঙ্গে যাবে।

১- দুনিয়াবি কিছু পাঠ করা,

২- উচ্চ স্বরে হাসা,

৩- এমন কিছু করা যাকে আমলে কাছির বলা হয়,

৪- ওজর ব্যতীত কোন ফরয ছেড়ে দেওয়া,

৫- অসতর্কভাবে কোন ফরয ছুটে যাওয়া,

৬-দুনিয়াবি কিছুর জন্য উচ্চস্বরে কান্না করা,

৭- ওজর ব্যতীত কাশি দেওয়া বা গলা পরিস্কার করা,

৮- চুইংগাম চাবানো,

৯- শরীরের কোন স্থান এক হাত দিয়ে তিন বারের অধিক চুলকালে বা হাত ছেড়ে ক্লাপ দিলে,

১০- হ্যন্ডসেক করা।

১১- এমনভাবে তাকবিরে ইফতিতাহ উচ্চারণ না করা যাতে নিজে শুনতে পারে।

১২- এতটুকু উচ্চস্বরে তিলাওয়াত বা অন্যান্য দুয়াসমুহ পাঠ না করা যে নিজের কানে পৌঁছায়।

১৩- কারো ডাকের জবাবে লা**হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম, সুবহানাল্লাহ অথবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ** বলা। ব্যক্তির নামায ততক্ষণ পর্যন্ত ফাসিদ হবে না যদি ব্যক্তির উদ্দেশ্য হয় অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া সে নামাযে আছে। যদি তার উদ্দেশ্য হয় নামাযের জবাব দেওয়া তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

১৪-উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে সালামের জবাব দেওয়া,

১৫-মুখে কোন মিস্টি বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা এবং এটির লালা গলোধকরণ করা।

১৬- বাহিরে নামাযরত অবস্থায় আকাশের দিকে মুখ করা। এবং বৃষ্টির পানি মুখ দিয়ে গ্রহণ করা।

১৭- আরোহন করা জন্তুর দড়ি তিন বারের অধিক টানা,

১৮- তিনবারের বেশি হাত তোলা, কোন ধরনের পোকা- মাকড়, মাছি ইত্যাদি মারা অথবা হাত দিয়ে পিশে ফেলা।

১৯- এক রুকন এর মধ্যে তিন এর অধিক চুলতোলা।

২০- তিন অক্ষর এর শব্দ বিশিষ্ট কোন আওয়াজ করা।

২১-ঘোড়ার পিঠে নামাযরত অবস্থায় তিনবারের অধিক ঘোড়ার গায়ে পা দিয়ে আঘাত করা।

২২- একবার উভয় পা দিয়ে আঘাত করা।

২৩- ইমাম এর সামনে নামাযে দাঁড়ানো।

২৪- কোন ওজর ব্যতিত দুই রাকাতের মাঝখান দিয়ে হাটা।

২৫- দাড়ি অথবা চুল আঁচড়ানো,

২৬- নারী- পুরুষ একই কাতারে পাশাপাশি উভয়ে ইমাম এর পেছনে জামাতের সাথে নামায আদায় করা। নারী এবং যুবতী মেয়েদের পরিপুর্ণভাবে পর্দা ছাড়া কিংবা শরীরের কোন অংশ উন্মুক্ত রেখে বাহিরে কিংবা মসজিদে যাওয়া হারাম। এক্ষেত্রে এরুপ নামাযের কারণে তাদের সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

২৭- নিজের ইমাম ব্যতিত অন্য ইমামের সমস্যার সমাধান করা।

২৮-যেমন কোন ফাকা স্থানে কোন মহিলা ইমামের অনুসরণে নামাযে দাড়িয়ে গেল। এরপর অন্য লোকরা এসে তার সাথে জামাতে যোগ দিল। এতে করে লাইনটি লম্বা হওয়ায় মহিলার অবস্থান ঢেকে গেল। এরুপ অবস্থায় তিন জনের নামাজ অর্থাৎ মহিলার ঠিক ডানের ব্যক্তি ঠিক বামের ব্যক্তি এবং ঠিক পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

২৯- কারো বাচ্চাকে আলিঙ্গন করা,

৩০- কিছু খেলে বা পান করলে।

৩১- ছলার দানার সমপরিমান কিছু চাবালে এবং তা দাতের ভিতর আটকে থাকলে।

৩২-দুই হাত দিয়ে শার্টের কলার ঠিক করলে বা এরুপ কিছু করলে।

৩৩- কোন খারাপ সংবাদ শুনে **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন** বলা।

৩৪- কোন ভালো খবর শুনে **আলহামদু লিল্লাহ** বলা।

৩৫- নামাযের মাঝে কফ বা হাচিঁর পরে **আলহামদু লিল্লাহ** বলা।

৩৬- কোন ব্যক্তির হাচিঁর জবাব শুনে **ইয়ারহামু কাল্লাহ** পাঠ করা।

৩৭- অপর ব্যক্তির জবাব **ইয়াহদি কুমুল্লাহ** বলা,

৩৮- কোন ব্যক্তি এসে যদি নামাযরত কোন মহিলাকে চুম্বন করে।

৩৯- নামাযরত অবস্থায় দুনিয়াবি কোন কিছু চাওয়া,

৪০- কাবার দিক হতে সিনা ঘুরিয়ে ফেলা,

কিবলাহ দিক নির্ণয়ের দুইটি উপায় রয়েছে-

১- কৌনিকভাবে কিবলার দিক নির্নয় করা, ২- সময়ের ভিত্তিতে কিবলার নির্নয়,

৪১- সেজদার সময় উভয় পা মাটি হতে তোলা,

৪২- এমন অশুদ্ধভাবে কুরানের আয়াত তিলাওয়াত করা যে তা অর্থ পরিবর্তন করে দেয়।

৪৩- মহিলাদের জন্য নামযের মাঝে বাচ্চাকে স্তন পান করানো।

৪৪- অন্যের জায়গায় নিজের জায়গা পরিবর্তন করা,

৪৫- আরোহনরত প্রাণীকে তিনবার আঘাত করা।

৪৬- বন্ধ দরজা খোলা।

৪৭- নূন্যতম তিন অক্ষর বিশিষ্ট কোন লাইন লিখা,

৪৯- কাযা নামাযসমুহ স্মরণ করা যদি তা ছয় এর কম হয়।

৫০- জাহাজে বা কোন বাহনের পিঠে ওজরসহ নামাযরত অবস্থায় কেবলার দিক হতে মুখ ঘুরে যাওয়া।

৫১- জন্তুকে এমনভাবে ভার না দেওয়া যেন ব্যক্তি জন্তুর উপরে উপবিষ্ট।

৫২-অন্তর থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

৫৩- জুন্দুব হয়ে যাওয়া।

৫৪- ইমাম এর এমন কাউকে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া এবং মনে করা যে তার নিজেরও যুবি নষ্ট হয়ে গেছে।

৫৫- এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। ইবনে আবিদিন থেকে বর্ণিত, কোন নামাযের বাইরে থাকা ব্যক্তিকে অনুসরন করে আদায়কৃত নামায সহি হবে না। ইমাম এবং মুয়াজ্জিনের স্বর অধিক উচ্চ করা মাকরুহ। ইমাম যখন তাকবীরে তাহায়্যা করবে তখন নামাযের নিয়্যাত করা। তাদের নামায সহিহ হবে না যদি তারা শুধু মাত্র জামাতকে তাদের আওয়াজ

শোনানোর জন্য নিয়্যাত করে। ইমাম এর আওয়াজ যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুয়াজ্জিনের উচ্চ স্বরে তাকবীর বলা মাকরুহ।

নামায ভঙ্গের কারণ নয়ঃ

নামাযের সামনের কাতার যদি অপূর্ণ থাকে তবে এক বা দুইপা এগিয়ে গিয়ে কাতার পূর্ণ করলে অথবা কারও জাবাব হিসাবে ছাড়া আমিন বললে, কারও সালাম বা সম্ভাষণের জবাবে চোখ দিয়ে অথবা চোখের পাতা দিয়ে ইশারা করলে অথবা কোন ব্যক্তির কত রাকাত নামায হয়েছে এই প্রশ্নের জবাবে হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে নামায ভঙ্গ হবে না।

সালাতের আভিধানিক অর্থ, আল্লাহু আজিমুসশান এর দয়া এবং রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষ হতে ইস্তিগফার এবং মুমিনদের দুয়া কামনা। এর পারিভাষিক অর্থ, ইফালে মা,লুমা, এরকান এ মাহসুসা। বাংলায় নামায আদায় করা। ইফালে মা,লুমা অর্থ নামাযের বাহিরের কাজ এবং এরকান এ মাহসুসা অর্থ নামাজের অভ্যন্তরীণ রুকনসমুহ। এগুলোর সমন্বয়ই নামায।

একদা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার প্রিয় সাহাবি আলী কারামুল্লাহ ওয়াজয়াহু ওয়া রাদিয়াল্লাহকে বলেন, **হে আলী, তুমি অবশ্যই নামাযে ফরয, ওয়াজিব , সুন্নাত এবং মুস্তাহাবসমুহ পরিপুর্ণ ভাবে পালন করবে।**এরপর আনসারদের মাঝের একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি রাসুলকে লক্ষ করে বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, হযরত আলী ইতিমধ্যে এসব বিষয়ে অবগত। আমাদেরকে এই নামাযের ফরয সুন্নাত ওয়াজিব এবং মুস্তাহাবসমুহের মহিমা বর্ণনা করুন যেন আমরা এগুলা আরো পরিপুর্ণ ও সুন্দরভাবে পালন করতে পারি । হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেন, ”**হে আমার উম্মত এবং সাহাবাগণ, নামায এমন একটি ইবাদত যার উপর আল্লাহ সুবহানা তায়ালা সন্তুষ্ট। এটা ফেরেশতাদের পছন্দ। এটি নবীজির সুন্নাত। এটি মারিফাতের নুর স্বরূপ, আমলসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমল। শরীরের জন্য এনার্জি স্বরূপ। রিজিকের জন্য বরকত। আত্মার নুর, দুয়া কবুলের শর্ত। এটি মৃত্যুর ফেরেশতার ভয়াভহতার লোপকারি। কবরের আলো, মুঙ্কার এবং নাকিরের প্রশ্নের জবাব, কেয়ামত দিবসে শামীয়ানা স্বরূপ, এটি জাহান্নাম এবং আমাদের মাঝের প্রাচীর স্বরূপ। বিদ্যুৎ**

গতিতে পুলসিরাত পেরুতে সহায়তা করবে। জান্নাতে মাথার তাজ। এবং নামায জান্নাতের চাবি।

জামাতে নামাযে রহমতঃ

উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি জামাতে দুই রাকাত নামায আদায় করে এবং নিজে নিজে ২৭ রাকাত নামায আদায় করে তবে তার এই দুই রাকাতের সওয়াব সাতাশ রাকাত থেকে বেশি। অন্য বর্ণনায় এসেছে এমনকি জামাতে আদায় করা দুই রাকাত নামায একাকি এক হাজার রাকাত নামায অপেক্ষা বেশি সওয়াব। বিভিন্ন রেওয়াতে জামাতে নামাযের প্রচুর সওয়াবের বর্ণনা এসেছে। যেমন–

১। মুমিন একে অপরের সানিধ্যে আসলে তাদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়।

২। অজ্ঞ কেউ অধিক জানা ব্যক্তির কাছ থেকে নামাযের অজানা বিষয় গুলো জানতে পারবে।

৩।যদি এক দলের নামাজ কবুল হয় এবং অপর দলের না হয়।তবে এই পূর্ববর্তীদের নামাযের বরকতে পরবর্তীদের নামায কবুল হয়ে যায়।

এক রেওয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বল্লেন„ **"হে আমার উম্মত। তোমাদের জন্য আমি দুইটি পথ রেখে যাচ্ছি, একটা কুরআন এবং অপরটি আমার সুন্নাত যে ব্যক্তি এগুলা বাদে অন্য কিছুকে অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত নয়।**

আব্দুল গনি নাবলুসি রাহমাতুল্লাহ আলাহি [১০৫০-১১৪৩ হিজরি, ১৬৪০-১৭৩১ খ্রিস্টাব্দ] **হাদিকা** [যা ইমাম বিরগিভির **তারিকায়ে মুহাম্মদিয়া** কিতাবের সারাংশ] কিতাবের নিরানব্বই পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইসলামের একটা অংশ কুরআনের মাধ্যমে এবং বাকি অংশ তিনি প্রকাশ করেছেন বা পূর্ণতা দান করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলিহি সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বলতে বোঝায় তার বিশ্বাস, বর্ণনা, প্রাকটিস, আচরণ, এবং কারো কোন কাজের প্রতি তার দিক নির্দেশনা বা সমর্থন। এই হাদিসটি **আদিল্লাহ এ শরিয়া** গ্রন্থের দ্বিতীয় হাদিস নির্দেশ করে।

জামাতের ইমামতিঃ

ইমামকে জামাতে অনুসরণ করেন এমন চার ধরনের লোক রয়েছে, মুদরিক, মুক্তেদি, মাসবুক এবং লাহিক।

১। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাকবিরেই হাত বাধে তিনি মুদরিক।

২। যে ব্যক্তি প্রথম তাকবির ধরতে ব্যর্থ হয় তিনি মুক্তাদি।

৩। মাসবুক সেই ব্যক্তি যে ইমামের এক বা দুই রাকাত নামায সম্পন্ন হওয়ার পরে জামাতে শরিক হন।

৪। লাহিক সেই ব্যক্তি যিনি ইমামের সাথে তাকবিরে তাহরিমা বাধেন এবং কোন হাদাস বা এরুপ জরুরত এর কারণে নামাজের মধ্যে ওযুর জন্য যান এবং অযুর পরে আবার নামাযে ইমামের সাথে যোগ দেন। এরুপ ব্যক্তির নামায ইমামের পেছনে সম্পূর্ণ নামায আদায়কারী, সম্পূর্ণ কিরাত পাঠকারী এবং সম্পূর্ণ রুকু সেজদা দানকারী সমান হিসাবে গণ্য হবে। যেন সে পুরো নামায তাই ইমামের পেছনে আদায় করল। তবে তাকে ওযু করার জন্য নিকটস্থ কোন জায়গায় যেতে হবে এবং কার সাথে কথা বলা যাবে না। অনেক ফকিহের মতে ব্যক্তি দুরের কোন অজুখানায় ওযুর জন্য গেলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি যদি দ্রুত ইমামের সাথে রুকু ধরতে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে তাকবিরেই ইফতিতাহ এবং নিয়ত ছাড়াই দ্রুত রুকুতে চলে যায় তবে তার ঐ রাকাত ইমামের সাথে গণ্য হবে না। সে যদি এসে পরিপুর্ণভাবে নিয়ত তাকবিরে ইফতিতাহ এবং রুকুর তাসবিহ পাঠ করে তবে তার ঐ রাকাত ইমামের সাথে গণ্য হবে। তথাপি যদি ইমাম রুকু হতে সোজা দাঁড়ানোর পর যদি কেউ রুকুতে ঝুকে তবে তার এই রাকাত ও ইমামের সাথে গণ্য হবেনা।

নামাযের তাদিলে আরকানসমুহঃ

ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাহির মতে, কেউ যদি নামাযের পাঁচটি জায়গায় ভুলে নয় জেনে বুঝে তাদিল এ আরকান বজায় না রাখে তবে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তারাফাইনের অর্থাৎ ইমাম আজম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মদ এর মতানুসারে ,নামায ফাসিদ হবেনা। তবে নামাযের অপূর্ণতা

এবং ইছাকৃত ওয়াজিব আদায়ের ক্রটি দূর করার জন্য নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। ভুলে এটি করলে **সাজদায়ে সাহু** করা জরুরি।

তাদিলে আরকান পালন না করার ছাব্বিশটি ক্ষতিঃ

১। এটি দারিদ্রের কারণ,

২। পরকালে উলামারা আপনাকে ঘৃণা করবে,

৩। আদালাত হতে বিচ্যুত হবে এবং পরবর্তীতে কোন সাক্ষি হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা থাকবেনা,

৪। যে জায়গায় এরুপ অপূর্ণভাবে আদায় করা হবে বিচার দিবসে নামায তখন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে,

৫। কেউ যদি অপরকে এরুপ করতে দেখে ও তাকে সংশোধন না করে তবে সে ও গুনাহগার হবে।

৬। নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। যা তাদিল এ আরকান এর সাথে আদায় করা হয়নি।

৭। এটি ইমান ছাড়া মৃত্যুর কারণ,

৮। এটি ব্যক্তিকে নামায চোর হিসাবে প্রমান করে,

৯। এরুপভাবে আদায়কৃত নামায বিচার দিবসে দাতের সামনে ঝুলন্ত পুরান ময়লার মত আবির্ভূত হবে,

১০। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা হতে বঞ্চিত হবে,

১১। আল্লাহর দরবারে করা আবেদন অপরিপূর্ণ হিসাবে গণ্য হবে,

১২। নামায এর অগনিত সওয়াব হতে বঞ্চিত হবে,

১৩। এতি অন্য আমলের মাধ্যমে করা সওয়াব ও ধ্বংস করে দেয়,

১৪। এটি ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম প্রাপ্তির কারণ হয়,

১৫। অজ্ঞ ব্যক্তি যারা আপনাকে অনুসরণ করে তারাও একই ভুল জিনিস শিখবে। সুতরাং আরও বেশি জন্ত্রনা ও শাস্তির হয়েছে,

১৬। ব্যক্তি নিজের ঈমানের বিরুদ্ধাচরণ করবে,

১৭। ইন্তিকালাতের সুন্নাতসমুহ মুছে যাবে,

১৮। আপনি এরুপ করার মাধ্যমে আল্লহর গজবকে আরও বাড়িয়ে দিবেন,

১৯। শয়তানকে সন্তুষ্ট করা হবে,

২০। জান্নাত হতে দূরত্ব বাড়বে,

২১। ব্যক্তি জাহান্নমের নিকটবর্তী হবে,

২২। নিজের নফসের প্রতি আরও বেশি নিষ্ঠুর হবে,

২৩। নিজের নফসকে অপরিচ্ছন্ন করবে,

২৪। ডান এবং বামের ফেরেশতাদের অসন্তুষ্ট করা হবে,

২৫। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামকে কষ্ট দেওয়া হবে,

২৬। আপনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের ক্ষতি সাধন করলেন। আপনার একটি গুনাহের জন্য বৃষ্টি এবং ফসল হবেনা, অথবা অসময়ে বৃষ্টি হবে, যা ফসলের উপকারের বিপরীতে ক্ষতি করবে।

দীর্ঘ পথের ভ্রমণে নামায

নেয়ামত ই-ইসলাম এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, লেখক হাজী মোহাম্মদ জিহনী রহমাতুল্লাহ, ১২৬২-১৩৩২ হিজরী-১৯১৪ খ্রি.) সবসময় এবং যে কোন জায়গায় সুন্নত নামায বসে আদায় অনুমোদনযোগ্য যদিও দাঁড়িয়ে আদায় করা সম্ভব। আপনি যখন বসে নামায আদায় করেন তখন রুকুর জন্য আপনার শরীর অবনত রাখুন। সিজদাহ্ জন্য আপনার মাথা জমিনে রাখুন (মেঝেতে অথবা জায়নামাযে)। যাই হোক, যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়াই বসে নামায আদায় করে (ইসলামে বর্ণিত কারণসমূহ ছাড়া) তাহলে, তাকে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের অর্ধেক ছওয়াব দেওয়া হবে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নত এবং তারাবীহ্ নামায নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত (উনিশ নম্বর অধ্যায়ের চতুর্থ অংশে তারাবীহ্ ও অফুরন্ত **নেয়ামত** সম্পর্কে দেখুন)। কোন একটি ভ্রমণে, শহুরে এলাকার বাইরে, কোন প্রাণীর   (যেমন ঘোড়া) পিঠের উপরে নফল নামায অনুমোদনযোগ্য। কিবলার দিকে মুখ ফিরানো অথবা রুকু, সিজদাহ্ করা বাধ্যতামূলক নয়। আপনি ইশারায় নামায আদায় করবেন। অন্যকথায়, আপনি আপনার শরীরকে অবনত করে রাখবেন। আপনি সিজদাহ্ জন্য আরেকটু বেশি অবনত হবেন। প্রাণীর শরীরের নোংরা, নামাযে কোন বিশেষ প্রভাব ফেলবেনা। কোন ক্লান্ত ব্যক্তি যদি জমিনে নামায আদায় করেন তবে কোন দন্ড বা খুঁটিতে

বা দেয়ালে হেলান দিয়ে আদায় করা অনুমোদনযোগ্য। হাঁটতে হাঁটতে নামায আদায় করা সহীহ হবেনা। অন্য কথায়, নামায গ্রহণযোগ্য হবেনা। ফরয এবং ওয়াজিব নামাযের ক্বাযা আদায় করা যায়, কোন প্রাণীর উপরে নিজ এলাকার বাইরে ভ্রমণের সময় নামায সংক্ষিপ্ত করণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি আপনার সহযাত্রী আপনাকে ত্যাগ করে এবং একা পশু থেকে অবতরণ ভয়ের কারণ হয়। আশেপাশে ডাকাতদের উপদ্রপ হয় যাতে আপনার প্রাণ, সম্পদ অথবা আপনার বাহন (প্রাণী) হারানোর ভয় থাকে। যদি কর্দমাক্ত জমিন হয়, প্রাণীটিকে নিয়ন্ত্রন করা অসম্ভব হয় অথবা একই রকম সমস্যা থাকে। যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রাণীটিকে কিবলামুখি করিয়ে নিন এবং নামায আদায় করুন। যদি তা সম্ভব নাহয় তাহলে প্রাণীটি যেদিকেই হাঁটুক নামায আদায় করে নিন। কোন একটি বাঁকে (কিবলা না জানা গেলে) নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও প্রাণীর উপরে নামায আদায়ের নিয়মগুলো প্রযোজ্য। প্রাণীটিকে যদি থামাতে হয় এবং কোন গাছের নিচে অবস্থান নিতে হয় তবে তা নামাযের জায়গা **শেরিরে** রূপান্তরিত হবে। (যেমনঃ টেবিল বা পালঙ্ক) যাতে করে জমিনের উপর নামায আদায় করা যায়। সেক্ষেত্রে আপনাকে কিবলার দিকে ঘুরে নামায আদায় করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর তাইয়্যার (রাঃ) [১] কে নৌকায়/ জাহাজে নামায পড়া শিখিয়েছেন যখন তিনি আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) যাত্রা করছিলেন এভাবে; ফরয অথবা ওয়াজিব নামায পাল তোলা (চলমান) জাহাজ/ নৌকায় আদায় করা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে নামায সংক্ষিপ্ত করণের কোন প্রয়োজন নেই। নৌকায় জামায়াতেও নামায আদায় করা যায়। চলন্ত জাহাজে ইশারায় নামায অনুমোদনযোগ্য নয়। রুকু ও সিজদাহ্ অবশ্যই করতে হবে। একই সাথে কিবলামুখি হয়ে নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক। আপনি নামায শুরু করার সময় কিবলামুখি হয়ে দাঁড়াবেন। একই সাথে নোংরা থেকে পবিত্রতা অর্জন নৌকায়/ জাহাজে বাধ্যতামূলক। (ছয় নম্বর অধ্যায়ের চার অংশ "নোংরা থেকে পবিত্রতার **অশেষ রহমত"** দ্রষ্টব্য)।

হানাফী মাযহাব মতে, চলন্ত নৌকায় বসে থেকে নামায আদায় করা যায় তবে নামায সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন নাই। সমূদ্রে নোঙ্গর ফেলা জাহাজ যদি অনবর্ত ঘূর্ণায়মান এবং নড়তে থাকে তবে তা চলমান জাহাজ বিবেচিত হবে। যদি সামান্য ঘূর্ণায়মান হয় তবে তীরের কাছাকাছি বিবেচ্য হবে। তীরের কাছাকাছি বিবেচ্য কোন জাহাজে বসে থেকে নামায আদায় করা যাবে না। শুধু দাঁড়িয়েও নামায আদায় সহিহ্ হবেনা। যদি সম্ভব হয় ডাঙ্গায় নেমে নামায আদায় কতে হবে। তীরে যেয়ে নামায আদায় করা প্রয়োজন। দূর্ঘটনার সম্ভাবনায় যদি আপনার সম্পদ বা জীবন বা জাহাজ/ নৌকা ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে চলন্ত জাহাজে/নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় অনুমোদনযোগ্য। এখানে আমরা **ইসলামের নেয়ামতের** দৃষ্টান্ত উল্লেখ শেষ করলাম।

[১] হযরত জাফর তাইয়্যার (রাঃ) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের চার পুত্রের একজন। তিনি হযরত আলি (রাঃ) এর দশ বছরের বড় এবং হযরত ইকায়েল থেকে দশ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি আবিসিনিয়া ভ্রমণ করেছিলেন এবং খাইবারের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। হিজরতের অষ্টম বছরে দামেস্কের সন্নিকটে মূ'তা নামক স্থানে তিন হাজারের বেশি সেনার শক্তিশালী বাইজেন্টাইনদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন। সেখানে অনেক আক্রমন করেন এবং একদিনে সত্তরের বেশি তীরের আঘাতে শহীদ হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র একচল্লিশ বছর। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের অতি সন্নিকটের সাতজন মানুষের একজন ছিলেন।

ইবনে আবিদ্বীনে উল্লেখ করা হয়েছে, দুই চাকার ঘোড়া চালিত বাহনে যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানো না যায়, প্রাণির সাথে না বেঁধে, গতিহীন/ গতিময় অবস্থায় নামায আদায় প্রাণির পিঠে নামায আদায়ের মত হবে। চার চাকার গাড়ি যখন গতিহীন তখন তা সমতল বিবেচিত হবে। যখন এটি চলতে শুরু করে ফরয নামাযটি প্রাণী পিঠে নামায সংক্ষিপ্ত করণের মত করে আদায় করতে হবে। এরপর বাহনটি থামিয়ে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে হবে। যদি বাহনটি থামাতে না পারেন তবে চলন্ত নৌকার নিয়মে নামায আদায় করতে হবে। যদি কোন সফরত (খুব দূরের ভ্রমণে আছেন যিনি) মেঝেতে বসতে বা কিবলামুখী হতে পারেন না, রাস্তার কারণে তিনি হানাফী অথবা মালিকী মাযহাবের যে কোন একটি অনুকরণ করবেন এবং যানবাহন থেকে নেমে ক্রমান্বয়ে কাযা নামায আদায়

করবেন। [১] মেঝেতে, চেয়ারে অথবা আরাম কেদারায় বসতে সক্ষম এমন মানুষের ক্ষেত্রে ইশারায় নামায আদায় গ্রহনযোগ্য নয়। বাসে বা উড়োজাহাজে নামাযের বিধান আর যানবাহনে নামায আদায়ের একই বিধান। যদি কোন ব্যক্তি দীর্ঘপথ ভ্রমণে মনস্থির করে এবং তিন দিনের বেশি পথে ভ্রমণের নিয়ত করে (১৮ প্যারাসাঙ্গ-প্রাচীন পারস্যের দৈর্ঘের মাপ ৫৪ মাইল অথবা ১০৪ কি.মি.) তবে তার বাড়ি, গ্রাম অথবা শহর তবে তার গ্রাম বা শহর ত্যাগের সময় থেকে তিনি সফরকারী গন্য হবেন। ইবনে আবিদ্বীনের মতে এক মাইল চার হাজার 'ধাহরা' এবং এক ধাহরা চব্বিশ বিঘত (এক বিঘত দুই সে.মি.)। শাফেয়ী এবং মালিকীর মতে ১৬ প্যারাসাঙ্গ = ৪৮ মাইল = ৮০ কি.মি।

[১] চতুর্থ অংশের *পঞ্চম অধ্যায়ে **'অশেষ রহমত'** দ্রষ্টব্য।*

তাকবীরে তাহ্‌রীমার ফজিলত

যখন কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে তাকবীরে তাহ্‌রীমা উচ্চারণ করে তখন তার পাপগুলো শরৎকালীন বাতাসে ঝরেপড়া পাতার মত ঝরতে থাকে। এক সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করছিলেন তখন এক ব্যক্তি এসে নামাযে যোগ দিল। কিন্তু সকালের নামাযে তাকবীরে তাহরীমা তার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেল। তিনি ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি একজন দাসকে মুক্ত করছিলেন। অত:পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, "হে নবী, আজ সকালের নামাযে তাকবীরে তাহরীমা পাইনি। আমি একজন দাস মুক্ত করছিলাম। আমার ইচ্ছে হয়, আমি কিভাবে তাকবীরে তাহরীমার সওয়াব অর্জনে সক্ষম হব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, **"তুমি তাকবীরে তাহরীমা সম্মন্ধে কি বলবে?"** তিনি উত্তরে বললেন, 'ইয়া রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার যদি চলিশটি উট থাকত যারা স্বর্ণালঙ্কার বোঝাইকৃত এবং আমি সবগুলো গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দিতাম তবুও ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমার সওয়াব অর্জন সম্ভব নয়। অত:পর দু'জাহানের নবী হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, **হে ওমর! তাকবীরে তাহরীমা সম্মন্ধে কি বলবে?"** হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "আমার যদি মক্কা থেকে মদিনার দূরত্বে এতগুলো উট থাকত, যারা স্বর্ণালঙ্কার বোঝাইকৃত এবং আমি সবগুলো গরীবদের মধ্যে দান করে দিতাম তবুও ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা আদায়ের সওয়াব অর্জন করতে পারতাম না"। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, **"হে ওসমান, তাকবীরে তাহরীমা সম্মন্ধে কি বলবে?"** হযরত ওসমান জিন্নুরাইন বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আমি যদি রাতে দু'রাকাত নামায আদায় করতাম এবং প্রত্যেক রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করতাম তবুও ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা আদায়ের সওয়াব অর্জন করতে পারতাম না"। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) ওয়াজহুকে প্রশ্ন করলেন, **"হে আলী, তাকবীরে তাহরীমা নিয়ে তুমি কি বলবে?"** তিনি এভাবে উত্তর দিলেন, "যদি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল অবিশ্বাসী মুসলিমদের ধ্বংস করে দেওয়া জন্য আল্লাহ আমাকে শক্তি দেন, তাদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সবাইকে পরাজিত করি; তবুও ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা আদায়ের সওয়াব অর্জন করতে পারব না"।

অত:পর রাসূলুলাহ বললেন, **"হে আমার উম্মত ও সাহাবীরা, যদি সাত স্তবক পৃথিবী এবং সাত স্তবক জান্নাত কাগজে, সমস্ত সমুদ্র কালিতে এবং সকল বৃক্ষ কলমে পরিনত হয় এবং সকল ফেরেশতা বর্ণনা করতে থাকে এবং তারা কেয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাকে তবুও তারা ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা আদায়ের সওয়াব লিখতে ব্যর্থ হবে**। আপনি বলতে পারেন, আল্লাহ কি এত পরিমানে ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন? উত্তরটি হবে- হ্যাঁ। মেরাজের রাতে যখন রাসূল জান্নাত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন তখন ফেরেশতারা জান্নাত-জাহান্নাম এবং বায়তুল মামুর (কাবা) পরিদর্শন করছিল এবং ফিরে যাচ্ছিল। রাসূল প্রশ্ন করেন, **হে আমার ভাই জীবরাঈল, ফেরেশতারা বায়তুল মামুর ভ্রমণ করে ফেরত আসছেনা তারা কোথায় যায়?** জীবরাঈল (আঃ) বলেন, "হে হাবিবুল্লাহ্ যেদিন আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিন থেকে আমি কখনো দেখিনি কোন ফেরেশতা বায়তুল মামুর পুনরায় পরিদর্শন করতে আসে। একবার কোন ফেরেশতা বায়তুল মামুর তওয়াফ করলে এবং ত্যাগ করলে, কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সে আর সুযোগ পায়না।

যখন কোন ব্যক্তি আয়ুযুবিলাহ এবং বিসমিলাহ পড়ে নামাজের সময়, আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা সেই বান্দাকে তার শরীরের সমস্ত চুলের পরিমান সওয়াব দেন। যখন বান্দা ফাতিহা শরিফ পাঠ করে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআ'লা সেই

বান্দাকে একটি কবুল হজের সওয়াব দান করেন। যখন সেই বান্দা রুকুর জন্য অবনত হয়, আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা সেই বান্দাকে এক হাজার স্বর্ণমূদ্রা দান করার সমান সওয়াব দান করেন। যখন সে বান্দা তসবিহ পড়ে 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আজিম' (তিন বার) আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা সেই বান্দাকে আসমানী চারটি কেতাব এবং আরোও একশত কেতাব (সহিফা) পড়ার সমান সওয়াব দান করেন। যখন সে বলে, **সামি আলাহুলিমান হামিদা** (যখন রুকু থেকে দাঁড়ায়) আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআ'লা সেই বান্দাকে রহমতের সাগরে অচ্ছন্ন করে দেন। যখন সে সিজদায় যায়, আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে সমস্ত মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি সওয়াব দান করেন। যখন সে তসবিহ পাঠ করে (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) তিনবার আল্লাহ তাআ'লা অনেকগুলো রহমত/নেকি দান করেন। যার অল্প কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

[১] ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ **'অশেষ রহমত'** অংশ মেরাজের জন্য দ্রষ্টব্য।

প্রথম নেকি/রহমত হলো তিনি বান্দাকে আরশ এবং কুরশির সমপরিমান সওয়াব দান করবেন। দ্বিতীয়, আল্লাহ তাআ'লা সেই বান্দাকে ক্ষমা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। তৃতীয় রহমত হলো, বান্দাটি যখন মারা যায়, তখন মিকাঈল (আঃ) কেয়ামত পর্যন্ত (নিয়মিত) তা কবর পরিদর্শন করেন। চতুর্থ কেয়ামতের দিন মিকাঈল (আঃ) সেই বান্দাকে তাঁর পবিত্র ডানার উপর নিবেন, তার জন্য সুপারিশ করবেন এবং জান্নাত পর্যন্ত বহন করবেন। পঞ্চমতঃ ব্যক্তিটি যখন ক্বাদা-ই-আখিরার জন্য বসবে (চুড়ান্ত হিসাবের জন্য) আল্লাহ তাআ'লা ব্যক্তিটিকে ফাকির-ই সাবেরিনদেও সমান সওয়াব দিবেন। ফাকির-ই-সাবেরিনরা আগনিয়া-ই-শাখিরিনদের (ধনী এবং কৃতজ্ঞ মুসলিম যারা) থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন আগনিয় শাখিরিনরা অবগত হবে তারা বলবে, হায়! আমরা যদি ফাকির-ই সাবেরিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম দুনিয়াতে!

কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতা আসবে তোমার কাছে; "তুমি কি নামায আদায় করেছিলে সঠিকভাবে? তারা বলবে। তুমি কি মনে কর মৃত্যু থেকে তোমার পরিত্রাণ আছে? তিক্ত শাস্তি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য; তারা বলবে।

জান্নাত ই আলিয়া (জান্নাতের মহামান্বিত বাগিচা)

জান্নাতের আটটি বাগিচার জন্য আটটি দরজা এবং আটটি চাবি আছে। প্রথমটি হলো ঈমান (বিশ্বাস), বিশ্বাসীরা যারা ঈমান আনে, নামাায। আদায় করে (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাায]। দ্বিতীয়টি হলো বিসমিল্লাহ্-ই- শরিফ (বলা, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম)। পরবর্তী ছয়টি ফাতিহা শরিফের (কোরআনের প্রথম সুরা আল-ফাতিহা) মধ্যে। আটটি জান্নাত হলো ঃ

১. দ্বার-ই- জালাল ⟶ সাদা নুরের তৈরি
২. দ্বার-ই-কারার ⟶ লাল রুবির
৩. দ্বার-ই-সালাম ⟶ সবুজ বৈদুর্য্য মনির তৈরি
৪. জান্নাতুল খুলদ ⟶ প্রবালের তৈরি
৫. জান্নাতুল মাওয়া ⟶ রূপার তৈরি
৬. জান্নাতুল আদান ⟶ স্বর্ণের তৈরি
৭. জান্নাতুল ফেরদাউস ⟶ স্বর্ণ ও রূপা উভয়ের তৈরি
৮. জান্নাতুন নাঈম ⟶ লাল রূবির তৈরি

[১] একুশ নম্বর অধ্যায়ে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ **"অশেষ রহমত"** অংশ দ্রষ্টব্য।

[২] নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমদের অতীতে যা সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বাসীরা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তারা কখনো বের হবেনা। সেখানকার হুরদের কখনো মাসিক /ঋতুস্রাব হবেনা এবং তাদের ইচ্ছা খেয়াল-খুশি এবং প্রবৃত্তি অপূর্ণ থাকবেনা। যেকোন ধরনের খাবার ও পানীয় তাদের ইচ্ছা হওয়ার পূর্বেই তাদের সামনে প্রস্তুত থাকবে। তারা রান্না ও আবর্জনার মত দূর্ভাবনা থেকে দূরে থাকবে। পাখিরা তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে থাকবে। বিশ্বাসীরা তাদের আবাস স্থলে বসে সেগুলো দেখতে পাবে। আমরা যদি পৃথিবীতে থাকতাম এবং তুমি যদি আমার খুব কাছে আসতে, আমি তোমাকে রোষ্ট করতাম। এই ইচ্ছা তাদের হৃদয়ে হওয়ার সাথে সাথে নূরের তৈরি থালায় সদ্য রোষ্ট হওয়া পাখি খেতে থাকবে তারা। (পাখিটি খাওয়ার পর) বিশ্বাসীরা হাড়গুলো কোন জায়গায় একত্রিত করবে এবং হৃদয়ে ইচ্ছের উদ্রেক হবে হাড়গুলো যদি পাখিতে পরিনত হয়। যে মুহূর্তে এই ইচ্ছা তাদের হৃদয়ে হবে ঠিক তার পূর্বেই হাড়গুলো পাখিতে পরিনত হবে এবং নতুন পাখিটি উড়ে যাবে।

জান্নাতের মাটি কস্তুরির তৈরি এবং ভবনগুলো রৌদ্রপবাক ইষ্টক দ্বারা তৈরি। একটি স্বর্ণ একটি রোপ্য পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটি মানুষকে একশতটি মানুষের শক্তি দান করা হবে জান্নাতে। প্রত্যেকজনকে অন্তত সত্তরজন হুর এবং বিশজন দুনিয়ার নারী প্রদান করা হবে। জান্নাতে চারটি জলপ্রবাহ থাকবে। একই উৎস থেকে প্রবাহিত তারা। প্রবাহ এবং স্বাদে ভিন্ন। তাদের একটি বিশুদ্ধ পানির, দ্বিতীটি খাঁটি দুধের, তৃতীয়টি জান্নাতের পানীয়ের, চতুর্থটি নির্ভেজাল মধুর। জান্নাতে অনেক বাগানবাড়ি থাকবে। তারা নিচে মোড় নিবে, বিশ্বাসীরা সেখানে চারণ করবে এবং ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যেতে পারবে (পৃথিবীর চলন্ত সিঁড়ি এবং উড়োজাহাজ সদৃশ, আজকের মত)। জান্নাতে তুবা নামের একটি বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের মূলগুলো উপরের দিকে এবং শাখা ও কান্ড নিচের দিকে। এটি পৃথিবীর চাঁদ এবং সূর্য সদৃশ।

জান্নাতবাসিরা তাদের খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবে এবং স্বাদ নিবে যা তাঁরা খাবে এবং পান করবে কিন্তু তাদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার প্রয়োজন অনুভব করবেনা। তাঁরা সব ধরনের মানবীয় প্রয়োজন এবং কষ্টের উর্ধ্বে। আলাহ্ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের সম্বোধন করবেন, জান্নাতের বিশ্বাসীরা; **"হে আমার দাসেরা, তোমরা আর কি চাও আমার কাছে? যাও এবং আনন্দ উপভোগ করো"**।

দাসেরা উত্তর দিবে, " ইয়া রব্বি, আপনি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। আমাদের অনেক হুর, গেলেমান দিয়েছেন এবং সকল ইচ্ছা পূরণ করেছেন। আরোও অধিক চাওয়া হতবুদ্ধিতার হবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের বলবেন: **"হে আমার বান্দারা ! আমার কাছে চাওয়ার মত আরো একটি জিনিস আছে তোমাদের এবং তা অন্য সব কিছুর চেয়ে অতুলনীয়**।„ যখন বান্দারা উত্তর দেবে, "হে রাব্ব! আমাদের আর কিছু চাওয়ার মত মুখ নেই। আমরা জানিনা অরোও কি চাওয়া যায়,তখন রাব্বুল আলামিন তাদের জিজ্ঞেস করবেন, **"হে আমার বান্দারা, তোমরা যখন পৃথিবীতে কোন বিষয়ের সম্মুখীন হতে তখন সাধারনত কি করতে?**। যখন তারা উত্তর দেবে যে তারা সাধারনতঃ ওলামাদের জিজ্ঞেস করতেন এবং তারা বিষয়টি জেনে তাদের সমস্যার সমাধান দিতেন। হযরত হক্ক সুবহানু তাআ'লা বলবেন, **"এখনও একই কাজ কর এবং ওলামাদের সাথে পরামর্শ করে জ্ঞানীদের অন্তরভুক্ত হও**। তাই ওলামারা বিশ্বাসীদের বলবেন,

"তোমরা কি আলাহর সৌন্দর্যের কথা ভুলে গেছো? যখন তোমরা পৃথিবীতে ছিলে, তখন আকুল আকাঙ্খা প্রকাশ করতে (আলাহকে দেখতে) এবং বলতে; অত:পর আমাদের রব যিনি অতন্ত উচ্চ মর্যাদার, তিনি আমাদের তাঁর সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য দান করবেন। তোমরা এখন সেটাই চাইতে পার"। অত:পর তারা রাইয়াত-ই-জামালুল্লাহর (আল্লাহর সৌন্দর্য দেখতে চাইবে) জন্য বলবে এবং আল্লাহ আজিম-এ-শানমুক্ত এবং প্রকট হবেন। তাঁর মর্যাদার এবং তাঁর জামাল-ই-বাকামাল (সৌন্দয) অবলোকনের সুযোগ দিবেন। তারা যখন হক্ক তাআ'লার জামাল-ই-পাক দেখবে, তাদের সে স্মৃতি কয়েক হাজার বছর স্থায়ী হবে।

একজন বিশ্বাসীর আবাসস্থলে তাকে ঘিরে এবং তার জানালায় ফলমূল থাকবে। যখন সে চিন্তা করবে, "গাছের ডালটি টেনে আমার কাছে আনা হোক, ফলটি পাড়ি এবং এটি খাই"। তাকে তার আসন থেকে উঠে ডালটি টানার প্রয়োজন হবেনা। অনতিবিলম্বে যেখানে সে বসে আছে সেখানে সেটি চলে আসবে। সে ফলটি নেবে এবং তার মুখে দিবে এবং সেটির স্বাদ তার গলা পর্যন্ত নামার আগেই অন্য একটি ফল হাজির হবে ঠিক যেখান থেকে সে প্রথম ফলটি নিয়েছে। যখন সে ফলটি মুখে নিবে সেটি পেকে যাবে এবং সুস্বাদু হবে। এইভাবে রাব্বুল ইজ্জাত আরেকটি তাজা ফল তৈরি করবেন।

যদি তুমি জ্ঞানী হও, নামায আদায় করো, এটি সুখের কারণ। তোমার জানা উচিত যে, বিশ্বাসীদের কাছে এটি মেরাজ।

সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা (কাযা নামায)

নামায যদি তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয় তবে তা অনেক ফজিলতপূর্ণ হয়। সঠিক সময়ে নামায আদায় এর ফজিলত নিম্নে আলোচিত হলো।

১. এটির প্রথম ফজিলত হলো সঠিক সময়ে নামায আদায়কারীর চেহারা নুরানী হবে।

২. সঠিক সময়ে নামায আদায়কারীর জীবন বরকতপূর্ণ হবে।

৩. সঠিক সময়ে নামায আদায়কারীর উচ্চারিত দোয়া কবুল হবে।

৪. সঠিক সময়ে নামায আদায়কারী একজন খায়ের (উত্তম) ব্যক্তিতে পরিনত হবে।

৫. সঠিক সময়ে নামায আদায়কারীকে বিশ্বাসীরা ভালবাসে।

কোন ওজর ছাড়াই নামায বাদ দিলে, ইসলামের অনুমোদিত কারণগুলো ছাড়া নির্ধারিত সময়ের বাইরে নামায আদায় করলে পনেরটি ক্ষতি হয়। এসবের মধ্যে পাঁচটি ক্ষতি হয় পৃথিবীতে, তিনটি হয় মৃত্যুর সময়, তিনটি কবরে এবং চারটি হয় আখিরাতে।

পৃথিবীর পাঁচটি ক্ষতি

১. ব্যক্তির চেহারায় কোন নূর থাকবেনা।

২. তার জীবনে কোন বরকত থাকবেনা।

৩. তার প্রার্থনা এবং দোয়া কবুল হবেনা।

৪. তার মুসলিম ভাইদের জন্য করা দোয়া কবুল হবেনা।

৫. তার কোন ভাল কাজের সওয়াব সে পাবেনা।

মৃত্যুর সময়ের ক্ষতি হলো

১. সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাবে।

২. সে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যাবে।

৩. সে অপ্রীতিকর অবস্থায় মারা যাবে। যে কোন পরিমান খাদ্য তার ক্ষুধা মেটাতে পারবেনা। যে কোন পরিমান পানি তার তৃষ্ণা মেটাতে পারবেনা।

কবরের তিনটি ক্ষতি হলো

১. কবর তাকে নিষ্পেষণ করবে, যাতে করে তার হাড়গুলো একত্রে পাকিয়ে যায়।

২. তার কবরের চারদিকে আগুন থাকবে।

৩. একটি আগুনমুখী সাপ তার উপরে পড়বে। সাপটির নাম আকরা। এটি তার মাথার উপর একটি চাবুক ধারণ করবে। চাবুকের একটি আঘাতে ব্যক্তিটি পৃথিবীর অতল গভীরে নেমে যাবে। সে পুনরায় উঠে আসবে পুনরায় আঘাত পাওয়ার জন্য। এই আঘাত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যাতে করে ব্যক্তিটি শেষদিন পর্যন্ত নির্যাতিত হয়।

আখিরাতে চারটি ক্ষতি হলো

১. সে গুরুতর বিচারের সম্মুখীন হবে।

২. সে আল্লাহর যথাযোগ্য শাস্তির সম্মুখীন হবে।

৩. সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৪। তার সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতি থাকবে।

প্রথমটি হলো ব্যক্তিটি আল্লাহর শাস্তিযোগ্য।

দ্বিতীয়টি হলো ব্যক্তিটি আল্লাহ তাআ'লার রহমতের সকল অধিকার নষ্ট করেছে।

তৃতীয়টি হলো যেহেতু ব্যক্তিটি আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লার রহমতের সকল অধিকার নষ্ট করেছে সেহেতু আল্লাহ্ তাআ'লার ক্ষমা থেকে সে অনেক দূরে।

নামায ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তবে তার বিশ্বাসের দূর্গের মূল স্তম্ভ গঠিত হবে। এভাবে তার ভিতরে একটি আশ্রয়স্থল তৈরি হবে। কোন ব্যক্তি যদি এক রাকআত নামাযও জ্ঞাতসারে বাদ দেয় এবং কাযা আদায় না করে (পরবর্তীতে না পড়ে নেয়) প্রত্যেকটি মাযহাবের ফতোয়া মোতাবেক তাকে মেরে ফেলতে হবে। তবে হানাফী মতে তাকে মেরে ফেলার প্রয়োজন হবেনা। যাই হোক, সে একটি গুরতর পাপ করবে যা আকবর-ই-কাবির (কবিরা গুনাহ)। লোকটি নামায (তার দৈনিক নামায) আদায় করা শুর না করা পর্যন্ত' তাকে জেলে আটকিয়ে রাখার প্রয়োজন হবে। একজন ব্যক্তি যে নামাযকে তাচ্ছিল্য করে কারণ সে নামাযের গুরত্বের দিকে লক্ষ্য করেনা এবং নামায (বিশ্বাসীদের) প্রথম কর্তব্য বিষয়টি বিশ্বাস করেনা, সে অবিশ্বাসীতে পরিনত হয়।

কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি নামায (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের) জ্ঞাতসারে বাদ দেয় এবং পবর্তীতে কাযা আদায় করে (যদিও সে তার নামাযে পরবর্তীকালে মনোযোগ দেয়) কিছু সময়ের জন্য তাকে 'হুকবা' নামক জাহান্নামে পুড়তে হবে, আশি বছর। এই শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য তাকে তওবা এবং মিনতির সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। একদিন হবে দুনিয়ার হাজার বছরের সমান, বছরকে একইভাবে হিসাব করতে হবে। মোহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন রহমতুল্লাহ্ আলাইহি তাঁর **রাদ্দুল-মুহতার** কিতাবে উল্লেখ করেন, " যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ নামায প্রত্যেকটি দীনের উপর আদেশ ছিল। আদম (আঃ) শেষ বিকেলে নামায (দৈনিক) আদায় করতেন। ইয়াকুব (আঃ) সন্ধ্যায় (সূর্যাস্তের পর) নামায (দৈনিক) আদায় করতেন এবং ইউনুস (আঃ) রাতে (দৈনিক) নামায আদায় করতেন।

যেমনটি ফরয এবং হারামের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করা ঈমানের নীতি তেমনি নামায (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত) আদায় করা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এই বিশ্বাস করাটাও ঈমানের নীতি। যা হোক, নামায আদায় করা ঈমানের নীতি নয়। মেরাজের রাতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে (ইসলামী হুকুম/আদেশ)। **মুকাদিমা-উস-সালাম** এবং **তাফসির-ই-মাযহারী** ও **হালাবী-ই-**

কাবির কিতাবে হাদিস শরিফ উল্লেখ করা হয়েছে এমনটা; **"আমাদের দু'জনের মধ্যে জীবরাইল (আঃ) ইমাম হয়ে দু'দিন ব্যাপি নামায আদায় করেছি, কাবা শরিফের দরজার পাশে। আমরা দু'জন সকালের নামায ফজর আদায় করেছি যখন ভোর সকালের পূর্বে। দুপুরের নামায আদায় করেছি যখন সূর্য পৃথিবীর মধ্যরেখা পার করেছে। বিকেল পরবর্তী নামায যখন কোন একটি দন্ডের ছায়ার পরিমান তার মধ্যদুপুরের ছায়া এবং তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যার নামায (যখন সূর্যের শেষ প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যায়) এবং রাতের নামায যখন সূর্যের ক্ষীণ আলো অন্ধকারাচ্ছন্নে পরিনত হয়। দ্বিতীয় দিনে আমরা সকালের নামায যখন গোধূলী পরিনত হলো তখন আদায় করলাম। পূর্ব দুপুরের নামায যখন কোন একটি দন্ডের পরিমাপের একই পরিমান ছায়া তৈরি হলো; তার কিছুক্ষণ পরেই বিকেলের নামায, সন্ধ্যার নামায রোযা ভাঙ্গার বর্ণিত একই সময়ে এবং রাতের নামায রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশের শেষে। অতপর তিনি বলেন, " হে মোহাম্মদ, এগুলো আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীদের জন্য নামাযের সময় (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত)। আপনার উম্মতদের আমাদের উভয়ের দুটি সময়ের মধ্যে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেকটি আদায় করতে বলুন।**

আমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার উপর তাদের সাত বছর বয়সী সন্তানদের আদেশ করার বিধি আরোপিত হয়েছে এবং দশ বছর বয়সে নামাজ আদায় না করলে হাত দিয়ে প্রহার করার নির্দেশ আরোপিত হয়েছে। কোন অধীনস্থ/শিষ্যকে তিনবারের বেশি প্রহার করা এবং লাঠি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। একই প্রহার সন্তানকে রমযানের রোযা রাখার জন্য এবং মাদকদ্রব্য থেকে দূরে রাখার জন্য প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি ফরজ নামায আদায় করা এবং এটি মুসলমানদের প্রাথমিক কর্তব্য অস্বীকার করে, সে অবিশ্বাসীতে (কাফির) পরিনত হয়। আর যদি সে অলসতার কারণে নামায আদায় না করে (যদিও সে বিশ্বাস করে এটি ফরয) সে একজন **ফাসিক** মুসলিম হয়ে যাবে। যতক্ষণ না সে নামায আদায় শুরু করে তাকে কারারুদ্ধ আবস্থায় রাখতে হবে। কোন প্রকার ক্ষমা বা রেহাই ছাড়াই এটা করতে হবে। যদি সে নামায আদায় শুরু না করে (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত) তাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারারুদ্ধ রাখতে হবে। অন্যান্য চিন্তাবিদদের মতে, তাদেরকে প্রহার করতে হবে যতক্ষণ না রক্তাক্ত হয়ে যায়। শাফি এবং মালিকী মাযহাবের মতে, কোন ব্যক্তি যদি একবার নামায ছেড়ে দেয় সে অবিশ্বাসী হয়ে যায় না, কিন্তু অতপর তাকে

শাস্তি স্বরুপ মেরে ফেলতে হবে। হানাফী মাযহাবের মতে, সে একজন অবিশ্বাসীতে পরিনত হয়, তাকে মেরে ফেলতে হবে। অনেক চিন্তাবিদরা শাফী মাজহাবের এই ইজতিহাদে একমত হয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি জমায়াতে নামায আদায় করে তাহলে তিনি মুসলিম হিসেবে পরিগনিত হবেন। অন্যান্য (পূর্ব) বিধানে জমায়াতে নামায আদায় ছিলনা। বিশ্বাসীরা একাকী নিজেরাই নামায আদায় করত। তারা আরেকটি প্রার্থনার অংশ 'হজ'ও আদায় করতো। কারণ, নামায এমন একটি ইবাদতের মাধ্যম যা শুধু শারীরিকভাবে আদায় করতে হয়। একজন বিশ্বাসী অন্য একজন বিশ্বাসীর হয়ে নামায আদায় করতে পারে না। কিন্তু যাকাত এমন একটি ইবাদতের মাধ্যম যা সম্পদের মাধ্যমে আদায় হয়। কোন ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়াই অন্য কোন ব্যক্তিকে তার যাকাত (যাকাত দানকারীর) তার সম্পদ ব্যবহার করে যাকাত প্রদান করতে বলতে পারে। হজ হচ্ছে এমন একটি ইবাদত এর বিধান যা শারীরিকি ও আর্থিক উভয়ভাবে আদায় করতে হয়। যে ব্যক্তির কোন ওজর আছে (কোন কিছু যা হজ করতে বাধা দেয়) তিনি কোন ব্যক্তিকে তার অর্থ দিয়ে হজ করিয়ে নিতে পারেন বা হজ করতে নিযুক্ত করতে পারেন। একজন খুবই বৃদ্ধ মানুষ যিনি রোযা করতে পারেনা পুরো জীবনব্যাপি তিনি গরীব মুসলিমদের প্রত্যেকটি রোযার (যেগুলো তিনি আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন) জন্য ফিদিয়া আদায় করবেন। নামাযের বদলে ফিদিয়া আদায় অনুমোদনযোগ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তি শেষ সময়ে নামায আদায় করতে অক্ষম হয় তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে (আদায় না করা নামাযের জন্য) ফিদিয়া আদায় করা ভাল। যদি তার রেখে যাওয়া সম্পদ ইসকাত আদায়ের জন্য অপ্রতুল হয় তবে **'দাওর'** আদায় করা গ্রহনযোগ্য হবে। প্রথমতঃ এটির জন্য ইসকাত আদায় করা ওয়াজিব। (একুশ নম্বর অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ **"অশেষ রহমত"** দ্রষ্টব্য)

গ্রীষ্মকালে উত্তরের দেশগুলোতে যেখান সন্ধ্যার কালচে রঙ খুব দ্রুত সম্পূর্ণ অন্ধকারে পূর্ণ হওয়ার পরপরই ফজরের সময় হয়ে যায়, যার অর্থ সকাল এবং রাত্রির নামাযের সময় কখনো শুরু হয়না, এই দুই নামায হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আদায় করা প্রয়োজন। ইমাম শাফী রহমতুল্লাহ ইজতিহাদ অনুসন্ধানে বের করেছেন, এই দুই নামায অবশ্যই আদায় করতে হবে। অধিকাংশ ইসলামী আলেমদের মতে, সকাল ও রাতের নামায আদায় করতে হবেনা। কাযাও আদায় করতে হবেনা। (অন্য কথায়, পরবর্তি সময়ে তাদেরকে এই দুই নামায পুনরায়

আবার আদায় করতে হবেনা)। উভয়ের যেকোনটি আদায়ের আদেশ আসেনি ঐ যথাবিহিত সময়ের জন্য। যে নামাযের সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি তা আদায় করা ফরয নয়। রোযার ক্ষেত্রে এমনটি নয়। যখন কোন দেশে নতুন চাঁদ দেখা যায়, তখন সেদেশে রমযান শুরু হয়।

কোন একটি ফরয আদায়ের সময় আপনার যদি **'হারাজ'** এর উদ্রেক হয় অথবা কোন একটি হারাম এড়িয়ে যান তবে আপনার কর্তব্য অন্য একটি মাযহাব আনুসরণ করা (তিনটি মাযহাবের যেকোন একটি) যাতে করে হারাজ না থাকে। হারাজ অর্থ কষ্টের সাথে কোন কিছু করা বা কোনভাবেই না করতে পারা। যদি কোনভাবে তিনটি মাযহাবের একটিও হারাম থেকে মুক্ত নাহয়, অন্যতর হারামের কারণ কিছু সময়ের জন্য হয় তাহলে আপনি হারাম এড়িয়ে যাওয়া অথবা ফরয আদায় করা থেকে অব্যহতি পাবেন। (১) যদি এটি কিছু সময়ের জন্য বিদ্যমান না হয় তবে হারামের কারণ ছাড়া আপনার পরিত্রাণের কোনভাবেই উপায় নেই। (**'অশেষ রহমত'** এর চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন)

একজন মুসলিম যিনি বিলম্ব করেছেন সকালের নামাযে, সুন্নত নামায বাদ দিবেন কারণ পাছে জামাত ধরতে না পারেন। সুন্নত নামায বাদ দেয়ার অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ এইযে, পাছে ফরয নামাযের সময় শেষ হয়ে যায়। যদি তিনি জামাআত ধরতে সক্ষম হবেন (ধারনা করেন), তাহলে তিনি মসজিদের বাইরে অথবা কোন খুঁটির আড়ালে (মসজিদের ভিতরে) সুন্নত নামায আদায় করবেন। কোন কারণে যদি উপযুক্ত জায়গা না থাকে (নামায আদায়ের জন্য) তবে জামাআতের কাছে আদায় না করে সুন্নত বাদ দিতে পারেন। কোন একটি মাকরুহ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুন্নতের বিধান বাদ দিতে হবে।

[১] একটি 'জরুরাত' (অনিচ্ছাকৃত) প্রয়োজন যা আপনাকে কিছু করতে বাধ্য করে আথবা কিছু এড়িয়ে যেতে সুযোগ করে দেয়। উল্লেখ্য, একটি অবস্থা যা আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। কোন ওজরের কারণে ফরয নামায আদায় করা নাহলে তাকে বলে **ফাওয়াত** যার অর্থ সমস্যার কারণে নামাযগুলো পড়তে ব্যর্থ হয়েছেন (নির্ধারিত সময়ে)। আলস্যের কারণে অথবা ওজর ছাড়াই নামায বাদ দিলে তাকে বলা হয় **মাতরুকাত** যার অর্থ যেগুলো আপনি ওজর ছাড়াই বাদ দিয়েছেন। 'ফিকাহ্' পন্ডিতেরা এই বিষয়টিকে কাযা হিসেবে উল্লেখ করেছেন **'ফিয়াতাস'** (ফাওয়াত), বাদ দেওয়া নামায না বলে। কোন ওজর ছাড়াই নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করলে তা গুরুতর পাপ। শুধু কাযা আদায় করেই এই পাপ

থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে না (পরবর্তীতে নামায আদায় করে)। এছাড়াও তাকে হজ-ই- মাবরুর করতে হবে। যখন কাযা আদায় করা হয় (যখন পরবর্তীতে পূর্বের বাদ যাওয়া নামায আদায় করা হয় এবং দায়িত্ব পালন করা হয়) তখন তার নামায বাদ দেওয়ার পাপ মাফ করে দেওয়া হয়, নামায আদায় না করার নয়। কাযা আদায় করা ছাড়া তওবা করলে (দায়িত্ব পালন না করলে) তা সহিহ্ হবেনা (তওবা কবুল হবেনা)। তওবাকৃত পাপ ত্যাগের শর্তাধীনে মাফ হয় (যে পাপের জন্য তওবা করা হচ্ছে)।

নামায পিছিয়ে দেওয়ার পাঁচটি ওযর রয়েছে যতক্ষণ না নির্ধারিত সময় শেষ হয়।

১. যদি কোন ব্যক্তিকে শত্রুর সম্মুখীন হয়, তাহলে সে নামায আদায় করতে পারেনা। এমনকি বসে, কিবলামুখি হয়ে অথবা প্রাণীতে সওয়ার হয়ে।

২. একজন মুসাফির (একজন ব্যক্তি লম্বা দুরত্বে ভ্রমন করলে তা সফর) এর যদি চোর, শিকারি বা ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. যদি গর্ভবতী নারীর সন্তানের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. কোন ব্যক্তি ভুলে গেলে।

৫. কোন ব্যাক্তি ঘুমিয়ে গেলে।

হানাফী মাযহাবের এটি একটি **আদা** যে তাকবীরে তাহ্রীমা দেয়া এবং শাফি মাযহাবের মতে নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে এক রাকআত নামায বেশি আদায় করা। ফরয নামাযের কাযা আদায় করা ফরয। ওয়াজিব নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব। যদি কোন ব্যক্তি সুন্নত নামাযের কাযা আদায় করেন তবে সুন্নত নামাযে সওয়াব পাবেন। ফরয অংশে 'আদা' করার সময় প্রাধান্য অনুযায়ী পালন করা প্রয়োজন এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কাযা আদায় করার সময় তা পালন করা বুদ্ধিদীপ্ত হবে। এ নিয়মগুলো প্রার্থনার সময় যখন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন প্রযোজ্য নয়। অন্যকথায়, চলতি নামায কাযা করার জন্য ফেলে রাখা যাবেনা (বাদ দেওয়া যাবেনা) পূর্ববর্তী নামাযের কাযা আদায়ের জন্য (পূর্ববর্তী সময়ের নামায যা আপনি বাদ দিয়েছেন)।

*[১] কোন নামায **'আদা'** করা অর্থ কোন একটি নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। কোন নামায **কাযা** আদায় করার অর্থ কোন নামাযের সময় শেষে তা আদায় করা।*

অন্য একটি ঘটনা যা একই নিয়মগুলো বাতিল করে দেয়। আপনার ফিয়াতা নামাযের ক্ষেত্রে (যে নামাযগুলো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন বা বাদ দিয়েছেন) অথবা

ফিয়াতা নামাজের ক্ষেত্রে তা ছয়ে পরিনত হয়। তারতীব (পাঁচটি নামাজের নিয়ম) এর পুনরাবৃত্তি হবেনা যদি তাদের সংখ্যা ছয়ের নিচে নেমে যায়। যদিও তারতীব নিরীক্ষণ না করে ফরয নামায আদায় করলে তা ফাসিদ হয়ে যাবে (যার অর্থ হলো এগুলো গ্রহনযোগ্যতা হারাবে)। যদি তাদের সংখ্যা ছয় হয়ে যায় তবে তাদের সবগুলো সহীহ্ (গ্রহনযোগ্য) হবে, যেমন পঞ্চমটির সময় শেষ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ধরা যাক, কোন ব্যক্তি সকালের নামায আদায় করেনি, পরবর্তী এবং শেষ বিকেলের, সন্ধ্যার, রাতের এবং বিতরের নামায আদায় করে (সকালের নামায আদায় করা ছাড়া) যদিও সে মনে রাখে যে সে সকালের নামায আদায় করেছিল না, কোনটিই সহীহ্ হবেনা। তার সবকিছু সহীহ হবে যখন পরবর্তী সূর্যদয় হয়।

ফিয়াতা হচ্ছে সবচেয়ে নিকটবর্তী নামাযের কাযা আদায় করা। শুধুমাত্র এগুলো বিলম্বিত করা অনুমোদিত হবে যদি আপনার পরিবারের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নত আদায় হয়েছে এবং দোয়া, তাসবিহ্ ও তাহিয়াতুল মসজিদ নামায আদায় করা হয়েছে। ইবনে আবেদীন যেমনটা উলেখ করেছেন, আধ্যায়টিতে যেখানে তিনি আত্মশুদ্ধির সুন্নতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'অনুমোদিত' অর্থ আবশ্যক নয়। মাকরুহ্ তানযিহি সম্পর্কে বলা হয়েছে (ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে) 'অনুমোদিত'। বড় অর্থে 'অনুমোদিত' হচ্ছে (জায়েয) কাজগুলো করার প্রয়োজন নেই এবং কাযা নামাযে সেরকম সুন্নত নামাযের কারণে বিলম্ব করা যাবেনা। রমযানের রোযা করতে ব্যর্থ হলে তাড়াহুড়া প্রয়োজন নেই।

একজন ব্যক্তি যিনি দারুল হারবে (যে দেশে অবিশ্বাসীদের) ইসলাম কবুল করেন, কিন্তু তিনি নামায, রোযা, যাকাত (যেমন ফরয নামাযগুলো) নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে পারেননি এগুলো সম্পর্কে না জানার কারণে, তাকে কাযা আদায় করতে হবেনা। যাহোক, ফরয কাজগুলো সম্পর্কে এবং কোন কাজগুলো হারাম না জানা, দারুল ইসলামে (যে দেশে মুসলিমদের বসবাস) বসবাসরত মানুষদের কোন ওজর নয়। যদি কোন মুরতাদ (যে ধর্মত্যাগী ইসলাম ত্যাগ করেছে) আবার বিশ্বাসী হয়ে যায়, তাকে কাযা নামায আদায় করতে হবে না যা সে ধর্মত্যাগী অবস্থায় আদায় করেনি। এজন্য যে, ইসলাম অবিশ্বাসীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেনা। যদি কোন সাবি (একটি শিশু বয়ঃসন্ধিকালের এবং যার উপরে ইসলামের

হুকুম বর্তিত হয়না) রাতের নামায আদায় করে (অতপর ঘুমাতে যায়) অতপর যদি তার স্বপ্নদোষ হয় এবং ফজরের পরে ঘুম থেকে ওঠে (শেষ সময়ে) পরবর্তী সকালে, তাকে কাযা নামায আদায় করতে হবে (রাতে যে নামায পড়েছে)। যে নামায সে আদায় করেছে (গত রাতে) তা নফল। যেহেতু সে ঘুমিয়েছে এটা তার জন্য ফরয হয়ে গেছে। [১] সবগুলো বিষয় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে **'অশেষ রহমত'** ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বিভিন্ন অংশে।

যদি আদায় না করা কোন নামায থাকে স্বাস্থ্যবান হওয়ার পরেও সেগুলোর কাযা আদায় করা অনুমোদনযোগ্য তাইয়্যামুম (ইশারায় নামায আদায় করা) এবং ইমার সাথে যখন আপনি অসুস্থ্য। কাযার জন্য ছেড়ে দেওয়া চার রাকআত নামাযের কাযা চার রাকাতই আদায় করতে হবে দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমনে থাকা অবস্থাতেও। সফরে থাকা অবস্থায় দুপুরের চার রাকআত ফরয যা কাযার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই সফর শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও দুই রাকআত কাযা আদায় করতে হবে। আপনি যখন দুপুরের ফরয নামায আদায় শুরু করেন তখন নিয়ত করুন "আজকের দুপুরের নামায ", অথবা শুধু "ফরয দুপুরের নাম এর জন্য। যদি একের অধিক কিয়াতা নামায থাকে (পর্যায়ক্রমে কাযা আদায়) আপনি এভাবে কাযার জন্য ছেড়ে দেওয়া প্রথম দুপুরের নামায অথবা সর্বশেষ দুপুরের ফরয নামাযের কাযা নিয়ত করে প্রত্যেক কাযা নামায আদায় শুরু করুন; আপরদিকে, রমযানের কিছুদিনের কাযা আদায় করেন একেরপর এক, তাদের মধ্যে সময়ের ক্রম পালনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

আর যে সকল নামাযের কাযা আদায় করা হয় (যা আপনি নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে পারেননি যৌক্তিক কারণ 'ওজর' ছাড়াই) তাদের বলা হয় মীতরুক (বর্জিত, বাদ দেওয়া) নামায যা অন্যদেরকে অবহিত করবেন না। যার কারণে নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করা গুরুতর পাপ সম্পর্কে জানতে দেওয়াও পাপ। আপনার গত রাতের কৃত পাপের কথা দিনের বেলা অন্যদের বলাও পাপের কাজ। (এখানে আমরা ইবনে আবেদীনের অনুবাদ শেষ করলাম)

যেমনটা দেখলাম, হানাফী মাযহাব মতে ফরয নামাযের কাযা যত দ্রত সম্ভব আদায় করতে হবে। সাফী মাযহাব মতেও তাই। সাফী মাযহাব এর একজন চিন্তাবিদ শামস্-উদ-দ্বীন মুহাম্মদ রেমলী রহমতুলাহ আলাইহে 'ফতোয়ার' বইতে উল্লেখ করেন, যদি কোন ব্যক্তি ওযরের কারণে নামায আদায় না করে, রমযানে

তারাবিহ্ নামায না আদায় করে এবং রমযানের পরে ফায়তা নামাযের কাযা আদায় না করে তার গুনাহ্ হবেনা। যাই হোক, যদি কোন ব্যক্তি ওযর ছাড়াই একই কাজ করে তবে তার গুনাহ্ হবে।

বাদ দেওয়া নামাযের কাযা অবশ্যই দ্রত আদায় করতে হবে। শাফি মাযহাবের চিন্তাবিদরা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ওযর ছাড়া বাদ দেওয়া নামাযের কাযা প্রথমে আদায় না করে তারাবিহ্'র মত সুন্নত নামায আদায় করা গুনাহ্। হানাফীর মতেও তাই। হানাফী মাযহাবের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন ওজরে কারনে ফায়তা নামাযের কাযা বিলম্বে পড়া অনুমোদনযোগ্য যা কাযা নামায আদায়ে বিলম্ব না করা উত্তম নির্দেশ করে। অনুমোদনযোগ্য বলতে বুঝায় যা নিষিদ্ধ করা হয়নি। ইবনে আবেদীন রহমতুল্লাহ্র অভিব্যক্তিটি ব্যাখ্যা করেছেন প্রবাহিত পানির অপচয় করে ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য যেমনঃ এটি মাকরুহ তানজীহি। যখন কোন ওজরের কারণে আদায় করতে না পারা কাযা দ্রততার সাথে আদায় করা ভালো।

[১] **অশেষ রহমতের** চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাইয়্যামুম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে।

[২] এর অর্থ ইশারায় নামায আদায় করা।

তখন সুন্নত (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের) আদায়ের বদলে ওযর ছাড়া বাদ দেওয়া নামাযের কাযা আদায় বাধ্যতামূলক। ইবনে আবেদীন রহমতুল্লাহ বলেন, " অযু করার সময় তিনবার ধৌতকরা সন্নাতে মুয়াক্কাদা (ওযুর সময়ে ধোয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ)। দামী পানি, ঠান্ডা পানি এবং অপ্রতুল পানির মত যেকোন একটি ওযরে এই সুন্নত বাদ দিলে তা মাকরূহ হবেনা। এখানে আরেকটি বিষয় নির্দেশ করে, বাদ পড়া নামাজের কাযা আদায় করে গভীর পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকালের ব্যতিক্রমী নামাযটিসহ সুন্নত (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযের বদলে নামাযগুলোর কাযা আদায় করা প্রয়োজন। সুন্নত নামাযের পরিবর্তে কিভাবে কাযা নামায আদায় করা যায় তার বিস্তারিত নামাযের গুরত্ব অধ্যায়ের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃতের জন্য ইশাকাত নামায

মৃত মানুষের জন্য নামাযের ইসাকাত অর্থ বকেয়া থাকা নামাযের ঋণ থেকে মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা করা। এটি করার কারণে তার নামাযের কাফ্ফারা [১] আদায় হয়ে যাবে। কাফ্ফারা আদায়ের জন্য উইল করে বা নির্দেশ করে যাওয়া অবশ্যই পালনীয় এবং যথেষ্ট সমৃদ্ধ একটি আর্থিক সংস্থান হস্তান্তর করে যেতে হবে। এটি মৃত ব্যক্তির জন্য ওয়াজীব। অন্য কথায়, তার রেখে যাওয়া অর্থের এক তৃতীয়াংশ কাফ্ফারার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চেয়ে কম হবেনা।

*[১] **'অশেষ রহমত'** এর চতুর্থ অধ্যায়ের তেরো নং পরিচ্ছেদে কাফ্ফারা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।*

কাফ্ফারা মৃত ব্যক্তির আস্থাভাজন উত্তরাধিকারীদের একজন যিনি অর্থ সংস্থান দেখভাল করেন। চার ধরনের ওয়ালী আছে ইসলামে। মৃতের ওয়ালী, এতিমের ওয়ালী, একজন মহিলার ওয়ালী যার নিকাহ্ করাতে হবে (**অশেষ রহমতের** বারো অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত) এবং একজন দাস অথবা জারিয়ার ওয়ালী। সর্বশেষ প্রকৃতির ওয়ালীকে বলা হয় **মাওলা**। এই চার প্রকার ওয়ালী ছাড়াও আরোও ওয়ালী রয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লার ওয়ালী যাদের বলা হয় **আউলিয়া**। তারা হচ্ছেন সে সকল মানুষ যাঁদের আল্লাহ তাআ'লা অনেক ভালোবাসেন। এই গভীর ভালোবাসা অর্জনের জন্য কথা, কাজ এবং নৈতিকতায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। এই শিক্ষাগুলো খুব সহজেই ইসলামী পন্ডিতদের কাছ থেকে অর্জন করা সম্ভব। যারা ইসলামী পন্ডিতদের সান্নিধ্য পায়না তারা আহলে সুন্নত পন্ডিতদের লিখিত বই থেকে শিক্ষা নিতে পারে। **ইবনে আবেদীন রহমতুল্লাহ্** বলেন, "যে ব্যক্তির ফায়জা আছে, কোন ওযরের কারণে যে নামাযগুলো আদায় করা হয়নি, আদেশ করে যাবেন (তার শেষ উইলে) তার কাফ্ফারাগুলো আদায়ের। 'হাফসা' সমান ২.১ লিটার অথবা ৫২০ দিরহামের (১.৭৫০ গ্রাম) গম অথবা গমের আটা প্রত্যেক ফরয অথবা ওয়াজীবের জন্য গরীবদের মাঝে বিতরন করতে হবে। এর সবটুকু একজন গরীব মানুষকেও দেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় মূল্য পরিশোধে (সোনা অথবা রূপায়) যদি উইলকারী ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে না যায় অথবা তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ কাফ্ফারার জন্য প্রয়োজনের কম হয় অথবা উইল না করেই মারা যান তাহলে তার ওয়ালী অল্পকিছু সম্পদ ব্যয় করে তার

কাফ্ফারা আদায় করবেন এবং প্রত্যেক দিনের জন্য পয়োজনীয় পরিমান ১০৫০০ গ্রাম অথবা সাড়ে দশ কেজি গম; তিনি এক বছরের পরিমান কর্য করবেন = ৩৭৮০ কেজি গম (অথবা যেহেতু সাড়ে দশ কেজি গমের মূল্য প্রায় এক গ্রাম স্বণ ´এর সমান, স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য এর পরিমানের সমান যেমন ৫২.৫ স্বর্ণ মুদ্রা। অথবা ৬০ টি স্বর্ণ মুদ্রা বিবেচক হবে, অথবা অন্যান্য স্বর্ণালংকার সমান ওজনের (৪৩২ গ্রাম) ব্রেসলেট, আংটি এবং অন্যান্য)। এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, আদায় না করা নামাযগুলো দ্বিধান্বিত হতে পারে (মৃত ব্যক্তির) তিনি শিশু কালে যে বছরগুলো দেখবেন, পুরষের জন্য বারো বছর এবং নারীর জন্য নয় বছর, এভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব মৃত ব্যক্তিটি কতগুলো বছর মুকালাফ ছিল (নামায আদায়ে বাধ্য ছিল)।

কারণ, দৈনিক যত সংখ্যক নামাযের জন্য কাফ্ফারা আদায় করা প্রয়োজন তা হলো ছয়, তিনি [৩৭৮০ কেজি] গম অথবা স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবস্থা করবেন যা উত্তম উপায়। তিনি এটি কোন গরীব মুসলিমকে দিবেন কাফ্ফারা নামাযের ইসাকাত (মৃত ব্যক্তির) আদায়ের নিয়তে। গরীব মানুষটিকে অবশ্যই বিবেচক, মুবক, সৎ এবং পুর্ষ হতে হবে। এই গরীব ব্যক্তিটি বলবে, "আমি মেনে নিলাম" এবং এটি গ্রহন করবে। উত্তরাধিকারী এটি নিবে এবং একই গরীব ব্যক্তিকে দেবে অথবা অন্য একটি গরীব ব্যক্তিকে দেবে।

একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হবে ঠিক যতগুলো বছর মাইয়াত মুকালাফ ছিল (নামায অদায়ে বদ্ধপরিকর)। ধারকৃত স্বর্ণের পরিমান যদি বেশি হয় (দৃষ্টান্ত স্বরপ ধরে নেওয়া পরিমানের চেয়ে), এর চক্রের পরিমান বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তন হবে। কোন কারণে যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকে, ওয়ালী স্বর্ণালংকার ধার করবে যেমন নারীদের ব্রেসলেট এবং আংটি, সেগুলো ওজন করবে, ভাগ করবে (বছরে নামায আদায় হয়নি যতগুলো তার ৭.২ গ্রাম গুনিতক) এবং ভাগকৃত অংশ একটি র্মালের মধ্যে রাখবে যাতে করে এটিতে ততগুলো স্বর্ণ মুদ্রা আঁটে ঠিক ততগুলো সংখ্যক বছরে মৃত ব্যক্তিটি নামায আদায় করেনি। এই সংখ্যাটিকে ষাট (৬০) দিয়ে গুণ করতে হবে এবং দ্বারে অংশ গ্রহনকারী গরীব মানুষদের সংখ্যার ভিত্তিতে পন্য ভাগ করতে হবে। স্বর্ণের মজুদ যদি কম হয় সেক্ষেত্রে স্বর্ণের পরিমান আগের অর্ধেক করতে হবে। দ্বারের সংখ্যা পূর্বের সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। যে ব্যক্তিটি ষাট বছর বয়সে মারা গেছে, ৬০ গুনিত ৪৮ গুনিত ৭.২ = ২০৭৩৬ গ্রাম

সোনা একজন গরীব মানুষকে দিতে হবে। এক বছরের ইসাকাত নামাযের জন্য ষাটটি স্বর্ণমূদ্রা ব্যয় করতে হবে। সাতজন গরীব মানুষ এবং ১০০ গ্রাম সোনার ত্রিশ দ্বার হবে অথবা সাতজন গরীব মানুষ এবং ৭০ গ্রাম সোনার ৪৩ দ্বার হবে। যখন দ্বার শেষ হয়ে যায়, শেষ গরীব ব্যক্তিটি স্বর্ণগুলো ওয়ালীকে উপহার স্বরপ দেয়, যিনি তার পালায়, তার ঋণ পরিশোধ করেন। অতপর রোযা, কোরবানী এবং শপথের জন্য দ্বার আদায় করতে হবে। যাইহোক, একটি শপথের দ্বার আদায়ের জন্য অন্ত্যত দশজন গরীব মানুষ প্রয়োজন এবং একজন মানুষকে একদিনে সা'র বেশি দেওয়া যাবেনা, সেহেতু একদিনের নামাযের কাফ্ফারাতের সংখ্যার পরিমান একজন ব্যক্তিকে দেওয়া হতে পারে অধিকন্তু এক সময়। যাকাতের ইসাকাত আদায় করা যাবেনা যদিনা মৃত ব্যক্তি তার উইলে আদেশ করে যান। মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই তার উইলে আদেশ করে যেতে হবে। যাইহোক, যেহেতু বিষয়টি রোযার ক্ষেত্রে আরোপিত নয় ওয়ালীকে যাকাতের দ্বারও আদায় করা শ্রেয়; তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকে দানের মাধ্যমে। সব দ্বার শেষ হয়ে গেলে, উত্তরাধিকারী কিছু সম্পদ অথবা অর্থ গরীব মানুষদের (যিনি দ্বারের অংশ ছিলেন) উপহার স্বরপ দিয়ে দেয়। যদি মৃত ব্যক্তি যিনি কাফ্ফারার জন্য উইলে আদেশ করেছেন তার সব কাফ্ফারা আদায়ের জন্য, রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অপ্রতুল হয়, ওয়ালী এক তৃতীয়াংশ এর বেশি কাফ্ফারার জন্য ব্যয় করতে পারবেনা (মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির) উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ব্যতিত। যদি এক তৃতীয়াংশ কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হয় এবং এর পরের মৃতের বকেয়া থাকে, কাফ্ফারার চেয়ে ঋণ পরিশোধ প্রাধান্য পাবে যদিও ঋণ দাতা এটি ইসকাতের জন্য দেয়। ঋণ দাতার ঋণ পরিশোধের পর, তিনি এটি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না উপহার হিসেবে, যাতে হবে কাফ্ফারাতের ব্যবস্থা করা যায়।

কাফ্ফারা পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে শধুমাত্র উত্তরাধিকারীদের দানকৃত সম্পদের মাধ্যমে। যদি কোন মৃত ব্যক্তি উইলে তার সম্পূর্ণ জীবনের নামাযের কাফ্ফারা আদায়ের জন্য আদেশ করেন, এবং এটা যদি না থাকে তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, তার উইলটি বাতিল হয়ে যাবে (অকার্যকর)। যাইহোক, তার পুরো জীবনের নামাযের জন্য হিসেবকৃত প্রয়োজনীয় পরিমান, এক তৃতীয়াংশের কম হয়, তিনি আদেশ করে যাবেন যেন পুরো এক তৃতীয়াংশ দিয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে তার উইল কিছু পরিমান আদায় হয়, একারনে তার উইল সহীহ্ হয় (কার্যকর)। যদিও বা মৃত ব্যক্তি উইলে আদেশ করেন (কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হবে), ওয়ালীর

জন্য কাফ্ফারা আদায়ে দান করা ওয়াজীব নয় (উত্তরাধিকারী অথবা রক্ষণাবেক্ষণ কারীর জন্য)। এক তৃতীয়াংশ সম্পদ রেখে যাওয়া যা কাফ্ফারার জন্য ব্যয় হবে এবং তার উইলে আদেশ করে যাওয়া যে কাফ্ফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে ঐ এক তৃতীয়াংশ খরচ করে, যা মৃত ব্যক্তির জন্য ওয়াজীব। যদি তিনি আদেশ করেন যে, এক তৃতীয়াংশ সম্পদে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ উত্তরাধিকারীদের অথবা অন্যান্য ব্যক্তিদের দান করতে হবে, তিনি ওয়াজীব লঙ্ঘন করবেন যা একটি পাপকর্ম। সেক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ দ্বার আদায়ে ব্যয় এবং অবশিষ্ট কুরআন খতম ও তেহলীলে খরচ করার আদেশ সহীহ্ হবেনা। কোন কিছুর প্রত্যাবর্তনে কোরআন তেলাওয়াত অনুমোদনযোগ্য নয়। উভয়েই যিনি পরিশোধ করছেন এবং যিনি গ্রহন করছেন পাপী। যদিও উল্লেখ করা হয়েছে (কিছু চিন্তাবিদদের মতে) কোরআন মাজিদ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষা দেয়া অনুমোদনযোগ্য। কোন একজন (চিন্তাবিদ নন) বলেছেন যে, এটি পাঠ করা অনুমোদনযোগ্য (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে)।

যদি মৃত ব্যক্তি তার উইলে আদেশ করে যান যে তার নামায (যেগুলো তিনি আদায় করেন) তার উত্তরাধিকারীকে আদায় করতে হবে, তার কাযা নামায (মৃত ব্যক্তির) উত্তরাধিকারী আদায় করলে তা সহীহ (গ্রহনযোগ্য) হবেনা। যাইহোক, মৃত ব্যক্তির জন্য নামায আদায় অথবা রোযা করার সওয়াব দান করা সহীহ্। কোন ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু শয্যায় ফিদিয়া আদায় অনুমোদনযোগ্য নয়। এখানে আমরা ইবনে আবেদীনের অনুবাদ শেষ করলাম। ্আহ্মদ তাহ্তাই রহমতুলাহ আলাইহি **মেরাক-ইল-ফালাহ্** (বইয়ের নাম) বইয়ের মধ্যে বলেছেনঃ নাস্ এর মধ্যে উলেখ করা হয়েছে (আয়াতে কারিম এবং হাদিস শরিফে স্পষ্ট অর্থে) আদায় না করা ইসাকাত আদায় (নির্ধারিত সময়ে আদায় না করলে) করা যায় ঐগুলোর ফিদিয়া দিয়ে। যেহেতু নামায, রোযার চেয়ে অধিক গুরত্বপূর্ণ। নামাযের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। এটা ইসলামী চিন্তাবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে উলে-খ্য। সুতরাং, বিবৃতিটি হচ্ছে "নামাযের ইসাকাত হচ্ছে ভিত্তি ছাড়া কোন কিছু।" একজন ধর্মীয় ব্যক্তির কাছে যা অজ্ঞাত স্বীকৃতি স্বরপ (একজন ব্যক্তি যার জন্য প্রেরণ করা হয়) এটি চিন্তাবিদদের ঐক্যমতের বিপরীতে একটি বিবৃতি।

যদি কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথার সাহায্যে ইশারায় নামায আদায়ে অক্ষম হয় সেগুলো তাকে তার উইলে আদেশ করতে হবেনা যদিও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত (দৈনিক) নামাযের কম সংখ্যক আদায় করতে পারেননি। অনুরর্পভাবে,

সফরে (দীর্ঘ ভ্রমনের যাত্রার ক্ষেত্রে) থাকা অবস্থায় অথবা অসুস্থতার কারণে রোযা করতে ব্যর্থ হয় অথবা ইকামাতের (কোন স্থানে বসতি স্থাপনের) সময় না পায় অথবা ছেড়ে দেওয়া রোযার কাযা আদায়ে যথেষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়, তাকে তার ইসাকাত আদায়ের জন্য উইলে আদেশ করতে হবেনা। ওয়াসিয়াত (কারো উইলে অদেশকৃত) কার্যকর হবে সাদাক-ই ফিতর। এর ক্ষেত্রে (সাদকা আদায় সংক্রান্ত ব্যর্থতা) স্ত্রীর জীবিকার উপায়ে, হজের ইহ্রামে থাকা অবস্থায় গুরতর পাপে, কোরবানীর ক্ষেত্রে ভিক্ষা সংক্রান্ত কাজে, যদি কোন ব্যক্তি উইল ছাড়াই মারা যায় ইনশাআল্লাহ তার উত্তরাধিকারী অথবা অন্য কোন ব্যক্তির তার জন্য দান করা অনুমোদিত। যদি কোন ব্যক্তি (মৃত) তার উইলে হজ এর আদেশ করেন তার উকিল (প্রতিনিধি) মৃত ব্যক্তির শহর অথবা অন্য যে কোন জায়গা থেকে হজে যাবেন যার খরচ ঐ রেখে যাওয়া এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে। পক্ষান্ড়রে, দাতার স্থান নির্বাচন করার স্বাধীনতা রয়েছে কোথা থেকে হজ্জে রওয়ানা হবেন। মৃত ব্যক্তির বদলে মুল্যে অথবা বিনা মুল্যে কারো রোযা বা নামাজ আদায় করা সহীহ্ হবেনা। এ বিষয়ে সহীহ্ হাদিসটি হচ্ছে মানসুক। কাফ্ফারার জন্য কিছু দান করা হলে, আল্লাহ্ তায়া'লা মৃত ব্যক্তির পাপাগুলো ক্ষমা করে দিবেন। শাফি কিতাব **আনোয়ারের** মধ্যে উলেখ করা হয়েছে, "মৃত ব্যক্তির জন্য না আদায় করা নামাযের ফিদিয়া দেওয়া ওয়াজীব নয়। যদি আদায় করা হয়, এটি ইসাকাত হবেনা। মালিকী এবং শাফি মাযহাবের মুসলিমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারে দাবার আদায় করে।

১. ***অশেষ রহমতের*** *তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।*
২. ***অশেষ রহমতের*** *অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।*
৩. ***অশেষ রহমতের*** *সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।*
৪. ***অশেষ রহমতের*** *পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।*
৫. ***অশেষ রহমতের*** *ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পনেরতম হাদিস-ই-শরিফ দ্রষ্টব্য।*

যদি মৃত ব্যক্তির সম্পদের পরিমান উইলে আদেশ অনুযায়ী কাফ্ফারার জন্য পর্যাপ্ত না হয় অথবা রেখে যওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অপর্যাপ্ত হয় অথবা উইল ছাড়াই মারা যায়, দ্বার আদায় করতে হবে যাতে করে সমস্ত পাপের ইসাকাত মার্জিত (ক্ষমা) হয় কোন একজন ব্যক্তির অল্প কিছু সম্পদ দান করার মাধ্যমে।এই স্বল্প সম্পদটুকু ইসাকাতের নিয়তে একজন গরীব মানুষকে দিতে

হবে। ঐ গরীব ব্যক্তিটি এটি গ্রহনের পরে ওয়ালীকে উপহার সাবরপ দেয় অথবা অন্য একটি গরীব মানুষকে দেয় যিনি তার পালায় এটি রাখবেন অর্থাৎ নিজের অধীনে রাখবেন; অতপর তিনি অন্য একজন গরীব মানুষকে দানের মাধ্যমে এবং মৃত ব্যক্তির পাপ কর্মের ইসাকাত আদায়ের নিয়তে দিয়ে দিবেন (নামায ও রোযা না আদায়ের ক্ষেত্রে)। এখানে আমরা তাহ্তায়ী'র ভাষ্য অনুবাদকরণ শেষ করলাম।

শুক্রবার সম্পর্কে

শুক্রবারের নামায সহীহ্ হওয়ার জন্য সাতটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক।

১- যেখানে শুক্রবারের নামায আদায় করা হবে, সেটি যথেষ্ট বড় হবে শহরের মত।

২- খুৎবা দিতে হবে (নির্ধারিত প্রেরণা / আদেশ মূলক ভাষণ)

৩- নামাযের পূর্বে খুৎবা দিতে হবে।

৪- পূর্ব দুপুরের জন্য নির্ধারিত সময়ে শুক্রবারের নামায আদায় করতে হবে।

৫- জামায়াতে আদায় করতে হবে। ইমাম আযম এবং মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহু এর মতে ইমাম সংযোজনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবেন যিনি পূর্ণবয়স্ক, এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছেন। জাময়াতে নূন্যতম তিনজন ব্যক্তি হতে হবে। অর্থাৎ ইমাম ছাড়া অন্য (মুক্তাদী) দু'জন হতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহু তায়া'লার মতে, তারফাইনের কাওল জরুরী (ইমাম আযম আবু হানিফা এবং তার শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদকে বলা হয় তারফাইন)।

৬- লোকজনের শুক্রবারের নামাযের জামায়াতে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।

হিনদিয়া নামক ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীন, স্বাস্থ্যবান এবং সফররত নয় এরকম মানুষের জন্য শুক্রবারের নামায আদায় করা ফরযে আইন। সফররত, (লম্বা ভ্রমনের যাত্রায়) অসুস্থ্য ব্যক্তি অথবা নারীদের জন্য শুক্রবারের নামায আদায় করা ফরয নয়। মুষলধারে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে অথবা সরকারি কাজে কর্মরত কোন ব্যক্তির জন্য এটি ফরয নয়। উর্ধ্বতনরা, সেনাপতিরা, অথবা নিয়োগ কর্তারা তাদের অধীনস্থ মানূষদের শুক্রবারের নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন না। তারা তাদের নির্ধারিত অযাচিত মজুরি বাদ দিতে পারে। যদি ফাসিক[১] ইমাম শুক্রবারের নামায পরিচালনা

করেন এবং আপনি তাকে বাধা দিতে অক্ষম তবে চিন্তাবিদদের নির্দেশনা, শুক্রবারের নামায আদায় করা থেকে বিরত না থেকে আপনি তার পিছনে নামায আদায় করবেন। অন্যান্য সময় (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে) আপনি ফাসিক ইমামের পিছনে নামায আদায় না করে এমন মসজিদে যাবেন যেখানে একজন সালীহ্ ইমাম জামায়াতে নামায পরিচালনা করেন। জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য নারীর জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরুহ। নারীটিকে এবং কোন নামায আদায় করবে তা বিবেচ্য নয়।

যদি কোন ব্যক্তির শুক্রবারের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের রকুতে ইমামের সাথে যোগদান করে, তিনি পূর্ব দুপুরের (ঐ দিনের) নামায আদায় করবেন, ইমাম মোহম্মদ রহিমাহুল্লাহু এর মতে। ইমাম আযম ও ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহু তায়া'লার মতে, তিনি শুক্রবারের নামায আদায় করবেন যদিও তিনি ইমামকে তাশাহুদের (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার বৈঠক) অবস্থানে পান। যদি কোন ব্যক্তি খতিবের খুৎবা দেওয়ার সময় নফল নামায আদায় করতে থাকে তবে তিনি শুধূ দুই রাকআত আদায় করবেন এবং এর বেশি নয়। যদি সে শুক্রবারের নামায এর সুন্নত আদায় করতে থাকে আলেমগণের ইজমা নেই যে, তিনি কি দুই রাকআত আদায়ের পর সালাম আদায় করবেন নাকি পুরো চার রাকআত আদায় করবেন।

শুক্রবারে পাঁচটি ওয়াজিব অবশ্যই পালন করতে হবে-

১. আযানের সময় সকল কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হবে (জুমআর নামাযের জন্য)।

২. মসজিদে সা'ঈ করে অর্থাৎ হেঁটে যাওয়া (নিজেকে জাহির না করা। ঠিক যেমনটি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে হজের সময় হাঁটতে হয়।

[**অশেষ রহমতে পুস্তকে** সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে]

৩. ইমাম হিসেবে নফল নামায আদায় না করে, (খতিব) খুৎবা দেওয়া।

৪. পার্থিব কথা না বলা।

৫. নীরবতা পালন করা।

শুক্রবারে ছয়টি মুস্তাহাব পালন করতে হবে।

১. রাইয়্যা-ই-তাইয়্যিবা, (যার অর্থ সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে)।

[১] একজন ব্যক্তি যিনি মদ্যপানীয় ব্যবহার অথবা ব্যাভিচার করে তাকে ফাসিক বলে।

২. মিসওয়াক ব্যবহার।

৩. পরিস্কার কাপড় পরিধান করা।

৪. তেবকির করা (যার অর্থ শুক্রবারের নামাযের জন্য যথাসময়ের পূর্বে মসজিদে গমন করা)। জামান-ই-সৈয়্যেদাতের সময় (শাসনামলে), সবচেয়ে সুখি কল্যাণময় সময় যখন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং তাঁর পরবর্তী চার খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর ফারক (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলি (রাঃ) বসবাস করতেন। সাহাবারা (রাঃ) সকালের নামাযের পর (শুক্রবারের) চলে যেতেন না তারা জুমআর নামাযের পরে যেতেন। উম্মতেরা প্রথমে এটি পছন্দ করতেন না। এটি একটি সুন্নতি আচরণ এবং এটাকে বলা হয় তেবকির।

৫. গোসল করা (**অশেষ রহমতের** চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে)।

৬. সালাওয়াত নামক দোয়া পাঠ করা যা রাসূলুল্লাহ্ এর পবিত্র আত্মার জন্য পাঠ করা হয় এভাবে- **আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহ্বিহি আযমাইন**।

শুক্রবারে (খুৎবার সময়) পাঁচটি মাকরুহ আছে যা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১- সালাম দেওয়া। (ইসলামের অভিবাদন বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে **অশেষ রহমতের** তৃতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি পরিচ্ছেদে)

২- কোরআন তেলাওয়াত করা।

৩- কেউ হাঁচি দিলে **'ইয়ার হামুকুমুল্লাহ্'** বলা (অতঃপর আলহামদু্লিল্লাহ্ বলা) ।

৪- খাওয়া এবং পান করা।

৫- কোন মাকরুহ কাজ করা (খতিবের কোন কারণ ছাড়াই খুৎবা খুব দীর্ঘকরা)।

শুক্রবারের প্রথম আযানের পর যা মিনারাতে আদায় করা হয় (মসজিদের বাইরে আদায় করা হয়) খতিব শুক্রবারের নামাযের সুন্নত মিম্বারের পাশে আদায় করবেন। এরপর তিনি মিম্বারের সামনে আসবেন, একটি ছোট দোয়া পড়বেন কিবলার দিকে মুখ করে। মিম্বারে ধাপ বেয়ে উঠবেন, জামাআতের দিকে মুখ করে বসবেন এবং দ্বিতীয় আযান শুনবেন। এরপর তিনি দাঁড়াবেন এবং খুৎবা দিতে শুরু করবেন।

ওয়াহাবিরা আহলে সুন্নাহ মাযহাবে নেই। তাদের সে রকম কোন মাযহাব নেই। তাদেরকে ওয়াহাবি অথবা **নজদি** বলা হয়। ওয়াহাবি মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল ইংরেজ চক্রান্তকারীদের মাধ্যমে। তারা এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল একজন নিচ এবং ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ নজদিকে ব্যবহার করে এবং তার নাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব। তারা অ-ওহাবীদের অবিশ্বাসী মনে করে তাদের কিতাবে। তারা লিখে থাকে যে এগুলো অনুমোদনযোগ্য অ-ওহাবীদের মেরে ফেলা, স্ত্রীদের হরণ করা, কন্যা এবং সম্পদগুলো গনিমতের হিসেবে নেওয়া। প্রচুর পরিমানে অজ্ঞ এবং লামাজহাবীদের সাজসে তারা তাদের ওয়াহাবিতে পরিনত করে এবং **রাবেতা উলামা ইসলাম** নামক কেন্দ্রে তাদের প্রেরণ করে যা তারা পৃথিবীব্যাপি দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা তাদের ইসলাম বিরোধী প্রকাশনা ”ওয়াহাবি চিন্তাবিদদের ঐক্যমতে ফতোয়াসমূহ” ভাষান্তর করে মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেয়। যার শুরুর দিকে তারা এগুলো বিনামূল্যে মুসলিম হাজিদের (তীর্থযাত্রী) দিত। তাদের একটি লেখার মধ্যে বলা হয়, ”শুক্রবারের নামায আদায় করা নারীদের উপর ফরয।” তারা জোর করে শুক্রবারের নামায আদায়ের জন্য নারীদের পাঠায়। তারা মিলিত দলে নামায আদায় করে যেখারে পুরষ এবং নারী একই নামায জামাআতে আদায় করে। তাদের অন্য একটি প্রকাশনার মধ্যে বলা হয়, ” ঈদ এবং শুক্রবারের খুৎবা জামাআতের বোধগম্য ভাষায় পড়তে হবে। এটি আরবী ভাষায় পড়া যাবেনা”। সত্য ইসলামিক চিন্তাবিদেরা মুসলিম দেশগুলোতে প্রমাণ স্বরপ মূল পাঠ উল্লেখ করে এধরনের ফতোয়াগুলো বাতিল করেছেন। এর মধ্যে ফতোয়াগুলো খন্ডনের জন্য সত্য ফতোয়া প্রদান করেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আহলে সুন্নতের পন্ডিতেরা। উদাহরণ স্বরপ, আল্লামা হিবর-উন-নাহির ওয়াল ফেহামা সাহেব উত-তারাবীর ওয়াত তাকরীর ওয়াত তাহরীর মাওলানা মুহাম্মদ তেমিমি বিন মুহাম্মদ মাদরাজী (নেভের মেকাদেহু) মাদরাজের মুফ্তি এভাবে উলেখ করেছেন।

আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দেওয়া অথবা আরবি এবং এর অন্য ভাষায় অনুবাদ উভয়ে খুৎবা আদায় করা মাকরুহ্। পুরো খুৎবা আরবি ভাষায় সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এর দরন রাসুলুল্লাহ্ তাঁর সকল খুৎবা আরবি ভাষায় সম্পন্ন করেছেন। **বাহারুর- রাসিক** নামক কিতাবের ঈদের নামায অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, নফল অতিরিক্ত নামায, তারাবীহ্র নামাযের নিয়তে অথবা তারাবীহ এবং কুসুফ নামায জামাআতে আদায় করা হয়না।

যেহেতু ঈদের নামাযগুলো জামাআতে আদায় করা হয় সব সময়, সেগুলো অবশ্যই ওয়াজিব, নফল নয়। যেমনটি দেখা যায় রাসূলুল্লাহ এ এবাদতটি অবশ্যই ওয়াজিব হিসেবে আদায় করেছেন। আল্লামা জেবিদী রহিমাল্লাহু তাআ'লা **ইয়াহিয়া-উল-উলামার** মধ্যে উল্লেখ করেছেন, " রাসূলুল্লাহ্ নিয়মিতভাবে যে ইবাদতটি আদায় করতেন তা ওয়াজিব। এটি প্রয়োজনীয় ফরয ইবাদত নয়।" আল্লামা মুফ্‌তি আবুস-সাউদ তাঁর **ফাতেহ্ উলাহিল মুমিন** কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ নিয়মিতভাবে যে ইবাদতটি আদায় করতেন সেটি ওয়াজিব "। ইবনে আবেদীন রহিমাহুল্লাহ তাআ'লা ওযুর সুন্নত কিতাবে উল্লেখ করেছেন, " রাসূলুল্লাহ্ নিয়মিতভাবে যে ইবাদতটি আদায় করেছেন সেটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ যদি না তিনি কখনো তা বাদ দেন"। যদি তিনি এটিকে শুধু উপেক্ষ না করেন কিন্তু যাকে তিনি তা বাদ দিতে দেখেছেন তাকে বিরত করেন বাদ দেওয়া থেকে তখন এটি ওয়াজিব। যদি বিরত না করে থাকেন (এটি বাদ দেওয়া থেকে কোন ব্যক্তিকে) তবে তা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদিত বিবেচ্য। এই বিষয়ে জনাব অবুস সাউদ বলেছেন, "যে কোন ইবাদত যদি রাসূল বাদ দেওয়া ছাড়াই নিয়মিতভাবে আদায় করেছেন তবে তা ওয়াজিব"। একদম শেষ অংশে যেখানে নামাজের মাকরূহ্ সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের কোন একটি বাদ দিয়ে দেওয়া মাকরহ্ তাহ্‌রীমি। রাসূল সর্বদা আরবি ভাষায় খুৎবা আদায় করেছেন। যে কারনে আরবী ভাষায় খুৎবা আদায় করা ওয়াজিব। তাছাড়াও আরবি বাদে অন্য ভাষায় অথবা আরবি ও তার অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তর উভয়েই খুৎবা আদায় করা মাকরহ্ তাহ্‌রীমি। এক্ষেত্রে আরবি ভাষায় অবশ্যই খুৎবা আদায়ের নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে খুৎবা শুধুমাত্র আরবি ভাষায় আদায় করতে হবে এ নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়। এ উভয় ক্ষেত্রে রাসূল এর নিয়মিত আদায়কৃত একটি বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়। অনুরপভাবে, তাকবীর বলা (ইফতিতাহ, আলাহু আকবার বলা) নামায আদায়ের শুরুতে আরবি ভাষায় এবং 'আলাহু আকবার' বলা এ দুটি ভিন্ন বিষয়। যে কোন একটি বাদ দেওয়া মাকরহ্ তাহ্‌রীমি। এটি করা ওয়াজিব কেননা রাসূল সর্বদা বলেছেন 'আল্লাহু আকবার' এবং এই কারণে এটি না করা মাকরহ্ তাহ্‌রীমি। ইবনে আবেদীন রহিমাল্লাহু তাআ'লা **রাদ-উল-মুহ্‌তারের** মধ্যে উল্লেখ করেছেন, "মাকরহ হচ্ছে সেই জিনিষ (কোন কাজ) যা করলে বা কোন কিছু না করলে ওয়াজিব অথবা সুন্নত বিঘ্নিত হয়"।

প্রথমটি (কোন ওয়াজীব বিঘ্নিত হলে) মাকরহ্ তাহ্‌রীমি এবং দ্বিতীয়টি (কোন সুন্নত বিঘ্নিত হলে) হচ্ছে মাকরূহ্ তানজীহি। **হালাবী-ই-কাবিরের** কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে (ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ হালাবী, ৭৬৬, হালেব, আলেপ্পো-৯৫৬, ১৫৪৯ খ্রিঃ) কোন সুন্নত বাদ দেওয়া হচ্ছে মাকরহ্ তানজীহি। কোন ওয়াজিব বাদ দেওয়া হচ্ছে মাকরহ্ তাহ্‌রীমি। **ফতোয়া ই-সিরাজীয়া** কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে (আলি উসিহ্ বিন উসমান রহমাতুলাহ, ১১৮০ খ্রিঃ) ফারসী ভাষায় খুৎবা দেওয়া অনুমোদিত। এই বিবৃতিটি প্রমাণ স্বরপ উল্লেখ করে এবং ফতোয়া দিলে আরবি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় খুৎবা দেওয়া অনুমোদনযোগ্য এবং তা মাকরহ্ তাহ্‌রীমি অথবা তানজীহি নয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। সিরাজিয়ার বিবৃতির অর্থ হচ্ছে এটি সহীহ্, যার অর্থ এটি নয় যে, এটি মাকরহ্ নয়। ইবনে আবেদীন রহিমালাহু তাআ'লা **রাদ-উল-মুহ্‌তারে** উলেখ করেছেন তাঁর (আলি উসিহর) সহীহ বলার অর্থ এটি নয় যে, এটি মাকরহ্ নয়। মোহাম্মদ আব্দুল হাই লাকনোভী রহিমালাহু তাআ'লা তাঁর **উমদাত-উর-রিয়ার** মধ্যে উলেখ করেছেন আরবি ভাষায় খুৎবা আদায়ের বিবৃতিটি কোন শর্ত নয় যা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে (শুক্রবারের নামাযের ক্ষেত্রে)। পারসীয়ান অথবা অন্য কোন ভাষায় আদায় করা অনুমোদনযোগ্য; প্রমান করে শুক্রবারের নামাযে ঐ উপায়ে অদায় অনুমোদনযোগ্য। অন্যকথায়, শুক্রবারের নামাযে খুৎবা আদায়ের শর্ত পূরণ হয়। এটি বুঝায়না যে কেরাহাত ছাড়া খুৎবা আদায় করা যায় (কোন কিছু যা এটিকে মাকরতে পরিনত করে) এজন্য রাসূল এবং সাহাবীরা (রাজিয়ালাহু আনহু) সব সময় সব জায়গায় শুধুমাত্র আরবি ভাষায় খুৎবা দিয়েছেন। তাঁদেরকে অমান্য করা মাকরহ্ তাহ্‌রীমি। একইভাবে, তাবী এবং তাবিঈন রহিমালাহু তাআ'লারা সব সময় এবং সব জায়গায় আরবি ভাষায় খুৎবা আদায় করেছেন। তাঁরা অন্য কোন ভাষায় খুৎবা আদায় করেননি, তাদের কেউই আরবি ছাড়া অন্য এবং আরবি এবং অনুবাদে (অন্য ভাষায়) উভয়ে খুৎবা আদায় করেননি। এই সমস্যাটি এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতেও ছিল যেখানে মানুষেরা খুৎবা শুনে বুঝতোনা খুৎবায় কি বলা হচ্ছে কেননা তারা আরবি জানতো না। যদিও খুৎবার অনুবাদ করে তাদের বলে দেওয়া প্রযোজন এবং ঐ উপায়ে নতুন মুসলিমদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়া, তারা এটি অনুমোদনযোগ্য মনে কওে না ব্যবহার করা। তারা খুৎবা ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ইসলাম সম্পর্কে তাদের বলে থাকে।

তারা তাদেরকে খুৎবা ভাল করে বুঝার এবং ইসলাম শিক্ষার জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার উপদেশ দিয়ে থাকে। আমরা এসকল পতিদের সম্মানার্থে তাদের অনুসরণ করব।

আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা আদায় করে তাদের উপেক্ষা করা **বিদআত**। এটি করা মাকরূহ্ তাহ্রীমি। প্রথম ক্ষেত্রে তাহ্রীমি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তানজীহি বলা (বাতিল)। এজন্য মাকরূহ্ তানজীহি হচ্ছে কোন একটি সুন্নতকে বাদ দেওয়া। কারন, রাসূল সব সময় তাঁর খুৎবা শুধুমাত্র আরবি ভাষায় দিয়েছেন। শুধুমাত্র আরবি ভাষায় খুৎবা দেওয়া ওয়াজীব। কোন একটি ওয়াজীব বাদ দেওয়া কিভাবে তানজীহি হতে পারে? কোন একটি মাকরূহ্ তানজীহি কাজ বাদ দেওয়া হচ্ছে ওয়াজীব। মাওলানা বাহার উল উলুম রহিমালাহু তাআ'লা **এরকান-উল-আরাবার** মধ্যে উলেখ করেছেন কোন মাকরূহ্ তানজীহি কাজ করার অর্থ হচ্ছে কোন ওয়াজীব অমান্য করা।

কোন ব্যক্তি যিনি সব সময় মাকরূহ্ তাহ্রীমির কাজ করেন তিনি আদিল মুসলিম নন। ইবনে আবেদীন উদ্ধৃত করেছেন ইবনে নুযাইম রহিমালাহু তাআ'লার কিতাব **রাদ্দ-উল-মুহতারের** ওযুর ওয়াজীব সম্পর্কে প্রবন্ধের শুরতে এভাবে, "মাকরূহ্ তাহ্রীমি সম্পাদন করা একটি লঘু পাপ।" অব্যাহতভাবে সম্পাদন করতে থাকা লঘু (ছোট) পাপ তাকে মুসলিম আদালত[১] বিহিন করে দেয়। অন্য কথায়, অনেকগুলো লঘু পাপ অথবা কিছু সংখ্যক বারংবার কৃত পাপ এক্ষেত্রে গুর (বড়) পাপের জন্ম দেয়। এবং সহজভাবে একটি গুর পাপ সম্পাদন করলে মুসলিম তার আদালত হারায় যাতে করে তিনি আর আদিল মুসলিম থাকেনা। এজন্য যে সকল খতিবেরা তাদের অনুবাদে খুৎবা আদায় করে তারা তাদের আদালত হারায় এবং ফাসিক মুসলিমে পরিনত হয়। প্রসঙ্গক্রমে একজন ফাসিক মুসলিম হচ্ছে সেই মুসলিম যে কবিরা গুনাহ্ খোলাখুলিভাবে করে। কবিরা গুনাহ্র উদাহরনসমুহ; ওযর ছাড়া কোন কিছু আদায় না করা, ইসলামের আদেশগুলোর কোন একটি অথবা নিষেধকৃত কর্ম সম্পাদন করা উন্মুক্তভাবে। এরকম মানুষের পিছনে নামায আদায় করা মাকরূহ্ তাহ্রীমি (তাদের পরিচালিত নামাজের জামাআতে যোগদান করা)। **নূর-উল-ইধায়ী** কিতাবের মধ্যে উলেখ করা হয়েছে (আবুল ইখলাস হাসান বিন আমির শেরন বিলালী রহমাতুলাহ্ তাআ'লা আলাইহি এর ৯৯৪--১০৬৯, ১৬৫৮ খ্রিঃ মিসর এবং **ইবনে আবেদীন**) "কোন দাস অথবা একজন গ্রাম্য ব্যক্তি অথবা অবৈধ বালক যদি তারা অশিক্ষিত হয় এবং সে যদি বিদাআত করে থাকে

একজন শিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাহলে ইমামের দায়িত্ব পালন করা মাকরূহ্ (জামাআতে নামায পরিচালনা করা)। তাকে ইমামের দায়িত্ব ওেয়া গুনাহের কাজ (যে নামাযটি আপনি জামাআতে আদায় করবেন তার পরিচালনায়)। আলামা ইব্রাহীম হালাবী রহিমালাহু তাআ'লা **"হালাবী-ই-করব"** এর মধ্যে উলেক করেছেন।

যে সকল মুসলিমরা ফাসিক মানুষদের ইমাম হতে দেয় তারা পাপ সম্পাদন করে (জামাআতে নামায পরিচালনা করা)। ফাসিক ব্যক্তিদের ইমাম হতে দেওয়া মাকরূহ্ তাহ্রীমি। **মেরাক-ইল-ফেলাহর** মধ্যে লেখা হয়েছে, কোন এক ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম হতে দেওয়া মাকরূহ্ (জামাআতে নামায পরিচালনা করা) যদিও তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি (ইসলামে)। তিনি নিজেকে ইসলামে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট করতে পারেননি। তাকে উপেক্ষা করা ওয়াজীব। তাকে ইমাম করার অর্থ তাকে সম্মান প্রদর্শন করা। [১] **অশেষ রহমতের** পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আপনি যদি তাকে জামাআতে নামায পরিচালনা থেকে বিরত না করতে পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই শুক্রবারের এবং অন্যান্য নামায অন্য মসজিদে আদায় করবেন। আল্লামা তাহ্তায়ী রহিমালাহু তাআ'লা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, "কোন একজন ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম হতে দেওয়া মাকরূহ্ তাহ্রীমি (জামাআতে তাদের নামাজ পরিচালনার জন্য)"।

আপনি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুৎবা আদায় করতে খতিবকে বলতে পারবেন না। এটি করা পাপের কাজ। ইবনে আবেদীন রহিমাল্লাহু তাআ'লা **রাদ্দ-উল-মুহতারের** মধ্যে উল্লেখ করেছেন, নামায (জামাআতে নামায) কোন ফাসিক ইমামের পিছনে আদায় করা যাবেনা। আপনাকে অবশ্যই একজন ইমাম খুঁজে বের করতে হবে যিনি ফাসিক নন। তবে শুক্রবারের নামায ভিন্ন বিষয়। যাই হোক, শুক্রবরের নামাযও ফাসিক ইমামের পিছনে আদায় করা মাকরুহ্। যদি শহরের বিভিন্ন মসজিদে এটি আদায় করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে অন্য ইমামের পিছনে নামায আদায় সম্ভব হবে। **ফাতহ্-উল-কাদির** কিতাবের[১] মধ্যেও একই কথা বলা হয়েছে।

অত:পর আপনি এমন কোন ইমামের পিছনে নামায আদায় করবেন না যিনি শুধুমাত্র আরবী ভাষায় খুৎবা আদায় না করে এর অনুবাদে অন্য একটি ভাষায় আদায় করে এবং আপনি অবশ্যই একজন ইমাম খুঁজে বের করবেন।

[১] এটি ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি তাআ'লা আলাইহি ৭৩০ (১৩৮৮ খ্রিঃ)-৮৬১ (১৪৫৬) **হিদায়া** সম্পর্কে মন্তব্যে লিখেছেন যা পরবর্তীতে বুরহান উদ্দিন মারযীনানী রহমাহ্ তুলাহি তাআ'লা আলাইহি লিখেছেন ৫১৩ (১১৯৭ খ্রিঃ) যাযাবর চেঙ্গিস খানের হাতে নিহত হন।

যিনি শুধুমাত্র আরবীতেই খুৎবা দেন এবং সে ইমামের পিছনে নামায আদায় করবেন (সেই ইমামের পরিচালিত জামাআতে নামায আদায় করবেন)।

বিস্তারিত জানতে এই বইটি পড়ুন; **এত্যাহিকাত-উস্যালিয়া-ফি-কেরাহাত-ইল-খুৎবা-তি-ই-বি-খাইরিল আরাবিয়্যা ওয়া ক্বিরাতিহা বি-ল- আরাবিয়্যাত-ই-মা তেরজীমাতিহা বি-খাইর-ইল আরাবিয়্যাত।** এখানে আমরা আল্লামা মুহাম্মাদ তেমিমি মাদরাজীর লেখার অনুবাদ শেষ করলাম।

উপরের লেখা যা আরবীতে লেখা হয়েছে ভারতে **১৩৪৯**হিঃ (**১৯৩১** খ্রিঃ), ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ **১৩**জন ইসলামী চিন্তাবিদদের অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত। এছাড়াও ঐতিহাসিক ফতোয়া, **দেওবন্দ** এবং **বাকীহাতুস সালিহাত** এবং **মাদ্রারাজ** এবং **হায়দারাবাদের** ভারতীয় চিন্তাবিদদের আরবী ফতোয়াসমুহ তুরস্কে, ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হয় **১৩৯৬**হিঃ এ (**১৯৭৬** খ্রিঃ)।

হাজারো প্রসিদ্ধ ওসমানী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং শাইখুল ইসলাম রহিমাল্লাহ্ তাআ'লারা খুৎবা বুঝার জন্য মানুষদের সাহায্যের রাস্তা খোঁজ করেছেন। তার্কিশ খুৎবার অনুমোদনের কোন সূত্র খুঁজে না পেয়ে তারা এগুলোর অনুমোদন দেননি। জামাআতের গুরত্বারোপের লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছিল শুক্রবারের ধর্মপোদেশ মসজিদগুলোতে শুক্রবারের নামাযের পরে দেওয়ার কারণে এবং মসজিদে মানুষেরা ছয়শত বছরের ফতোয়ার মূলভাবগুলো জানতো এবং ইসলামী চর্চার পরিধি লঙ্ঘন করা থেকে বিরত রাখতো।

ঈদের নামাযে (যে নামায ঈদের দিন সকালে আদায় করা হয়) নয়টি (তাকবীর) **জিওয়াইদ তাকবীর** আছে। তাদের মধ্যে একটি ফরয। দ্বিতীয়টি সুন্নত। তাদের মধ্যে সাতটি ওয়াজিব। তাকবীর-ই- ইফতিতাহ্ ফরয। প্রথম রকুর জন্য তাকবীর হচ্ছে সুন্নত। জিওয়াইদ তাকবীর ওয়াজিব । দ্বিতীয় রাকআতের রকুর তাকবীর

ওয়াজিব । সম সময়ে এটির অন্য একটি তাকবীর হচ্ছে ওয়াজিব (অন্য কথায় তাকবীরই জিওয়াইদ এর শেষ সাতটি একই সময়ে যে গুলো ওয়াজিব)।

নামায আদায় করা

নেয়ামত-ই-ইসলামের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; সকল প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বিচক্ষণ মুসলিমের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। কেউ অন্য কোন ব্যক্তির হয়ে নামায আদায় করে দিতে পারবে না। কোন ব্যক্তি নামাযের সওয়াব দান করতে পারে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন পুণ্য কাজ আদায় করতে পারে (জীবিত অথবা মৃত কোন একজন অথবা প্রত্যেকের) অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্য কৃতকর্মের সওয়াব দান করা হয়। সমপরিমান সওয়াব দেওয়া হয় ঠিক যতটা দানকারী অর্জন করে এবং দানকারীর কাছ থেকে কোন সওয়াব কেটে নেওয়া হবে না। এভাবে নামায আদায় এবং তার সওয়াব দান করা তদানুযায়ী আপনার বিপক্ষ অথবা ঋণদানকারীর অনুকৃপা অর্জন যাতে করে তারা তাদের অধিকারের দাবী ত্যাগ করে তবে তা অনুমোদনযোগ্য নয়। একজন ব্যক্তি যিনি বিশ্বাস করেন নামায ফরয (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত) এবং তখনও নামাজ আদায় করে না কোন ওজর ছাড়া তিনি অবিশ্বাসী হবেন না। তবে ফাসিকে পরিনত হবেন। এটি উল্লেখ্য, বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী উৎস হতে উদ্ধৃত যে, একটি মাত্র বাদ দেওয়া নামাজের জন্য সত্তর হাজার বছর জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। একজন ব্যক্তি (যিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায থেকে বিরত থাকেন) তাকে জেলে পাঠাতে হবে এবং ততদিন পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে যতদিন না পুনরায় সে নামায আদায় শুরু করে। যখন কোন শিশুর বয়স সাত বছর হয়ে যাবে তখন তাকে নামাযের জন্য নির্দেশ করতে হবে। যদি সে দশ বছর বয়সে নামায আদায় না করে তবে তাকে হাত দিয়ে প্রহার করতে হবে। এটি তিন বারের বেশি করা যাবে না। কোন লাঠি দিয়ে আঘাত করা যাবে না। লাঠির দ্বারা শাস্তি প্রদান হত্যাকারীর শাস্তি হিসেবে ব্যাবহার করা যাবে। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে লাঠি দ্বারা প্রহার করতে পারবে না। কোন জীবন্ত প্রাণীর মাথায় অথবা মুখে অথবা বুকে অথবা পেটে আঘাত করা অনুমোদন যোগ্য নয়। পুঙ্গ মানুষের ক্ষেত্রেও যাদের শক্তি এবং সামর্থ্য আছে তাদের নামায আদায় করা ফরয। **অশেষ রহমতের** চতুর্থ অংশে নামায সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

কোন ওযর থাকলে

যদি নিয়মিতভাবে কারো শরীর থেকে কোন কিছু বের হতে থাকে, তবে তা **ওজর**, (এবং যে ব্যক্তি এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান, তাকে ওজরে আছেন বলা হয়।) যে ব্যক্তির মুত্ররোগ, ডায়রিয়া, বায়ু সমস্যা, রক্তপাত, কোন আঘাত থেকে রক্তপাত, ক্ষত বা আলসার থাকলে, আঘাত বা ফুলে যাওয়ার কারনে চোখ দিয়ে পানি পড়ার সমস্যা থাকলে এবং যে মহিলা **ইস্তিহাদে** ভুগছেন তাদের বলা হয় **ওজরে** আছেন। তাদেরকে এই সকল ওজর পরিত্যাগ করতে হবে নিয়ম মেনে যেমন গতিরোধ করে, মনোযোগ দিয়ে এবং বসে অথবা ইশারায় নামাজ আদায়

[মুত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার প্রশ্রাবের রাস্তায় তুলার থলি ব্যাবহার করবেন। যদি সিনথেটিক কটন ব্যাবহার করা হয়, এটি কিডনির ক্ষতি করতে পারে বা ইনফেকশান হতে পারে। মূত্রত্যাগ হওয়ার সময়, থলিটি স্বাভাবিক ভাবে শুষে নেয়।যদি অতিরিক্তি পরিমান মুত্র বের হয়ে যায় তবে, থলি থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার ওজু ভেঙ্গে যাবে। মুত্র বের হয়ে আন্ডার ওয়ার নোংরা হওয়া যাবে না, যা একটি কাপড় পেঁচিয়ে রোধ করা যায় মুত্র নালির আশেপাশে, এটি খুব সহজেই তিন কোনায় পিন আটকিয়ে তৈরি করা যায়। এরপরেও যদি প্রচুর পরিমান মুত্র বের হয়ে আসে, কিছু তুলা কাপড়ের মধ্যে রাখতে হবে। সংযোগের ফাকা জায়গায় পুরনের জন্য সেফটি পিন দিয়ে একটি কাগজ লাগানো যেতে পারে, এবং ফাকা জায়গা বন্ধ করা যেতে পারে। এই ফাকা জায়গাটি খলা খুব সহজ হয় যাতে করে কাপড়টি বের করে ধোয়া যায়। এই সমস্যার ব্যক্তিরা পকেটে সব সময় তিন থেকে পাঁচ টি কাপড় রাখবেন। সুতা দিয়ে এই কাপড়টি তৈরির ক্ষেত্রে (১২X১৫) সেন্টি মিটারের হিসেব করতে হবে, এবং কৌণিক ভাবে ৫০ সেন্টি মিটার হবে।

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং কিছু নির্দির্ষ্ট মানুষের জন্য লিঙ্গ হ্রাস পায় যে কারনে কাপড় যা পেঁচানো থাকে তা বের হয়ে আসতে পারে। এরকম লোক একটি রুমালকে থলির মত করে লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ প্রতিস্থাপন করে তার মুখ বন্ধ করে দেবেন। যদি মুত্রের পরিমান এক দিরহাম বা ৪,৮০ গ্রামের বেশী হয় তবে কাপড়টি পরিবর্তন করতে হবে। যখন নামাযের সময় শেষ হয়, তার ওযুর ওজর অকার্যকর হয়ে যায়। এই ওজর ছাড়াও নামায শেষ হওয়ার আগে অন্য একটি ওজর আবির্ভাব হলে তার ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ধরুন নাক থেকে রক্তপাতের সময় ওযু করেছেন, আপনার ওযু টি নষ্ট হয়ে যাবে যদি অন্য নাকে পুনরায় রক্তপাত শুরু

হয়। হানাফি এবং শাফি মাজহাবের মতে, ওজরের অন্তর্ভূক্ত হবে যদি নামাযের সময়ের মধ্যে নিলুফার অব্যাহত থাকে। যদি এরকম হয়, সাময়িকভাবে রক্তপাত বন্ধ থাকে ওযু করে ফরয নামায আদায়ের আগে পর্যন্ত, তিনি ওজরের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

কোন ব্যাক্তি একবার ওজরের মধ্যে আসলে তা নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে প্রতিবার যতক্ষণ তা পুনরায় না ঘটে, যদি প্রত্যেক নামাযে শুধু একবার রক্তপাত হয় বা একফোঁটা রক্ত দেখা যায়। যদি নামাযের সময় কোন রক্ত না দেখা যায়, তবে তিনি ওজরের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

যদি কোন ব্যক্তির ওজরের কারন কাপড়ে লেগে থাকা নাজাসাতের[১] পরিমান এক দিরহামের বেশিহয়, তবে লেগে থাকা অংশটুকু পরিষ্কার করা প্রয়োজন যদি আর অপরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। **আল ফিকাহ আল লা মাঝহাবিল আল এরবা** কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "হানাফি মাঝহাবের মতে দুটি কাওয়ালের অনুপস্থিতির কারনে কোন ব্যক্তি ওজরের অন্তর্ভূক্ত হবেন, প্রথম কাওয়ালের মতে, যা ওযু নষ্ট করে দেয় এবং তা নামাযের অরধেক সময়ের পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং যার শুরু এবং শেষ জানা যায় না। দ্বিতীয় কাওয়ালের মতে, কোন ব্যক্তি ওজরের অন্তর্ভূক্ত হয় যখন রক্তক্ষরণ শুরু হয়, যদিও প্রথম কাওয়ালের দুটি শর্ত উপস্থিত থাকে।

কোন ব্যক্তির ওযু নষ্ট হয় না। রক্তক্ষরণ বন্ধের সময় যদি জানা যায় তবে নামায আদায় শুরু করবার পূর্বে ওজু করে নেয়া মুস্তাহাব। বয়স্ক ব্যক্তি ব্যক্তি যিনি হানাফি অথবা শাফি মাঝহাবের এবং যার কোন ওজর নেই, তার জন্য মালিকী মাঝহাবের কাওয়াল অনুসরণ করা উত্তম।„]

যদি কোন ব্যক্তির ওযুর কারনে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা তার অসুস্থতা বেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন তিনি তায়্যামুম করবেন। এটি কোন মুসলিম কিংবা আদিলের নিজস্ব সচেতনতা কিংবা কোন ডাক্তারের পরামর্শে করতে হবে। তিনি যদি ভীষণ পাপী হয়ে না থাকেন তবে কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হবে। অসুস্থতার অন্যান্য সম্ভাব্য কারনসমূহঃ শীতের আবহাওয়া এবং আশ্রয়ের কোন জায়গা না থাকলে; পানি গরম করার জন্য কিছু না পেলে অথবা সর্বজনীন গোসলখানা ব্যাবহারের জন্য অর্থ না থাকলে। হানাফি মাঝহাবের মতে আপনি যত ইচ্ছা ফরজ নামায আদায় করতে পারেন একটিবার তায়াম্মুম করার পরে। মালিকী এবং শাফি মাঝহাবের মতে প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে তায়াম্মুম করতে

হবে। ওযুর সময় ধোয়া হয় এরকম অঙ্গ প্রত্তঙ্গে যদি ক্ষত থাকে তবে তিনি তায়াম্মুম করবেন।

যদি ক্ষতগুলো অর্ধেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জুড়ে থাকে, তবে ক্ষত না থাকা অংশ সমূহ ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ক্ষতের উপর দিয়ে মাসেহ করতে হবে।

[১] রক্ত, মূত্র, মদ ইত্যাদির জিনিস আপনার শরীরের কাপড় এবং যেখানে নামায আদায় করবেন সেখান থেকে পরিষ্কার করতে হবে| বিস্তারিত **অশেষ রহমত** কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখুন।

যেহেতু গোসলের সময় পুরো শরীরই একটি অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়, যদি পুরো শরীরের অর্ধেকে ক্ষত থাকে তবে তায়াম্মুম করতে হবে। যদি ক্ষত আপনার শরীরের অর্ধেক জুড়ে থাকে, আপনি ভালো অংশগুলো ধৌত করবেন এবং ক্ষতের উপর মাসেহ করবেন। যদি মাসেহ ক্ষতের পরিমান বৃদ্ধি করে তবে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করতে হবে। এটি করাও যদি ক্ষতিকর হয় তবে আপনাকে ঐ অংশ মাসেহ করতে হবে না।

যদি ওয অথবা গোসলের সময় মাথা মাসেহ করলে ক্ষতি হয়, তাহলে মাথা মাসেহ না করলেও চলবে। যদি কোন বাক্তি একজিমা কিংবা ক্ষতের কারনে হাত দিয়ে পানি ব্যাবহার করতে পারেন না, তিনি তায়াম্মুম করবেন। এটির জন্য তিনি জমিনে অথবা পাথর অথবা মাটির দেয়ালে হাত এবং মুখমণ্ডল আলতকরে ঘষবেন। যদি কোন বাক্তির হাত পা না থাকে এবং তার সমস্ত মুখমণ্ডলে ক্ষত থাকে তবে তিনী ওযু ছাড়ায় নামায আদায় করবেন। যদি কোন বাক্তি ওযুর জন্য তাকে সাহায্য করার কাউকে খুজে না পান তবে তিনি তায়াম্মুম করবেন। তার সন্তান অথবা তার ভৃত্য অথবা তার কোন অধীনস্থ বাক্তি তাকে সাহায্য করবেন ওজু করতে। তিনি অন্যদের কেউ সাহায্যের জন্য বলতে পারবেন। যাই হউক অন্যদের তাকে সাহায্য করতে হবে না। স্বামী স্ত্রী নিজেদেরকে ওযুর জন্য সাহায্য করতে হবে না।

ধরা যাক কোন বাক্তি রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য অথবা ভেঙ্গে যাওয়া হাড়ের ক্ষতের উপর ব্যান্ডেজ করেছেন, যদি তিনি অঙ্গটি ঠাণ্ডা অথবা গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে না পারেন বা মাসেহ করতে না পারেন, তবে গোসল বা ওযু করার সময় উক্ত অঙ্গের অর্ধেকের বেশী মাসেহ করবেন। যদি কোন কারনে এটি ক্ষতিকর হয়, তবে তা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। সুস্থ অংশের উপর মাসেহ করতে হবে। ব্যান্ডেজ

রত অবস্থায় ওযু করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি মাসেহ করার পর ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করা হয়, তবে নতুন ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করার প্রয়োজন নেই, যদি তা পুনরায় পরিবর্তন করা হয় তবুও।

অসুস্থতার সময় নামায

যদি কেউ দাঁড়াতে না পারে বা মনে করে দাঁড়ালে তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে, তবে তিনি বসে নামায আদায় করবেন, তারা রুকুর জন্য একটু ঝুকবেন, এরপর বসে থেকেই মেঝেতে তাদের নাক এবং কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করবেন।তারপর তারা এমনভাবে বসবেন যা তাদের কাছে সহজ হয়। নিল অথবা পা আড়াআড়ি করে হাঁটুর পাশে হাত রেখে উবু হয়ে শরীর টেনে বসতে পারবেন। মাথা ব্যাথা দাঁত ব্যাথা এবং চোখের প্রদাহ অসুস্থতা ধরা হবে।শত্রুর দৃষ্টিগোচর হওয়াও ওজরের অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে যার ওযু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তিনি বসে নামায আদায় করবেন। যদি কোন বাক্তি কোন কিছুতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারেন তবে হেলান দিয়ে আদায় করবেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে তকাবীর ইফতিতাহ দিয়ে নামায শুরু করবেন এবং ব্যাথা শুরু হলে বসে পড়বেন। যদি কোন বাক্তি সিজদা করতে অক্ষম হয় তবে, তিনি দাঁড়িয়ে আয়াত পাঠ করবেন, এরপর রুকুর জন্য বসে ইশারায় রুকু আদায়ের পরে সিজাদহের জন্য আরেকটু বেশি মাথা নত করে আদায় করবেন। যারা শরীরটাকে নত করতে পারবেন না তারা মাথা নত করবেন। কোন কিছুর উপরে সেজদা করার প্রয়োজন নেই। কোন কিছুর উপর সিজদা করলে নামায সহিহ হবে কিন্তু একটি মাকরুহ করা হবে, কেননা জমিন থেকে উঁচুতে কোন কিছুতে সিজদা আদায় করা মাকরুহ। বসে এবং হেলান দিয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হলে তার জন্য শুয়ে ইশারায় নামায আদায় করা অনুমোদিত নয়।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএকজন বাক্তিকে তার সামনে একটি বালিশ রেখে সিজদা করতে দেখলেন, তিনি বালিশটি তুলে ছুড়ে ফেল্লেন। অবিলম্বে লোকটি কাঠের একটি বস্তু তার সামনে রাখলেন।তিনি এটিও ছুড়ে ফেল্লেন এবং বললেনঃ "**জমিনের উপরে আদায় করো, [তমার কপাল জমিনে রেখে]! তুমি যদি সেটি করতে অপারগ হও, রুকুর চেয়ে আরেকটু বেশী অবনত**

হয়ে ইশারায় আদায়!„বাহর উরাইক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে(**জায়নাল আবেদিন বিন ইব্রাহিম ইবনি নুজায়মি মিশ্রি রাহমাতুল্লাহ আলাহি**, ১৯২৬ – ৯৭০ [১৫৬২ খ্রিস্টাব্দ], মিশর, এটি লিখেছেন **কেনয উদ দেকাইক** কিতাবের সংক্ষিপ্তকরণে, যা **আবুল বেরাকাত হাফিধ উদ দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমেদ নেসেফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি** ৭১০ হিজরি [১৩১০ খ্রিস্টাব্দ, বাগদাদ] লিখেছেন, সূরা আল ইমরানের আকশত একানব্বই তম আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে। যারা পারে না তারা বসে নামায আদায় করে। এবং যারা এটিও পারে না, তারা শুয়ে নামায আদায় করবে।„ যখন ইমরান বিন হুসায়িন রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতাকে বললেন: "**দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো! যদি তুমি তা না করতে পারো, তবে এক পাশে হেলান দিয়ে অথবা শুয়ে নামায আদায় করো**।„[যেমনটা দেখা যায়, যদি কেউ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারেন তাহলে বসে আদায় করবেন। যদি কেও কোন ভাবেই বসে থেকে নামায আদায় করতে না পারে তবে শুয়ে থেকে নামায আদায় করবে। যারা জমিনে বসতে পারে, বাসে কিংবা উড়োজাহাজে ভ্রমন করছে, আরাম চেয়ার কিংবা পা ঝুলিয়ে নামায আদায় করা অনুমোদনযোগ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে জামাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারেন তবে তিনি বাসায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন। তেইশটি ওজরের কারনে জামাতে নামায না আদায় করলেও হবে। নিম্নোক্ত কারণগুলোর ক্ষেত্রে শুক্রবারের নামাযের জন্য আপনার প্রস্থান না করা জায়েজ: বৃষ্টি; অসহ্য গরম কিংবা অত্যন্ত ঠাণ্ডা; আপনার সম্পদ এবং জানের উপর আক্রমনের ভয় থাকলে; ভ্রমনের সময় আপনার সহযাত্রীদের আপনাকে পরিত্যাগের শঙ্কা থাকলে; ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে; দায়গ্রস্থ কোন গরিব মানুষের ধরা পড়ার এবং নিগৃহীত হওয়ার ভয় থাকলে; অন্ধ হলে; হাটার জন্য পা অক্ষম হলে; একটা পা কাটা হলে; পঙ্গু হলে; কাদা; হাটতে সক্ষম না হলে; হাটতে না পারার মত বয়স্ক হলে; ফিকাহের কোন অংশ বাদ পড়ার ভয় থাকলে; কারো প্রিয় খাবার হাত ছাড়া হওয়ার ভয় থাকলে; কোন ভ্রমনের জন্য বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে; কোন মেডিক্যাল কর্মী নিজের দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয়ার মত উপস্থিত না থাকলে; ভীষণ ঝড় বাদলের রাত্রি; মূত্রনালির জরুরি অবস্থা হয়ে থাকলে; কোন রোগির যদি এরকম ভয় থাকে তার রোগ বৃদ্ধির অথবা যিনি চিকিৎসায় কর্তব্যরত রয়েছেন তার দায়িত্ব নেয়ার মত যদি কেউ না থাকেন উপস্থিত; বয়সের কারনে হাঁটতে না পারলে।

কোন বাহন ব্যাবহার না করে হেটে মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করা বুদ্ধিমানের কাজ। মসজিদে কোন চেয়ার কিংবা আরামকেদারায় বসে ইশারায় নামায আদায় করা অনুমোদিত নয়। ইসলামে বর্ণীত নয় এমন কাজ করা **বিদাত**। এবং ফিকাহ কিতাবের মধ্যে লেখা রয়েছে বিতাদ করা কবিরা গুনাহ।]

যদি কারো জন্য কিবলার দিকে ঘুরে নামায আদায় করা সম্ভব না হয় তবে তার সুবিধামত যেকোনো দিকে ফিরে নামায আদায় করবেন| যদি কেউ সোজা হয়ে শুয়ে থাকেন বা তার পিঠে হেলান দিয়ে থাকেন তবে নরম কোন কিছু তার মাথার নিচে দিতে হবে যাতে করে তার মুখ কিবলার দিকে ঘুরে থাকে। হাঁটু গুলো সমান ভাবে রাখতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ইশারায়ও নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করতে না পারে তার জন্য নামায ক্বাযা করা জায়েজ। নামায আদায় করা অবস্থায় যদি অসুস্থ হয়ে পরেন তবে যতক্ষণ সম্ভব নামায আদায় করবেন।

যদি কোন ব্যক্তি বসে থেকে নামায আদায় করা অবস্থায় সুস্থ হয়ে যান তবে তিনি সেই অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন। জ্ঞানহীন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করবেন না। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ের শেষ হওয়ার পূর্বেই তার জ্ঞান ফিরে তবে তিনি ক্বাযা নামায আদায় করবেন।যদি ছয় ওয়াক্ত নামাযর সময় পার হয়ে যায় তবে তাকে নামায আদায় করতে হবে না। সঠিক সময়ে ইশারায়ও নামায আদায় না করা হলে তার ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা ফরয। যদি কোন ব্যক্তি ক্বাযা নামায আদায়ের পূর্বেই মৃত্যু সজ্জায় উপনিত হন তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার আদায় না করা নামাযের ইশাকাতের ফিদিয়া আদায় করার জন্য উইল করে যাওয়ার ওয়াজিব নয়। তবে তিনি যদি পুনরায় সুস্থ হয়ে যান এবং নামাযের ক্বাযা আদায়ের জন্য সময় পান তবে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তিনি তার উইলে নির্দেশ না দিয়ে যান তবে তার উত্তরাধিকারীর জন্য কোন ইসলামি চিন্তাবিদের পরামর্শ ক্রমে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যায় করে ইসাকাত আদায় করা অনুমোদনযোগ্য। এখানে আমরা নেয়ামতে ইসলাম থেকে নেয়া অংশের অনুবাদ শেষ করছি।হাদিস শারিফে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:**চব্বিশটি কারন রয়েছে যা মানুষের দারিদ্রতা ডেকে নিয়ে আসে:**

১–দারুরাত ছাড়া দারিয়ী প্রস্রাব করলে। (দারুরাত, যা আপনাকে কাজটি করতে বাধ্য করে বা অন্য কোন উপায় নেই এটি ছাড়া|)

২–জুনুব অবস্থায় খাবার খেলে। (যখন আপনাকে গোসল করতে হবে)

৩–ক্ষুদ্র খাবারের যার উপর পিঁপড়া হেঁটেছে তা অবজ্ঞা করে না খাওয়া।

৪–পেয়াজ এবং রশুনের খশা পড়ানো।

৫–বড়দের সামনে দিয়ে আগ বাড়িয়ে হাটা।

৬–পিতামাতাকে নাম ধরে ডাকা।

৭–গাছ অথবা গুল্মের কাঠির সাহায্যে কারো দাঁত তোলা হলে।

৮–কাদা দিয়ে হাত ধোয়া হলে।

৯–গোবরাটের অপর বসলে।

১০–শৌচাগারে ওযু করলে।

১১–ধোয়া হয়নি এমন কোন পাত্রে খাবার রাখা হলে।

১২–কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেলাই করা হলে।

১৩–ক্ষুধা লাগলে পেয়াজ খেলে।

১৪–অন্য কারো রুমাল ব্যাবহার করে মুখ মুছলে।

১৫–ঘরে মাকড়শা বসবাস করতে দিলে।

১৬–জামাতে নামায আদায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বের হয়ে গেলে।

১৭–বাজারে সবার আগে যেয়ে সব শেষে আসলে।

১৮–কোন গরিব মানুষের কাছ থেকে রুটি কিন নিলে।

১৯–পিতামাতার সাথে উচ্চস্বরে কথা বললে।

২০–কোন কাপড় ছাড়াই ঘুমালে।

২১–কোন পাত্র বা বাসন না ঢেকে রাখলে।

২২–মোমবাতি ফু দিয়ে নেভালে।

২৩–বিসমিল্লাহ বলা ছাড়াই সবকিছু শুরু করলে।

২৪–দাঁড়িয়ে থেকে কারো শালওয়ার পরলে।

যদি কোন বাক্তি ঘুমাতে যাওয়ার আগে **সূরা কাওসার** পাঠ করে এবং বলে, ”হে রাব আমাকে আগামিকাল সকালের নামাযের সময় জাগ্রত করুন,„ বিজিনিল্লাহি তায়ালা, লোকটি নামাযের সময় জাগ্রত হয়ে যাবে।

নামযের গুরুত্ব

আব্দুল হক বিন সায়ফুদ্দিন দাহ্লআভি রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহির (৯৫৮/১৫৫১ খ্রিস্টাব্দ] –১০৫২ / ১৬৪২], দিল্লী) **আশয়াতুল লাময়াত** কিতাবের মধ্যে অনেক হাদিসের বর্ণনায় নামাযের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

ওয়ালিয়া উদ্দিন খাতিবী তেব্রিজি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তায়ালার [৭৪৯ হিজরি/ ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ] পার্সিয়ান হাদিসগ্রন্থ **মিশাকাতুল মাসাবিহের** যা **মাসাবিহ** কিতাবের একটি সংক্ষিপ্ত রুপ যা লিখেছেন ইমাম বেঘাওি হুসেইন বিন মেসুদ মুহিউস সন্নাহ রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি [৫১৬ হিজরি/ ১১২২ খ্রিস্টাব্দ]। **আশয়াতুল লাময়াত** কিতাবটি চার খণ্ডের। এটির নবম সংস্করণ বের হয় ১৩৮৪ হিজরি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ লখনৌ, ভারত হতে।নামাযকে আরবি ভাষায় বলা হয় **সালাত**। নামাজের সঠিক অর্থ ইবাদাত, রাহমত [সমবেদনা, ক্ষমা] এবং ইস্তেগফার [আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা]।এই তিনটি কারণে নামাযকে বলা হয় সালাত।

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ” **পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমার নামায পরবর্তী জুমা পর্যন্ত আর পবিত্র রমযান মাসের রোযা পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্তকৃত যাবতীয় (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফফারা হবে। কবীরা গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা ব্যাক্তির সগীরা গুনাহসমূহ মাফের সবব (কারণ) হবে**„ ।নামায মধ্যবর্তী সময়ে কৃত সগীরা গুনাহসমূহের মাঝে বান্দার হক হরণকারী গুনাহ ব্যতীত বাকীগুলি মুছে দেয়। মাফ পেতে পেতে যাদের সগীরা গুনাহের খাতা শূন্য হয় তাদেরকৃত কবীরা গুনাহের কারণে প্রাপ্ত আযাবের তীব্রতাকে হ্রাস করে তবে মুছে দেয় না। কেননা কবীরা গুনাহ থেকে পরিত্রাণের জন্য বান্দাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। যাদের কবীরা গুনাহ নাই তাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। উপরোক্ত হাদিস **মুসলিম শরীফেও** বর্নিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ত্রুটিগুলি থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য জুমার নামাযসমূহ সবব (উপায়) হয়। আর জুমা নামাযসমূহের ত্রুটিগুলিকে রমযানের রোযা বিলুপ্ত করে।

২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **`যদি কারো বাড়ির সামনে একটি পুকুর থাকে এবং সে প্রতিদিন তাতে পাঁচবার গোসল করে তার গায়ে কি কোন ময়লা থাকবে?, সাহাবিরা উত্তর দিলেন:** ” নাহ রাসুলুল্লাহ কিছু থাকবে না„। তিনি বললেন: **”প্রতিদন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তেমন। আল্লাহ তায়ালা, যে বাক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়**

করে তার গুনাহসমূহ মুছে দেন।„ হাদিস শারিফটি **বুখারি এবং মুসলিম** শারিফে রয়েছে।

৩- আব্দুল্লাহ ইবনে মেসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কোন পুরুষ যদি কোন বেগানা নারীকে চুমু খেয়েছিল।আনসারের একজন ব্যক্তি ঐ সময় খেজুর বিক্রি করছিলেন, এসময় একজন নারী আসে খেজুর কিনতে, ঐ নারীকে দেখে তার কামের উদ্রেক হয়।তিনি তাকে বলেন, আমার বাড়িতে আরও ভালো খেজুর আছে, আমার সাথে আসো যাতে আমি তোমাকে সেগুলো দিতে পারি। যখন তারা বাসায় পৌঁছালো, লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরলো এবং চুমু খেল। সেই নারী তাকে বলল, কি করছেন আপনি? আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন। তিনি রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন এবং বললেন তিনি কি করেছেন। রাসুলুল্লাহ আল্লাহ্র অহির জন্য অপেক্ষা করলেন। এরপর ব্যাক্তিটি ইবাদাত করলো। আল্লাহ তায়ালা সূরা হুদের একশত পনের নম্বর আয়াত নাযিল করলেন: **"দিনের দুই ভাগে এবং যখন সূর্য অস্ত যায় নামায আদায় করো। নিশ্চয় ভাল কাজ খারাপ কাজকে ধ্বংস করে।„**দিনের দুই ভাগ হচ্ছে দুপুরের আগে এবং দুপুরের পরে। এটি সকাল, দুপুর এবং বিকেলের নামায। দিনের আলোর শেষের দিকে মাগরিবের নামায এবং তার কিছুখন পরে ইশার নামায। এই আয়াতে কারিমে বলা হয়েছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। লোকটি জিজ্ঞেস করলো: " হে রাসুলুল্লাহ ! এটি কি শুধু আমার জন্য, নাকি সকল উম্মাতের জন্য? তিনি বললেন: **"এটি সকল উম্মাতের জন্য।„** হাদিস শারিফটি বুখারি এবং মুসলিম শারিফে এসেছে।

৪- আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "একজন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন এবং বললেন: (আমি একটি পাপ করেছি যার কঠিনতম শাস্তি উচিত!) রাসুলুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তিনি কি পাপ করেছেন। যখন নামাযের সময় আসলো নবীজি নামায আদায় করলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন,আমি একটি পাপ করেছি, যার সাস্তি হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী আমাকে শাস্তি দেন। তিনি বললেন: **"তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায়?„ লোকটি বলল:হ্যাঁ আমি করেছি**। তখন রাসুলুল্লাহ বললেন :**দুঃখিত হয়ো না, আল্লাহ তায়ালা তমার গুনাহ ক্ষমা করে**

দিয়েছেন!এই হাদিস শারিফটি ইসলামের প্রধান দুটি কিতাব সাহিহায়ান এর মধ্যে লেখা রয়েছে। লোকটি ভেবেছিল সে একটি গভীর পাপ করেছে যার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। নামায আদায়ের মাধ্যমে তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় এরমানে হচ্ছে পাপটি গুরুতর ছিল না। অথবা তিনি **তাযির** শাস্তির বদলে হাদ্দ শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। তিনি হাদ্দ শাস্তি অব্যাহত রাখতে চাননি এটি তাই নির্দেশ করে। হাদ্দ হচ্ছে ইসলামে বর্ণীত শাস্তির একটি মাধ্যম। তাজির শাস্তিগুলো বিভিন্ন রকমের, এগুলো ইসলামিক বিচারকার্যের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।তাজির অর্থ কোন মানুষকে ভালো ব্যাবহারের মানুষ বানানো। ইসলামে,হাদ্দের চেয়ে কম শাস্তি দিতে হবে।

[১]**অশেষ রহমত** কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখুন।
[২]**অশেষ রহমত** কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম পরিচ্ছেদ দেখুন।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, **"যথাযথ ওয়াক্তে নামায আদায় করা„**। কিছু হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, **" মহান আল্লাহ ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই আদায় করা নামাযকে অধিক পছন্দ করেন„**। এরপর কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, মা-বাবার খেদমত। তারপর কোন আমলটি পছন্দ করেন? বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাকে। এই হাদিসটি বিখ্যাত দুইটি সহিহ হাদিস কিতাব তথা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্নিত আছে।অপর এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, **" সর্বোত্তম আমল হল অপরকে খাবার খাওয়ানো„**। আরেকটি হাদিস শরীফে আছে, " সালামের প্রচলন ও প্রসার হল শ্রেষ্ঠ ইবাদত„। অন্য একটি হাদিস শরীফে আছে, " রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়া সর্বোত্তম ইবাদত„। আরেকটি হাদিসে আছে, " কারো হাত ও মুখের দ্বারা অন্য কারো কষ্ট না পাওয়াটা সবচেয়ে মূল্যবান আমল„। এক হাদিসে আছে, " জিহাদ হল সবচেয়ে মূল্যবান আমল„। অপর এক হাদিসে আছে, **" সবচেয়ে মূল্যবান আমল হল মাবরুর হজ্জ„**।অর্থাৎ বান্দার হক ও কাযা নামায না থাকা অবস্থায় যে হজ্জ আদায় করা হয়। `আল্লাহ্র জিকির করা, এবং `নিয়মিত পালন করা আমলসমূহ, সর্বোত্তম বর্ননাকারী হাদিসও রয়েছে।এর কারণ হল বিভিন্ন প্রশ্নকারীর অবস্থা সাপেক্ষে তাদের উপযোগী বিভিন্ন

জবাব দেয়া হয়েছে। অথবা সময়োপযোগী জবাব প্রদান করা হয়েছে। যেমন ইসলামিয়্যাতের শুরুর দিকে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মূল্যবান আমল ছিল জিহাদ। (আমাদের এই সময়ে সর্বোত্তম আমল হল লেখনীর মাধ্যমে, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে কাফিরদের, মাজহাব বিরোধীদের মোকাবিলা করা, আহলে সুন্নাতের ই,তিকাদকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া। এরূপ জিহাদে লিপ্ত ব্যাক্তিদেরকে যারা অর্থ দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, শ্রম দিয়ে সাহায্য করবে তারা এদের দ্বারা অর্জিত সওয়াবের ভাগীদার হবে। পবিত্র আয়াত ও হাদিসসমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকাত ও সদকার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হল নামায।তথাপি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জারত কোন ব্যাক্তিকে খাবার-পানীয় ইত্যাদি দান করে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা নামায আদায়ের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আমল অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে।)

৬- জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ **(মানুষ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে সীমানা হচ্ছে নামাজ পরিত্যাগ করা।)** নামায মানুষকে অবিশ্বাসী হতে দেয় না। যদি এটি পরিত্যাগ করা হয়, মানুষ অবিশ্বাসীতে পরিনত হতে শুরু করে। হাদিস শারিফটি **মুসলিম** শরিফে লিখা আছে। এই হাদিসটি প্রমাণ করে নামায পরিত্যাগ করা ভুল কাজ। অনেক সাহাবী বলেছেন যারা বিনা কারণে নামায পরিত্যাগ করে তারা অবিশ্বাসীতে পরিনত হয়। শাফি এবং মালিকী মাযহাব অনুসারে, তিনি অবিশ্বাসী হয়ে যায় না, যাই হউক তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। মাহাফি মাযহাবের মতে তাকে প্রহার করতে হবে এবং জেলে বন্দি করতে হবে যতদিন নামায আদায় শুরু করে।

৭. উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, "মহান আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। যে ব্যাক্তি সুন্দরভাবে অযু করে ওয়াক্তমত এই নামাযগুলি পড়বে, এর রুকু ও সেজদা সমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে তাকে ক্ষমা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা কথা দিয়েছেন।যে ব্যাক্তি নামায আদায় করল না তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন আবার আজাবও দিতে পারেন„। এই হাদিস শরীফটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ নিজ নিজ হাদিস কিতাবে

বর্ণনা করেছেন। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামাযের অন্যান্য শর্তসমূহসহ রুকু ও সেজদার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। মহান আল্লাহ তায়ালা কখনই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। অতএব, সহীহ- শুদ্ধভাবে নামায আদায়কারী ব্যাক্তিকে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

৮- হযরত আবু ইমাম বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ বলেছেন- **পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, রোযা রাখ একমাস, তোমার সম্পদের যাকাত দাও, নির্দেশসমূহ মানো, তোমার রবের জান্নাতে প্রবেশ কর**। অর্থাৎ যারা নামায আদায় করে, রোযা রাখে, তাদের সম্পদের যাকাত দেয় এবং তাদের উপর আল্লাহ্ তায়ালা এবং তার খালিফাদের নির্দেশ মেনে চলে পৃথিবীতে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এই হাদিস শারিফটি উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমেদ এবং তিরমিযী। যদি কোন ব্যাক্তি ঘুমাতে যাওয়ার আগে **সূরা কাওসার** পাঠ করে এবং বলে, "হে রব আমাকে আগামী কাল সকালের নামাযের সময় জাগ্রত করুন„ বিইজনিলাহি তায়ালা লোকটি নামাযের সময় জাগ্রত হয়ে যাবে।
৯. আসহাবে কিরামদের মধ্যে বিখ্যাত বুরাইদা-ই আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, **"তোমাদের সাথে আমার সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল নামায। নামায ত্যাগকারী ব্যাক্তি কাফিরে পরিণত হয়„**। এই হাদিস থেকে নামায আদায়কারী ব্যাক্তির মুসলমান হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। আরো বোঝা যায়, যে ব্যাক্তি নামাযকে গুরুত্ব দেয় না, অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের তালিকায় প্রথমে স্থান দেয় না, নামাযকে ফরয হিসেবে গ্রহন করে না এবং এ কারণে আদায় করে না সে কাফির হয়ে যায়। ইমাম আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ উপরোক্ত হাদিস শরীফটি নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০- আবু জর গেফারি বলেছেন, "শরতের দিনে, রাসুলুল্লাহর সাথে ঘুরছিলাম„ পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি দুটি ডাল ভাঙ্গলেন আকস্মিক। তিনি বললেন, **ও আবু জার, যখন কোন বাক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত করে, তখন তার পাপসমূহ এভাবে পাতা ঝরার মত করে ঝরে পড়ে**। ইমাম আহমেদ এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

১১- যাইদ বিন খালিদ জুহানি থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**কোন মুসলমান ব্যাক্তি যদি সহীহ-শুদ্ধভাবে খুশু সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়**„। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেন। এই হাদিস শরীফটি ইমাম আহমদের কিতাবে বর্ণিত আছে।

১২- আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "কোন ব্যাক্তি নামায আদায় করলে ঐ নামায কিয়ামতের দিনে নূর (আলো) ও বুরহান (দলিল) এ পরিণত হবে এবং তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির উছিলা হবে। আর নামাযকে মুহাফাজা (সংরক্ষণ) না করলে তা নূর ও বুরহানে পরিণত হবে না এবং সে নাজাত পাবে না। কারণ, ফেরাউন, হামান ও উবেই বিন খালাফ এর সাথে জাহান্নামে অবস্থান করবে„। দেখা যাচ্ছে যে, কোন ব্যাক্তি যদি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসহ যথাযথভাবে নামায আদায় করে তবে এই নামায কিয়ামতের সময়ে তার জন্য নূর হয়ে সঙ্গ দিবে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় না করলে, নামাযকে মুহাফাজা না করলে কিয়ামতের দিবসে কাফিরদের সাথে একত্রে থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের সাথে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। উবেই বিন খালাফ মক্কার কুখ্যাত কাফিরদের অন্যতম ছিল। উহুদের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মুবারক হাত দ্বারা তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ছিলেন। উপরোক্ত হাদিস শরীফটি ইমাম আহমদ ও দারিমী নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমান নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিরমিজি শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রসিদ্ধ তাবেয়ীদের অন্যতম আবদুল্লাহ বিন শাকিক বলেছেন, "সম্মানিত সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইবাদতসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র নামাজ ত্যাগ করাকে কুফর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন„।আবদুল্লাহ বিন শাকিক হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উসমান এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরী একশত আট সালে ইন্তিকাল করেছেন।

১৩- তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল্লাহ বিন শাফিক বলেছেন- "**আশহাবে কারিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ইবাদাতের মধ্যে শুধু নামায বাদ দিলেই**

অবিশ্বাসী হয়ে যায়।„ তিরমিজি এমনটি উল্লেখ করেছেন।আব্দুল্লাহ বিন শাফিক হাদিসটি সংগ্রহ করেছেন উমর, আলী, উসমান এবং আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর কাছ থেকে। তিনি ১০৮ হিজরি সনে মারা যান।

১৪- হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত তিনি বলেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, `তোমাকে যদি টুকরো টুকরো করে কেটেও ফেলা হয় কিংবা আগুন দিয়ে পোড়ানোও হয় তবুও মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করিও না । ফরজ নামায কখনো ত্যাগ করিও না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় । মদ পান করিও না। কেননা মদ সকল অনিষ্টের চাবি, ।এই হাদিস শরীফটি ইবনে মাযাহ এর গ্রন্থে উল্লেখ আছে । এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কেউ যদি ফরয নামাযসমূহ অবজ্ঞা ভরে ত্যাগ করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। যদি অলসতার কারণে ত্যাগ করে থাকে তবে সে কাফির না হলেও বড় গুনাহ সম্পন্নকারী হয়। তবে শরীয়তে যে পাঁচটি অবস্থাতে ফরয নামায আদায়ের দায়ভার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে সে অবস্থার কারণে আদায় না করলে গুনাহ হবে না। মদ ও অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় মানুষকে মাতাল করে, তার বিচার বুদ্ধি লোপ করে। আর বিচার বুদ্ধিহীন ব্যাক্তি সব ধরনের পাপ কাজ করতে সক্ষম।

১৫- আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে আলী! তিনটি কাজে কখনো দেরি করো না, যখন নামাযের সময় আসে সাথে সাথে তা আদায় করো। যখন মৃতের কবরের প্রস্তুতি শেষ হয় সাথে সাথে জানাজার নামায আদায় করো। যখন কোন মেয়ের যোগ্য পাত্র পাও, সাথে সাথে তাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও।ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহু তায়ালা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

কফুর অর্থ ধনি নয়, বা অনেক সম্পদের মালিক নয়। এর অর্থ একজন সহিহ মুসলিম, যে আহলে সুন্নাহর অনুসারী, নামায আদায় করে, নেশা করে না, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলে এবং জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জন করে। যারা তাদের জামাইয়ের কাছে সম্পদের আশা করে, তারা তাদের মেয়েদেরকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়। তারা তাদের মেয়েদের জাহান্নামে নিক্ষেপ

করে। একইভাবে মেয়েদের জন্যও নামায আদায় করতে হবে, অবশ্যই খোলা মাথা, হাতে এবং একা বাইরে যাবে না, এমনকি কোন নামাহরাম পুরুষের সাথেও না।]

১৬- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, `নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যারা নামায আদায় করে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আর যারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে আদায় করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, । এই হাদিসটি তিরমিযী শরীফে বর্নিত আছে। ইমাম শাফি এবং হাম্বলি মাজহাবের মতে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায সঠিক সময়ে আদায় করতে হবে। মালিকী মাজহাবও প্রায় একই কথা বলে। যাই হউক প্রচণ্ড গরমের সময় একজন ব্যাক্তি দুপুরের নামায কিছুটা দেরীতে আদায় করতে পারবেন। হানাফি মাজহাবের মতে রাত্রি এবং সকালের নামায কিছুটা দেরীতে পড়া উত্তম এবং মাসের যে সময় প্রচণ্ড গরম থাকে সে সময় দুপুরের নামায কিছুটা দেরীতে পড়া যায়। বিকেলের নামাযের সময় শুরুর পূর্বে দুপুরের নামায এবং অন্যান্য নামায পরবর্তি নামাযের সময় আসার পুর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়, ইমাম আবু হানিফার তারাফ্যান মতবাদ অনুসারে। বিস্তারিত **অশেষ রহমত** কিতাবের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদে দেখুন।

১৭- উম্মু ফারওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা কোন আমলটি সর্বোত্তম বলে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন, **`সর্বোত্তম ইবাদত হল ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা নামায**, । এই হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিযী এবং আবু দাউদ (রঃ) নিজ নিজ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নামায এমনিতেই সর্বোত্তম ইবাদত। ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যদি তা আদায় করা হয় তবে তা আরো উত্তম হয়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেন, `রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবনে একাধিকবার ওয়াক্তের শেষে নামায আদায় করতে দেখিনি, ।অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে একবার শুধু নামাযকে ওয়াক্তের শেষে আদায়

করেছিলেন।

১৮- আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি দ্বিতীয় বার কোনদিন রাসুলুল্লাহকে নির্ধারিত সময়ের পড়ে নামায আদায় করতে দেখি নি।

১৯-হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "যে সকল আল্লহ তায়ালার মুসলিম বান্দারা তাতাও নামায বার রাকাত আদায় করে ফরয নামাযের পরে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। „মুসলিম শারিফে এই হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পড়ে যে নামায আদায় করতেন সুন্নাত হিসেবে সেগুলোই সুন্নাত নামায, অন্যভাবে নফল নামায।

২০- আব্দুল্লহ বিন শাকিক তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম বলেছেন, আমি জানতে চেয়েছি আয়শা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে, যা রাসুলুল্লাহর নফল নামায। তিনি বলেছেন দুপুরের ফরয নামাযের আগে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, বিকেলের এবং রাতের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায, প্রত্যেক দিন সকালের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। মুসলিম, আবু দাউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২১- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, `রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে ফযরের দুই রাকাত সুন্নতকে সবচেয়ে বেশি নিয়মিতভাবে পালন করেছেন। এই হাদিস শরীফটি **বুখারী** শারীফেও আছে, **মুসলিম** শরীফেও আছে।এই হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযগুলির সাথে আদায়কৃত সুন্নত নামাযসমূহকে নফল নামায হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইসলামের মহান আলেম, আল্লাহ ভক্তদের নেতা, দালালাতপন্থী, বিদায়াতপন্থী ও মাজহাব বিরোধীদের বিপক্ষে আহলি সুন্নাতের শক্তিমান রক্ষক, সত্য দ্বীনকে প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত, বিদায়াতকে নির্মূলকারী বিখ্যাত মুজাহিদ, ইমাম- ই রব্বানী মুজাদ্দিদ- ই আলফে সানী আহমদ বিন আবদুল

আহাদ ফারুকী শেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত ইসলামের ইতিহাসে নজিরবিহীন, `মাকতুবাত ,নামক গ্রন্থের উনত্রিশতম **মাকতুবে** (পত্রে) বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু অনুমোদন করেছেন তা ফরয এবং নফল। ফরয ইবাদাতের সাথে নফলের তুলনায় নফলের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। নির্দিষ্ট সময়ে ফরয নামায আদায় করা এক হাজার বছর নফল আদায়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রকার নফল যেমন নামায রোযা যাকাত ফিকর সব একি রকম। অধিকিন্তু ফরয নামাযের সময় এর সুন্নাত এবং আদাবসমূহ পালন করা নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকালের নামায জামাতে আদায়ের পর হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতের দিকে তাকালেন, দেখলেন একজন সদস্য অনুপস্থিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কোথায়। তার সাথীরা বললেন, "তিনি প্রত্যেক রাতে নফল ইবাদাত করেন। ধারণা করা যায় ঘুমের কারণ তিনি জামাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি।„ আমিরুল মুমিনিন বললেন, "যদি সে সারারাত ঘুমিয়ে সকালে জামাতে নামায আদায় করে তবে তা অধিক উত্তম।„ মাকরুহ এবং নফল ইবাদাতসমূহ, তাফাক্কুর মুরাকাবা বাদ দিয়ে ফরয আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হাঁ যদি এগুলো একসাথে পালন করা যায় মাকরুহ না করে তবে তা অবশ্যই ফযিলতপূর্ণ। ফরয ছাড়া এসবের কোনই মূল্য নেই। এই কারণে, জাকাতের জন্য একটি স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া, নফল ইবাদাতের জন্য হাজার স্বর্ণ মুদ্রা খরচের চেয়ে উত্তম। যাকাতের মুদ্রা দেয়ার সময় এর আদবের দিকে লক্ষ রাখতে হবে, যেমন যাকাত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে দেয়া নফল আদায়ের জন্য দানের চেয়ে উত্তম। এছাড়া, যারা মাঝ রাতের পরে নফল নামায আদায় করতে চান, তারা অবশ্যই পূর্বের ক্বাযা নামায আদায় করবেন। আল্লাহ্র নির্দেশসমূহকে বলা হয় **ফরয**, তার নিষেধসমূহকে বলা হয় **হারাম**। আমাদের রাসুলের নির্দেশসমূহ **সুন্নাত** এবং তার নিষেধসমূহ **মাকরুহ**। এই সবগুলোকেই এক সাথে বলা হয় **আহকামে ইসলামিয়্যা**। ভালো চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং মানুষেকে সাহায্য করা ফরয। যারা আহকামে ইসলামিয়্যার কোন একটি নিয়ম অমান্য করে বা বিশ্বাস না করে তবে সে **কাফির, মুরতাদে** পরিনত হবে।

যারা এসবগুলোতেই বিশ্বাস করে তারা **মুসলিম**। যে সকল মুসলিম অলসতার কারণে ইসলাম মেনে চলে না তারা **ফাসিক**। যে সকল ফাসিক ফরয আদায় করে না এবং হারাম কাজ করে তারা জাহান্নামে যাবে। সেই ব্যাক্তির কোন কাজ এবং সুন্নাত কবুল হবে না। সেগুলোর জন্য কোন সওয়াব দেয়া হবে না। যদি কোন

ব্যাক্তি যাকাত দেয়, একটি মাত্র মুদ্রা খরচ করে, তার মিলিয়ন মুদ্রা খরচে ভালো কাজে কোন ফায়দা নেই। কোন সওয়াব দেয়া হবে না মসজিদ, বিদ্যালয় কিংবা হাসপাতাল এবং চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে। তারা এ নামাযের যে কোন একটি আদায় না করা হলে তার রাতের ইবাদাত কবুল করা হবে না। ফরয এবং ওয়াজিব ছাড়া যে সকল ইবাদাত করা হয় সে গুলো সুন্নাত নয় তো **নফল**। সুন্নাত হচ্ছে নফল ইবাদাত। এই বর্ণনা অনুযায়ী যারা ক্বাযা নামায আদায় করেন তারা এই সব সুন্নাতের ক্বাযা নামাযও আদায় করবেন একই সময়ে। ফরয আদায় করা এবং হারাম থেকে দূরে থাকা, মিলিয়ন নফল আদায়ের চেয়ে উত্তম। যারা ফরয আদায় করে না এবং হারাম কাজ করে তারা জাহান্নামে যাবে। তার নফল ইবাদাত তাকে রক্ষা করতে পারবে না। ইবাদাতে পরিবর্তন আনা **বিদাত**। ইবাদাতের সময় বিদাত করা হারাম এবং তা ইবাদাতকে বাতিল করে দেয়।

[১] এটি বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, নিকট আত্মীয়রা তাদের মধ্যে পড়বে না, যেমন নিজের স্ত্রী, শিশু বাবা মা যাদের আপনার সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

ফাসিক ইমামের পেছনে নামায আদায় করা যাবে না, যেমন যাদের স্ত্রী কন্যারা পর্দা করে না, যারা বিদাত করে যেমন লাউড স্পীকার ব্যাবহার করে।তার প্রচারণা এবং মনগড়াধর্মীয় কথা শোনা উচিত না।তার কিতাবসমূহ পড়া উচিত নয়। তার সাথে হাসি মুখে এবং ভদ্রভাবে কথা বলা উচিত তিনি বন্ধু হউন অথবা শত্রু। কার সাথে তর্ক করা উচিত নয়। একটি হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে: **(এক জন মূর্খের সাথে তর্ক করো না)**।

ইবাদাত হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি করে। পাপ হৃদয়কে দূষিত করে ফেলে, তার হৃদয় পুলকিত [ফয়য] হয় না। প্রত্যেকটি মুসলিমের ইমান, ফরজ, হারাম সম্পর্কে জানা উচিত। সেগুলো না জানা তার জন্য কোন ওজর হতে পারে না।এটি ঠিক এরকম, জানার পরেও বিশ্বাস না করা।

মাকতুবাত কিতাবটি ফার্সি ভাষায় লিখিত। হযরত ইমাম রাব্বানি ভারতের সেরহেন্দ শহরে ১০৩৪ হিজরি, ১৬২৪/ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত তুরকিশ কিতাব **হাকস যুনভেসি কালারি, সায়াদেত এবেদিয়্যা এবং এশাবে কারিম** এবং ফার্সি কিতাব **বেরেকাতে**র মধ্যে লেখা রয়েছে।

পূর্বের লেখা অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামযের নফল সুন্নাতের সমান। যেহেতু ফরয নামাযের পর আদায় করা হয়, সেহেতু অন্যান্য নামাযের চেয়ে এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় না করে তবে সে গভীর পাপ করবে, যদিও সে নামাযে অনেক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। সে ফারাও এবং হামানদের সাথে নরকে থাকবে। অন্যান্য নামায যেমন সুন্নাত নফল তাকে এই আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।এই জন্য নামাযের ফরয নামাযের ক্বাযা আদায় করতে হবে। ক্বাযা আদায়ে দেরি করা পাপ। এই পাপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ক্বাযা নামায আদায় করা ফরয, হাজার বার তওবা করার চেয়ে সুন্নাত আদায় করা অধিক উত্তম। যদিও কোন ওজরের কারণে সুন্নাত বাদ দেয়া যায়, তবে প্রত্যেকটা মুসলিমের এটি আদায় করা প্রয়োজন, কোন ওজর ছাড়া বাদ দেয়া নামাযের ক্বাযা আদায় করা ফরয। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে সকালের নামাযের সুন্নাত আদায় করা ওয়াজিব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্বাযা নামায আদায় করে এই পাপ থেকে বাঁচা যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্বাযা আদায়ের পর সুন্নাত আদায় করতে হবে নিয়মিত ভাবে।
কোন ওজর ছাড়া সুন্নাত আদায় না করা গভীর পাপের। আর যে সুন্নাত অস্বীকার করে সে কাফির।

যদিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন ওজরের কারনে ছেড়ে দেয়া নামাযের ক্বাযা আদায় করতে হবে, হানাফি মাঝহাবের আলেমদের মতে, ফরজ নামাযের ক্বাযা আদায়ের পূর্বে তার সুন্নাত আদায় করা যায়, যদিও নির্ধারিত সময়ে ওজর ছাড়া নামায আদায় না করা গভীর গুনাহ। যাই হউক এই ব্যাখ্যা এটি প্রমান করে না যে , কোন ওজর ছাড়া নামাযে দেরি করা অনুমোদনযোগ্য। উপরন্তু অনুমোদন যোগ্য এর মানে ভালো বা ওয়াজিব নয়। অনেক বিষয় আছে যেগুলো একই সাথে অনুমোদন যোগ্য এবং মাক্রুহ। এটির বদলে ধামাইদের **সাদাক ই ফিতর** আদায় করা যায়, যদিও এটি মাক্রুহ।**অশেষ রহমত** কিতাবের সাদাকা ই ফিতর অংশুটুকু দেখুন বিস্তারিত জানার জন্য। ধামাই এর অর্থ মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিম।

যাকাত আদায় করা

যাকাত আদায় করা ফরয- এ সম্পর্কিত প্রামাণ্য আয়াত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারার ১০, ৪৩ ও ১০০ তম আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

১২ প্রকারের ব্যক্তি রয়েছে যাদের প্রতি যাকাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়নি; অর্থাৎ যাদের কাছে যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হবেনা। তারা হলেন উন্মাদ; মানসিক বিকারগ্রস্ত, মৃত মুসলিম ব্যক্তির কাফন ব্যয়, কাফির; অমুসলিম, ধনী ব্যক্তি, যাকাতদাতার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ (মা-বাব, দাদা-দাদী, নানা-নানী), জাকাত দাতার মুকাতাবা (চুক্তিবদ্ধ ঐ দাসী যে নির্দিষ্ট মুল্য পরিশোধের মাধ্যমে মুক্তি পাবে) ও যাকাত দাতার মুরাব্বা (চুক্তিবদ্ধ ঐ দাসী মনিবের মৃত্যুর পর মুক্তি পাবে)। কোন মহিলা তার স্বামীকে যাকাত দেয়ার বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও এভাবে আদায় না করা উচিৎ। ধরুন, কোন ব্যক্তি যে আপনার দৃষ্টিতে আপনার আত্নীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু পরে আপনি জানতে পারলেন সে আপনার আত্নীয় কিংবা সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বা সে ব্যক্তি পরে অমুসলিম বা ধর্মান্তরিত হলো কিন্তু আপনি জানেন সে মুসলমান তাহলে এমন ব্যক্তিগণ জাকাতের অধিকারী হবেন না। যদি অজ্ঞাতসারে আপনি এ ধরনের ব্যক্তিদের যাকাত প্রদান করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে পুনরায় পরিশোধ করতে হবে।

আট প্রকারের ব্যক্তিগণ যাকাতের অধিকারীঃ

১। ইসলামের পরিভাষায় যে ব্যক্তি মিসকিন। (ঐ মুসলিম যার একদিনের বেশী চলার মত স্বচ্ছলতা বা ক্ষমতা নেই)।

২। ঐ গরীব মুসলিম ব্যক্তি যার সামর্থ্য বা সম্পদ কোরবানী নিসাবের পরিমানের চেয়েও কম।

৩। ঋণগ্রস্থ মুসলিম।

৪। যাকাত ও ওশর আদায়ের নিয়োজিত ব্যক্তি।

৫। ঐ মুসলিম যে বর্তমানে বা বর্তমান ঠিকানায় খুবই গরীব; কিন্তু তার নিজ স্থায়ী ঠিকানায় পৌছলে সাবলম্বিতা ফিরে আসবে।

৬। ঐ মুসলিম ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ বা হজ্জের পথে অসচ্ছল অবস্থায় পতিত হয়।

৭। ঐ ক্রীতদাস যে তার নিজের মুক্তির জন্য তার মনিবকে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৮। মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা অমুসলিম কোন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করার লক্ষে; (এটি বর্তমানে বিদ্যমান নেই)।

ইসলামের পরিভাষায় যে ব্যক্তির নিকট এমন সম্পদ রয়েছে যা দিয়ে সে একদিনের বেশী চলার সামর্থ্যবান কিন্তু তা নিসাব পরিমান সম্পদ নয় তাহলে সে গরীব হিসেবে সাব্যস্থ হবে। কোন সরকারী কর্মচারী যে তার বেতন দিয়ে পরিবার পরিচালনায় একেবারে অক্ষম; সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে, কোরবানী ও যাকাত তার উপর কর্তব্য নয়। যে মুসলিম ব্যক্তি ইলম তথা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করছে বা ইসলামী জ্ঞান বিতরণ করছে; সে ব্যক্তি চল্লিশ বছর নিজেকে পরিচালনা বা চলার সামর্থ্য তথা সম্পদ বা টাকা থাকলেও যাকাত গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। জাকাতের অর্থে মসজিদ নির্মাণ ও মৃত ব্যক্তির কাফনের কাজে ব্যয় করা যাবে না। তেমনিভাবে ধনী ব্যক্তির শিশু, ভাই-বোন, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, পৈতৃক-মাতৃক চাচা-চাচী ও ফুফা-ফুফু কারো জন্য ব্যয় করা যাবে না। কোন গরীব ব্যক্তিকে এই পরিমান যাকাত দেয়া যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হয়; তবে তার পরিবাবের অন্য সদস্যদের আলাদাভাবে যাকাত দেয়ার ফলে তারা সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক হতে অসুবিধা নেই।এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া উচিৎ নয় যে যাকাত হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অন্যায় ও হারাম কাজে ব্যয় করে।

<u>যাকাত ফরয হওয়ার ছয়টি শর্তঃ</u>

১। মুসলিম হতে হবে।

২। সাবালকত্ব অর্জন করতে হবে।

৩। বিবেচনাবোধ সম্পন্ন বা বুদ্ধিসম্পন্ন বয়সে পোঁছাতে হবে।

৪। স্বাধীন বা মুক্ত হতে হবে।

৫। নিসাব পরিমান হালাল সম্পদের মালিক হতে হবে।

৬। উক্ত সম্পদ অবশ্যই দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ঋণের উর্ধে হওয়া অপরিহার্য।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যার উপর যাকাত ফরয সে তার যাকাত গরীবের নিকট আদায় করবে না ততক্ষণ সে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যয় দান-খয়রাত করলে তা সওয়াবের পরিবর্তে তাকে গুনাহের অংশীদার করবে। অর্থাৎ যাকাত দাতা এবং

ঋণদাতার উপর পূর্বে তাদের যাকাত ও ঋণ আদায় করা ফরয। তেমনিভাবে ''হাদিকা''র ২য় খণ্ডে ৬৩৫ নং পৃষ্ঠায় এবং "বেরীকার" ১৩৬৯ নং পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইহা বৈধ নয় যে কোন ব্যক্তি তার যাকাত বা দান-খয়রাত এমন ব্যক্তিকে আদায় করা যে তা গ্রহণ করার পর হারাম কাজে ব্যয় করবে। কেননা হারাম কাজকে সহায়তা করাও হারাম। এমন কোথাও যাকাত আদায় উচিৎ নয় যেখান থেকে যাকাত দাতা কোনভাবে লাভের অংশীদার হবে।

যদি স্বামী অথবা স্ত্রী তাদের থেকে কেউ কাউকে যাকাত প্রদান করল, সেখান থেকে তাদের বিনিময় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা কখনো হালাল হবে না। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়্যত অবশ্যই করতে হবে। অর্থাৎ যে কোন ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে নিয়্যত করা আবশ্যক। যাকাত হচ্ছে, কোন ব্যক্তির **হাজাতে আসলিয়্যাহ** তথা প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ছাড়া এমন পরিমান সম্পদ এক বছর (**নিসাব পরিমান সম্পদ**) অতিক্রম করলে তার উপর যাকাত প্রদান ওয়াজিব হয়ে থাকে। স্বর্ণের (পরিমান) নিসাব হচ্ছে ২০ মিসকাল, যাহা ৯৬ গ্রাম বা ১৩.৩ পরিমান স্বর্ণের (কয়েন) সমান।রৌপ্যর নিসাব হচ্ছে ২০০ দিরহাম, অর্থাৎ ৬৭২ গ্রাম। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে ফরজ হচ্ছে, যাকাত নিসাব পরিমানপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ঐ হিজরী সালের মধ্যে এক অবস্থায় বিদ্যমান রাখা। অর্থাৎ নিসাবের পরিমানের মধ্যে যাকাত কম আদায় করার লক্ষে কোন প্রকার কম বেশী করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, এরূপ করলে তা আদায় করা মাকরুহ বলে বিবেচিত হবে। ঐ হিজরী সালে যা ফরয তা তাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে মাকরুহ হবে না। যাকাত একবার যার উপর ফরজ হয়েছে তাকে তা নিয়মিত আদায় করতে হবে অন্যথায় সে গুনাহগার হবে। আর সকল প্রকার গুনাহকে পরিত্যাগ করার নাম হচ্ছে আনুগত্য। এখানে ফতওয়া ইমাম মুহাম্মদের উপর। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদের মতটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফতওয়া কি বা কাকে বলে এই সম্পর্কে **বিলিফ এবং ইসলাম, দা সুন্নি পাথ** ও **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ৩৩ ও ১০ তম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

যাকাতের সম্পত্তিঃ যাকাত সম্পত্তি বলতে এমন সব সম্পত্তি যা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যাকাত প্রদান করা হয় এমন সম্পত্তি চার ধরণের হয়ে থাকে।

<u>প্রথম-</u> চতুষ্পদ প্রাণী যা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কম পক্ষে বছরের অর্ধেক সময়

খোলা আকাশের নিচে মাঠের মধ্যে ঘাস খেয়ে থাকে। প্রাণী স্ত্রী লিঙ্গের ক্ষেত্রেও একি হুকুম প্রযোজ্য হবে। যাকে **সায়মা** বলা হয়।

দ্বিতীয়ত- এমন সব সম্পত্তি যা ব্যবসা করার উদ্দেশে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

তৃতীয়ত- স্বর্ণ ও রৌপ্যর ক্ষেত্রে যাকাত প্রদান করতে হয়।

সর্বশেষ- এমন সব খাদ্য যা মাটি থেকে উৎপাদিত হয়ে থাকে। স্বাধীন থাকা অবস্থায় পুরুষ প্রাণী, গাধা ও খচ্চর গবাদী এই জাতীয় জন্তুদের যাকাত আদায় করতে হয় না। অর্থাৎ তাদের উপর যাকাত ফরয নয়। অল্প বয়স্ক প্রাণী যেমন উট, গরু ও ভেড়া বয়স্ক প্রানীদের সাথে অবস্থান করে তখন তাদেরকেও যাকাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সম্পত্তির বিনিময়ে যাকাত, উশর, কাফফারা, সাদকা ফিতির প্রদান করা যায়। এই সম্পর্কে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ৬ষ্ট অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। তবে তার মান অনুযায়ী সমতুল্য পরিশোধ করা যাবে। ইমাম শাফীর মতে এরূপ করা বৈধ নয়। যাকাত ফরয হওয়ার পর যদি কারো সম্পত্তির কোন ক্ষতি বা নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতি হওয়া সম্পত্তির যাকাত প্রদান করতে হবে কেননা সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার পূর্বেই যাকাত ফরয হয়ে ছিল।

একজন বিবেকবান ও বালেগ মুসলমানের হালালপন্থায় অর্জিত সম্পদ নিসাব পরিমান হওয়ার পর তার উপর যাকাত প্রদান করা ফরয বলে বিবেচিত হবে। আর এটা প্রদান করতে হবে কুরআনে উল্লেখিত আট ব্যক্তির যে কাউকে প্রদান করা যাবে। এই আবশ্যিক প্রদান করাকে শরীয়তের ভাষায় যাকাত বলে। আর যাকে যাকাত প্রদান করা হবে তাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। একজনের সকল সম্পত্তি অন্যজনে ব্যবহার করা সম্ভব ও অনুমোদন যোগ্য।যখন কোন সম্পত্তি তুমি অর্জন করবে বা আয় করবে তখন তা তোমার সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না তুমি তা বিতরণ বা অর্পণ না করবে। পরে এটা ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। আর যে সকল সম্পত্তি চাঁদাবাজি, নির্যাতন, শক্তি প্রয়োগ, চুরি, ডাকাতি, সুদ, জুয়া, ঘুষ, বাদ্যযন্ত্র, গান পরিবেশনসহ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত করা হয় তাদেরকে **খাবিস সম্পত্তি** বলে। আর এ সকল সম্পত্তি দিয়ে যাকাত আদায় করা বৈধ হবে না। আর ঐ সকল সম্পত্তি তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি নয় বা তুমি এর মালিক নও। এটি অবশ্যই তার সঠিক মালিকের কাছে ফিরিয়ে

দিতে হবে। বা এ সকল সম্পত্তির মুল মালিক হচ্ছে মৃত্য ব্যক্তি অথবা তার কোন মালিক নেই অথবা তার মালিক হচ্ছে গরীব মুসলমান যাদেরকে যাকাত প্রদান করা হবে। হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ যদি অন্য কোন হারাম সম্পদের সাথে মিশ্রিত হয় অথবা হালাল পন্থায় অর্জিত সম্পদের সাথে মিশ্রিত হয় তাহলে তুমি এর প্রকৃত মালিক হবে। এই অবস্থায় একে **মূলক খাবিস** তথা খাবিস সম্পত্তি বলা হবে। আর এ সকল সম্পত্তি কাউকে দান করা, কোন কাজে ব্যয় করা কিংবা যাকাত প্রদান করা কোনভাবে বৈধ হবে না। সম্পত্তির পুরো মালিকানা না থাকলে তা দিয়ে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কিন্তু তোমার যদি কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় এবং হালাল সম্পত্তি না থাকে তাহলে খাবিস সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করতে পারবে ও নিসাবের মধ্যে ঐ সকল সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। যদিও খাবিস সম্পদ ব্যবহার করা বা কাউকে প্রদান করা হারাম বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি খাবিস বা হারাম সম্পত্তি উপহার হিসেবে গ্রহণ করেছে তাহলে ইচ্ছা করলে সে তা ব্যবহার কিংবা বিক্রয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা নেই। যদি সম্পদের মালিক কিংবা সম্পদের উত্তরাধিকারী জানে না যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ খাবিস কিংবা হারাম পন্থায় উপার্জিত হয়েছে এবং তা হালাল সম্পদের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে এমতাবস্থায় তাদের জন্য উক্ত সম্পদ ব্যবহার করা জায়েজ হবে না বরং তা গরীব মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে।

যদি কোন গরীব কিংবা ফকীর মুসলমান কোন প্রকার সম্পদ বা যাকাত হাদিয়া নিয়ে বা পেয়ে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে চায় তাহলে প্রদানকারী ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারবে এতে কোন প্রকার সমস্যা নেই।

স্বর্ণ ও রূপ্যের ক্ষেত্রে এগুলোর বিশুদ্ধতা অবশ্যই যাচাই বাচাই করতে হবে। আর যদি তাদের বিশুদ্ধতা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি এগুলোর বাজারে তেমন কোন চাহিদা বা দাম না থেকে তাহলে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথমটি হল সর্বোচ্চ খাটি বা বিশুদ্ধতা যার নাম **জিয়্যিদ** আর সর্বনিম্ন রেট বা অবস্থার নাম হল জুযুফ। যদি তাদের বিশুদ্ধতার পরিমান পঞ্চাশ ভাগের নিচে হয় ও ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে নিসাবের আলোকে তাদের অবশ্যই যাকাত প্রদান করেত হবে।

বৃষ্টির পানি কিংবা জল প্রবাহের মাধ্যমে জমি থেকে উৎপাদিত সবজি, ফল কিংবা ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (উশর) যাকাত প্রদান করতে হবে। আর একে উশর বলা হয়ে থাকে। সরকারীভাবে যদি উশর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাহলে তার তা বিক্রি করার মাধ্যমে অর্জিত টাকা সরকারের **বায়তুল মাল** বিভাগে প্রদান করতে হবে। আর এই সম্পর্কে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের প্রথম ও উনিশতম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ফসল বা ফল কাটা কিংবা সংগ্রহ করার সময় উশর (যাকাত) প্রদান করার বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক ধরণের হিকমত রয়েছে। পশু, পাইপ কিংবা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে পানি সরবরাহ করলে সে ক্ষেত্রে ঐ ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। ফসল কাটার সময় তা পরিশোধ করতে হবে কোন দেরী করা যাবে না। সরকারের পক্ষে কোন প্রকার জায়েজ হবে না প্রদান যোগ্য ওশর ক্ষমা করে দেয়া কিংবা ওশর প্রদানকারীকে তাহা দিয়া হিসেবে দেয়া। পাহাড় কিংবা বন থেকে সংগৃহীত মধুর ক্ষেত্রেও ওশর প্রদান করতে হবে।

জিম্মীকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাদেরকে শুধু মাত্র সাদাকাতুল ফিতর, মানত করা কোন বস্তু কিংবা ভিক্ষা প্রদান করা যাবে। (জিম্মী হল ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম ব্যক্তি)। জিম্মী নয় কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাস করলে তার জন্য যাকাত, ফিতরা কিংবা অন্য কোন বস্তু ফরজ, ওয়াজিব বা নফল হিসেবে প্রদান করতে হবে না। হারবির ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম আবর্তিত হবে। হারবি হল অমুসলিম দেশে বসবাসকৃত মুসলিম ব্যক্তি। **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ছয় চল্লিশ তম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

যদি কোন গরীব মুসলমানের করজ না থাকে তা হলে তাকে নিসাবের অতিরিক্ত যাকাত দেয়া বৈধ হবে না। মাকরুহ হবে। আর যদি ঐ ব্যক্তির পরিবার অনেক বড় হয় সে ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিসাব থেকে অতিরিক্ত সম্পদ প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা হবে না।

বাজারের দর অনুযায়ী সম্পদ বিক্রয় করে ফুলুস সংগ্রহ করা অনুমোদনযোগ্য। অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে ফুলুস বা টাকা রাখা যাবে। ফুলুস হচ্ছে ধাতু বিশিষ্ট এক ধরনের মুদ্রা। অথবা নোট বা পত্র মুদ্রা। কারণ এটি রীতিমত পণ্যের মুল্য

হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটাকে তাইয়্যান (প্রদর্শন) করার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ধাতু বিশিষ্ট মুদ্রা দেখানোরও কোন দরকার নেই। আর যদি তা কাসিদ হয় ও বাজারে তার কোন চাহিদা না থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে এ ধরণের বিক্রয় বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে না। বাজারের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী সমতুল্য দর প্রদান করতে হবে। আর যদি ফুলুস কাসিদ (কাসিদ বলতে যার বর্তমান বাজারে কোন চাহিদা বা মুল্য নেই) হয় ইমাম আবু হানিফার মতে কোন ব্যক্তির করজ থাকলে সে ক্ষেত্রে ফুলুস দিয়ে তা পরিশোধ করতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে কাসিদের মুল্য যদি করজের পরিমান সমান হয় তাহলে তা দিয়ে পরিশোধ করতে পারবে। চাহিদা নেই এমন ফুলুস ক্রয় বিক্রয় করার মাধ্যমে তাইয়্যান ফুলুসের চাহিদা পূরণ করা যাবে। যে সম্পদকে তাইয়্যান করা হয়েছে তাকে তাইয়্যুন বলা হয়ে থকে। এ যাবতীয় পরিভাষা সম্পর্কে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ঊনত্রিশতম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল নির্দিষ্ট সম্পত্তি তাইয়্যন বা প্রদর্শিত হতে হবে যাতে করে লেনদেন করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা না হয়। এটাকে উপমা বা সাদৃশ্য হিসেবে প্রদান করা যাবে না। ধরুন কোন ব্যক্তি রূপার বিনিময়ে টাকা দিল যার ওজন এক দিরহাম। পরে ঐ ব্যক্তি তার থেকে ফুলুস ও অর্ধেক দিরহাম অতিরিক্ত চাইল তাহলে এ ধরণের ক্রয় বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কারণ অতিরিক্ত অর্ধেক মুদ্রা ফায়েজ বা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। যদি সে বলে আমাকে এটার বিনিময়ে তার ওজনের মুল্য অনুযায়ী অর্ধেক ফুলুস দাও ও তোমার কাছে এটি অবশিষ্ট থাকার কারণ অর্ধেক মুর্দা দাও তাহলে এ ধরণের ফুলুস বা ক্রয় বিক্রয় হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে।আবার সে যদি বলে আমাকে এর বিনিময়ে অর্ধেক ফুলুস দাও ও রুপা ফিরিয়ে নেওয়ার সময় অর্ধেক দিরহাম প্রদান করবে। উভয় ক্ষেত্রে যদি রূপার ওজন অনুযায়ী দাম এক দিরহাম হয়ে থাকে তাহ লে ফুলুস ও ক্রয় বিক্রয় উভয়ই বৈধ হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রদানকৃত রূপা ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সমতল ওজন ও অনুরূপ রূপা হতে হবে। অর্ধেক ফুলুসের গ্রহণের ক্ষেত্রেও সমান মুল্যের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কোন প্রকার কমবেশী করা যাবে না।

আর যদি ফুলুস ও রূপা ফিরিয়ে নেওয়ার সময় ওজনে কম বেশী হয় তাহলে

তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে অন্য কোন বস্তু দিয়ে তা সমাধান করে নিতে পারবে। তবে কোন প্রকার কম বেশী বা ঠকবাজি করা যাবে না।

বদিউস সানায়ে ফী তারতীবুস শারীয়াহ নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সম্পদের যাকাত প্রদান করা হবে তা অবশ্যই সমজাতীয় হতে হবে অর্থাৎ যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে সে সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে। তবে যদি ভিন্ন সম্পদ ও হয় তবে সমপরিমান ও সমতুল্য হারে যাকাত প্রদান করা হবে। এটা কখনো বৈধ হবে না যে, সাধারণ মাপের কোন কাপড়, পোশাক ও নকল স্বর্ণ ইত্যাদি দিয়ে যাকাত দেয়া। এক্ষেত্রে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত প্রদান করা হয় এমন সম্পত্তিআ ইন অথবা দায়িন হবে। উপযুক্ত এমন যাকাত যা আইন তথা পরিমেয় বা নির্দিষ্ট পরিমান হতে হবে। আর এমন সব সম্পদ আছে যাকে ওজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমান করে নিতে হয়। এটা হতে পারে সায়মা প্রাণীকুল অথবা উরুজ যাহা ব্যবসায়ী কাজে ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়ে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ঊনত্রিশতম অধ্যায়ের সতেরতম অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আর যদি সায়মা প্রাণী হয় সেক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে নির্ধারিত পরিমানে যাকাত প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রানীদের থেকে মাঝারি ধরণের যে কোন একটিকে প্রদান করতে হবে। যদি দুর্বল প্রাণীকে যাকাত হিসেবে দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্বর্ণ কিংবা রূপা অথবা তার সমপরিমান কোন সম্পদ প্রদান করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, মাঝারি টাইপের প্রানীর জন্য সমপরিমান মুল্য ও দুর্বল প্রানীর জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্বর্ণ কিংবা রূপা বা তার সমানমুল্য প্রদান করতে হবে। দুর্বল দুইটি মেষের পরিবর্ত মোটা একটি মেষ যাকাত হিসেবে দেয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে মুল্যের সমপরিমাণের দিকে নজর রাখতে হবে।এই সমস্ত বস্তু বিনিময় কালে সুদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নস অনুযায়ী ব্যবসায়ী কাজে ব্যবহৃত সম্পদের ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য সকল সম্পদের যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সমজাতীয় বস্তুর যাকাত দিতে হবে। তাতে যদি সমজাতীয় সম্পদ বাদ দিয়ে নিন্মমানের কিংবা অন্য কোন বস্তুর মাধ্যমে যাকাত প্রদান করা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণসহ আদায় করতে হবে। উরুজ বলা এমন সকল সম্পদকে যাকে ওজন কিংবা পরিমাপ করা যায় না। উরুজ করার সময় পরিমানের ভিন্নতা হলে তাতে সুদের কোন আশঙ্কা থাকে না। নিন্ম মানের

দুইকে তা কাপড় ভাল মানের এক কেতা কাপড়ের বিনিময়ে যাকাত হিসেবে দেয়া যাবে। যদি কেউ যাকাত প্রদান করা হয় এমন সম্পদের বাহিরে অন্য কোন সম্পদের মাধ্যমে যাকাত দিতে চায় তাহলে তাকে পরিমান ও মুল্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফে র মতে, কেউ সমজাতীয় সম্পদ দিয়ে যাকাত না দিয়ে তার সমপরিমাণ মুল্য দিলে আদায় হবে না। কেননা তখন ঐ সম্পদের মুল্য পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন বলা যেতে পারে, ভাল মানের দুইশ কিলগ্রাম গমের মুল্য রূপার দুইশ্ত দিরহাম। এক্ষেত্রে সাধারণ মানের পাঁচ কিলগ্রাম গম যাকাত দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে ভাল মানের পাঁচ দিরহাম জেয়্যিদ রূপা দুইশ দিরহাম জেয়্যিদ রূপার সমান যাকাত প্রদান করা যাবে। সাধারণ মানের পাঁচ দিরহাম রুপা ও প্রদান করা যাবে। আর এই নিয়মটি নজর সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নজর বিষয়ে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবে পঞ্চমতম দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণ ও রূপা হল নিশ্চিত **ছামান** (যার মুল্য রয়েছে)। তাদেরকে মূল্যবান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তা শুধুমাত্র মানুষকে সন্তুষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ মানুষ তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার জন্য ক্রয় করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, তাদেরকে ছামান ও মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এখানে আমরা **বেদায়ই** থেকে আমাদের অনুবাদ শেষ করছি।

একটা বিষয় হচ্ছে মানুষ সুন্দর ও আরামদায়কভাবে দুনিয়াতে বসবাস করতে চায় যাকে ইসলামের পরিভাষায় **ভাইটাল নীদস** (বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু)। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে। এই বিষয়ে ইথিক্স অফ ইসলাম নামক কিতাবের দশম তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ যেখানে বাস করে ভাইটাল নীদস পরিস্থিতির, প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বি ক অবস্থার আলোকে পরিবর্তন হতে পারে। ভাইটা ল নীদসের বাহিরে অতিরিক্ত কোন বস্তু আরাম দায়ক ভাবে বসবাস করার জন্য প্রয়োজন হয় না । যেমন কোন বিষয় অতিরিক্ত আনন্দ করা, কারো প্রশংসা শুনার জন্য নিজেকে অলঙ্কৃত করা। এসকল বিষয়কে জিনাত বলা হয়। এ সকল কাজ ভাই টালনী দ সের কাতারে শামিল না। তবে স্বর্ণ ও রুপা ভাই টালনী দসের অন্তর্ভুক্ত না। সেগুলো হচ্ছে একজাতীয় অলঙ্কার।

আর এগুলো পুরুষরা বাড়ির ভিতর ও বাহিরে উভয়ই অবস্থায় ও মহিলারা শুধু মাত্র বাড়ির ভিতরে থাকা অবস্থায় ব্যবহার করতে পারবে।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, ফুলুস হল ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত সম সাময়িক সম্পদ, যখন তার মুল্য বাজারের স্বর্ণ ও রূপার বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী নিসাব পরিমান পোঁছবে তখন সেগুলোর জন্য যাকাত প্রদান করা ফরজ হবে। ইমামাই নের (ইমাম আবু ইউসুফ ওইমাম মুহাম্মাদ) মতে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত সম্পদের নিসাব হিসাব করার ক্ষেত্রে বাজারের বর্তমান স্বর্ণ ও রূপার লেনদেনের দিকে তাকিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। আর যে সকল সম্পদের জাকাত সম্পদের পরিবর্তে টাকার মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রোপ্যের মুল্য অনুযায়ী করতে হবে। অন্য থায় হিসাব করে ঐ সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। অসহায় ব্যক্তি এটিকে তার ভাই টালনী দস হিসেবে ব্যবহার করে। ফুলুস স্বর্ণ ও রোপ্যের বাহিরে নগদ অর্থ বাটা কাকে বুঝানো হচ্ছে। যাহা ধাতু থেকে তৈরি কৃত কয়েন কিংবা কাগজের মুদ্রা হিসেবে ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এ হিসেবে ঐ কাগজের মুদ্রা কিংবা ধাতুর কয়েন কে আমরা ফুলুস বলতে পারি। আর এগুলোর জন্য অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে। যদিও তাদের মুল্য স্বর্ণ কিংবা রোপ্যের মুল্যের মত হবে না। অর্থাৎ **সঠিক মুল্য** হবে না কিন্তু **নমিনাল মুল্য** (নাম মাত্র মুল্য) হিসেবে গণ্য হবে। আর এ মুল্য সরকার নির্ধারণ করে দিবে। আর যখন ফুলুসের নমিনাল মুল্য নাথাকে তাহলে তার কোন **ছামান** বা মুল্য অবশিষ্ট থাকল না। তাহলে সে সম্পদের যোগ্য তা হারিয়ে ফেলার কারনে সে সম্পদের উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইবনে আবেদীন বলেন, ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত সম্পদের মুল্য স্বর্ণ ও রোপ্যের মুল্যের আলোকে হিসাব করতে হবে এবং তার মনিটরিং করার জন্য একদল কমিটি নিয়মিত কাজ করবে। ধরেন, নিশ্চিত সম্পদের মুল্য দুইশ ত চল্লিশ দিরহাম রোপ্যের সমান হবে যখন এটি কে রোপ্যের সাথে হিসাব করা হবে ও বিশ মিস কাল স্বর্ণের সাথে সমান হবে যখন তার সাথে পরিমাপ করা হবে। উভয় অবস্থায় তার নিসাব পরিমানের মুল্য নির্ধারিত থাকবে। যাই হোক, এ ধরনের সম্পদ রোপ্যের উপর ভিত্তি করে মুল্য নির্ধারণ করতে হবে। সম্পদের মালিককে রোপ্যের ছয় দির হাম ও স্বর্ণের অর্ধেক মিস কাল যাকাত প্রদান করতে হবে। যা রোপ্যের ছয় দির হাম মুল্যের সম পরিমান মুল্য হবে। যা অসহায় মানুষদের জন্য

অনেক বেশী উপকৃত হবে বলে আশা করা যায় । যদি তাদের কে এ সকল সম্পদে র যাকাত সম্পদের বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। একটি স্বর্ণের মুদ্রার ওজন যদি এক মিসকা ল হয় তাকে **দিনার** বলে। সকল প্রকার টার্কিশ মুর্দার ওজন দেড় মিসকাল যা সাত দশমিক দুই গ্রাম হয়ে থাকে। নগদ মুর্দার বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব যাকে ফুলুস বলে। তবে তা নিসাব পরিমান পোঁছাতে হবে । যার অর্থ হচ্ছে , ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা নগদ অর্থ বা সম্পদের নিসাব পরিপূর্ণ হওয়ার পর স্বর্ণের সর্বনিম্ন রেট অনুযায়ী যাকাত প্রদানের জন্য সম্পদ নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে রোপ্যের তেমন ব্যবহার না থাকার কারনে তার বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদান করতে হবে। তবে স্বর্ণ যেহেতু ব্যবহার করা হয় তাই নিসাব পরিমান হলে তাকে যাকাত হিসেবে দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে তাদের চল্লিশ ভাগের একভাগের সম পরিমান অর্থ প্রদান করা বৈধ হবে না। স্বর্ণের যাকাত প্রদানের সময় স্বর্ণ না দিয়ে অন্য কোন বস্তুদ্বারা যাকাত দেয়া যাবে। তবে স্বর্ণ দেয়াই ভাল। কারণ স্বর্ণ সর্বত্র পাওয়া যায় ও কম বেশী সবাই ব্যবহার করে। ধরেন, কোন মুসলিম বক্তি এমন এক স্থানে বাস করে যেখানে স্বর্ণ পাওয়া যায় না তাহলে সেটা কা পাঠিয়ে তার বন্দু কিংবা অন্য কারো মাধ্যমে স্বর্ণ ক্রয় করিয়ে তার বিনিময়ে তার পক্ষ থেকে নিসাব অনুযায়ী যাকাত আদায় করে দিতে পার বে। অথবা পরে সে নগদ অর্থ প্রেরণ করে ফরয আদায় করে নিতে পারবে। এই সঙ্গে যাকাত পরিশোধ শক্যতা শুঘম নগদ অর্থ এটি অন্য কিছুর স্বর্ণ দিতে সমর্থনীয় নয় বরং যা ফরয হিসেবে নেওয়া হয়েছে তার হুবুহু বস্তুতি দিয়ে পরিশোধ করা উত্তম। নামে মাত্র নয়। যাকে এ ফরথি ওরী বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী ফিক হের পরিভাষায় যা যে ভাবে আছে তা সে ভাবে পালন করার চেষ্টা করা। ইসলামী ফিকহ পরিভাষা সম্পর্কে **ইন্দলেসব্লিস** নামক কিতাবের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোক পাত করা হয়েছে। মানুষের মধ্য থেকে যারা ফিকহ কিতাবে লিখিত ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজেদের কে জীবন পরিচালনা করতে অনিচ্ছুক বা যারা কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের কে পরিচালনা করেতে দের কে **লামাঝহাবি** বা **ধর্ম দ্রোহিতা** বলা হয়। ঐ সমস্ত লোক যারা মাঝহাব অনুসরণ করেনা। এদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হল, আমি আমার যাবতীয় ইবাদত আল কুরআন ও আল হাদীস থেকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে পালন করতে ছি না কিন্তু চার মাঝহাবের কুরআন ও হাদীস থেকে গভেষনা ও বুঝার মাধ্যমে, বর্ণনা কৃত

ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে ছি। যা **ফিকহ কিতাব সমুহে** বিন্যাস করা হয়েছে। **"কিতাবুল ফিকহ আলাল- মাঝহি বুল আরবা আ"** নামক কিতাব টি প্রফেসর আব্দুর রহমান জাহেরীর পৃষ্ঠ পোষক তায় **আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের** কয়েকজন শিক্ষক কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। যেখানে ফিকহ শাস্ত্রের সকল বিষয় সম্পর্কে চার মাঝহাবে র প্রদান কৃত ফতোয়া কিংবা দৃষ্টি ভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। বই টিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যা ১৯৭২ সালে মিশরের কায়রো তে ছাপানো হয়ে ছিল। সেখানে একটি পরিচ্ছেদ আওরাকে মালিয়্যাহ তথা ব্যংক নোটের যাকাত প্রদান প্রসঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আওরাকে মালিয়্যার জন্য অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে। কারণ এ ধরণের ব্যংক নোট বা নগদ অর্থ স্বর্ণ কিংবা রোপ্যের বিনিময়ে ব্যবসার কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো সবসময় একে অন্যের মধ্যে সহজেই বিনিময় বা রূপান্তরিত করা যায়। যেমন কোন ব্যক্তির কাছে প্রচুর পরিমান নগদ অর্থ রয়েছে তাহলে সে তার সম্পদকে স্বর্ণ ও রোপ্যের পরিমান মুল্য নির্ধারণ করে নিসাব অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু সে যদি যাকাত প্রদান না করে তাহলে তার এই নগদ অর্থ দ্বারা মানব জাতির কোন উপকারে আসল নাও অনুরূপ ভাবে সে গুনাহ গার হবে। আর এই কার নেতিন মাঝহাবের সম্মতি ক্রমে নগদ অর্থের জন্য যাকাত অবশ্যই প্রদান করতে হবে। শুধুমাত্র হান বলী মাঝহাবের মতে এর জন্য যাকাত না দিলে কোন সমস্যা নেই। হানাফী মাঝহাবের মতে নগদ অর্থ হল **দেইনে কায়ি**, যা তাৎক্ষনিক ভাবে ও খুব সহজে স্বর্ণ ও রোপ্যের সাথে বিনিময় কিংবা রুপান্তর করা যায়। দেই নে কায়ি সম্পর্কে **ইন্দলে সল্লিস** নামক কিতাবের পঞ্চম তম অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে । তাই তাদের মতে কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতীত এগুলোর জন্য যাকাত আদায় করতে হবে। যদি স্বর্ণ বা রোপ্য লোণ হিসেবে তোমার অধিকারে থাকে তা হলে সেগুলোর আসলে যাকাত প্রদান করেত হবে। যদি ও না যাকাত ফরজ হওয়ার পর তা ব্যক্তির অধিকারে আসে। এটা যাকাত পরিশোধের জন্য ফরজ করা হয় নাই। আর এই অবস্থায় দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমত, তুমি সে সকল সম্পদ তোমার অধীনে আসার জন্য অপেক্ষা করবে ও নিসাব হিসাব করে পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করবে। অথবা তোমার অধীনে থাকা সম্পদে র স্বর্ণ ও রোপ্যের হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের যাকাত দিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে নগদ টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ বা রোপ্য যাকাত হিসেবে দিতে পারবে নাও স্বর্ণ বা রোপ্যের বিনিময়ে টাকা দিতে পারবে না। কারণ যে

ভাবে অঙ্গী কার নামা লিখা হয়েছে ঠিক সে ভাবে প্রদান করতে হবে। অনুরূপ ভাবে লোণ নেয়া সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের একভাগ আলাদা করে গরীব মানুষের মাঝে তা বিতরণ করতে হবে। অন্য দিকে লোণ নেয়া নগদ অর্থ দিয়ে যাকাত দেয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগের টাকা দিয়ে সম পরিমান হারে বাজারে সর্বনিন্ম রেটের স্বর্ণ কিংবা রোপ্য ক্রয় করে তা দিয়ে অসহায় দের কে যাকরে বিতরন করতে হবে। এটা কখনো বৈধ হবে না যে, যার ফরজ দেওয়া হয়েছে তাকে যাকাত দেয়ার মাধ্যমে তার ফরয পরিশোধ করে দেয়া। এখানে যাকাত ও ফরয সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় । যাকরতে হবে তাহল, তোমার উপর ফরয হওয়া যাকাত তাকে প্রদান করবে সে তোমার থেকে নেয়া করজ চাইলে যাকাত দেয়া অর্থ থেকে তোমাকে পরিশোধ করবে। এটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর শীল। এ সম্পর্কি ত**ফাত ওয়ায়ে হিন দিয়াতে** এভাবে উল্লেখ আছে যে, কোন ধনী ব্যক্তি অসহায় একজন কে কিছু সম্পদ ধার দিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তির পক্ষে তা পরিশোধ করা অসম্ভব। তাই সে বলল তুমি আমার সহকারী হয়ে কাজ করলে আমি তোমাকে এর বিনিময়ে প্রতিদান প্রদান করব। তখন গরীব ঐ ব্যক্তি তার অধীনে কাজ করল যার বিনিময়ে সে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তার ধার নেয়া অর্থ পরিশোধ করল। অন্যদিকে সে তার শ্রম দিবে। ধনী ব্যক্তি যে টাকা তাকে যাকাত হিসেবে প্রদান করত তা তার সমান হয়ে যাবে। ধরেন কোন অসহায় ব্যক্তি বিত্ত বান দুই জন থেকে কোন কিছু ধার নিয়েছে। তার পক্ষে ঐ সকল সম্পদ প্রিশধ করা আদ ও সম্ভব নয় তাই তাদের মধ্য থেকে একজন সে তার যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তার থেকে নেওয়া ফরজ ক্ষমা করে দিয়েছে। অন্য জন তাকে তার সম্পত্তি থেকে কোন কিছু দানের মাধ্যমে তার থেকে নেয়া ধার ক্ষমা করে দিয়েছে। আর এভাবে হালাল পদ্বতিতে অসহায় ব্যক্তির সকল ফরয বাধার ক্ষমা করে দেয়া সহজ তম মাধ্যম। অন্যদিকে অসহায় ব্যক্তি সে সহ কারী কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে আয় অরা অর্থ বিত্ত শালী ব্যক্তিকে উপহার হিসেবে প্রদান করবে। অথবা ধনী ব্যক্তি থেকে ধার নেয়া স্বর্ণ বা রোপ্য পুনরায় তাকে প্রদান করবে তার কর জ হিসেবে যা সে ধনী ব্যক্তি থেকে যাকাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এভাবে ধনী ব্যক্তি তার থেকে নেয়া ফরজ তাকে ক্ষমা করে দিবে। সম্পদের যাকাত প্রদান না করে ঐ সম্পদ দিয়ে ধর্মীয় কিংবা কোন ভাল কাজে তা ব্যয় করা উচিৎ হবে না। উপরের আলোচনা থেকে উদাহারন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তুমি তোমা র স্ত্রীর কিংবা পরিচিত লোক দের নগদ অর্থের যাকাতের টাকা দিয়ে সম পরিমানের স্বর্ণ ক্রয়

কর বে। এবং সে স্বর্ণ দিয়ে গরীব, অসহায় বা নিকট আত্নীয় দের মাঝে যাকাত হিসেবে প্রদা ন করবে। আর এভাবে তুমি তোমার নগদ অর্থের যাকাত হিসেবে স্বর্ণা লঙ্কার প্রদানের মাধ্যমে আদায় করে দিতে পারবে।তবে সে ক্ষেত্রে ওজনও সম পরিমান মুল্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ধরেন কোন অসহায় ব্যক্তি কে আপনি কিছু স্বর্ণ ধার দিলেন সে তা আপনাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে বিলম্ব করায় আপনি তাকে অন্য এক ব্যক্তির অধীনে কাজ করার আমন্ত্রণ করলেন। অতঃপর সে সেখানে কাজ করে উপার্জিত পারি শ্রমিক দিয়ে আপনার ধারকৃত স্বর্ণ ফিরিয়ে দিল। এর মধ্যে আপনার উপর যাকাত ফরয হওয়ায় আপনি তাকে যাকাত প্রদান করলেন। আর ঐ জাকাতের সম্পত্তি দিয়ে আপনার সাথে ভিবিন্ন কাজে দান বীয় কাজে নিজেকে অংশীদার করতে পারবে তাতে কোন সমস্যা হবে না। যাকাত প্রদানের আপনার নিজের অধীনে থাকা সম্পত্তি দিয়ে যে কোন ভাল কাজ করতে পারবেন। গরীব ব্যক্তি চাইলে আপনার কাছ থেকে নেয়া স্বর্ণ আপনার নিকট বিক্রয় করতে পারবে অনুরূপ ভাবে আপনার থেকে নেয়া ধার কিংবা কর্য যে কোন কিছুর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

সাইয়্যেদ আবদুল হাকিম আর ওয়াসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (জন্মঃ ১৮৬৫, বাস্কালী, ভান, তুরস্ক ও মৃত্যুঃ ১৯৪৩, আনকারা) চারটি মাঝহাবের উপর বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি বলেন যে, কাগজের মুদ্রা হল এমন এক মুদ্রা যার মুল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আর যখন বাজারে তার কোন নির্ধারি তা কোন মুল্য অবশিষ্ট থাকেনা তখন তা দিয়ে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে না। আর যদি অতীতে কাগজের মুদ্রা দিয়ে যাকাত দেয়া হয়ে থাকে তা হলে তার জন্য স্বর্ণ দিয়ে ক্বাযা আদায় করতে হবে। এমনকি ঐ টাকা দিয়ে যে কাজ করা হয়েছে সব গুলো পুনরায় আবার ক্বাযা আদায় করতে হবে শুধু মাত্র হজ্জ ক্বাযা করতে হবে না। আরও বিস্তারিত জানতে **ইন্দলেসব্লিস** নামক কিতাবের একুশ তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুররুল মুখতার কিতাবে বলা হয়েছে যে, কোন মুসলমান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা থেকে সরকারকে উৎখাত করতে না পারায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এমতা বস্তায় ঐ দেশের মুসলিম জালিম শাসক শস্য ফসলাদিও প্রানী কূল থেকে যাকাত সংগ্রহ করে আ ল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী পরিচালিত দেশ বা স্থানে তা গরীব কিংবা অসহায় মানুষদের মাঝে বণ্টন করে তাহলে তা যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি অন্য স্থানে বণ্টন করা হয় তাহলে তা যাকাত

হিসেবে গণ্য হবে না। সম্পদের মালিক নিজেই নিজের সম্পদ বণ্টণ করবে।অধিকাংশ ফিকহ বিদদের মতে যদি জালিম সরকার জাকাতের সম্পদ সংগ্রহ করে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে তাহলে তাও যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। অন্যান্য ফকীহ দের মতে, যদি তারা সঠিক পদ্বতিতে যাকাত সংগ্রহ করে ও গরীব দের মাঝে বণ্টণ করে তাহলে তা যাকাত হিসেবে আদায় হয়ে যাবে। তবে তা সম্পূর্ণ নিয়্যতের উপর নির্ভর শীল। **ইবনে আবেদীনের** মতে, এই নিয়ম টি সম্পদ, নগদ অর্থের কর অথবা অন্য যে কোন পরিভাষায় প্রয়োগ করা যাবে। স্কলারী নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ ত উল্লেখিত পদ্বতিতে সম্পদ সংগ্রহ করে তা বণ্টণ করলে যাকাত আদায় হবে না। যদি ও সেখানে নিয়্যতের কোন সমস্যা না থাকে। অন্য ভাবে বলা যেতে পারে যে, অত্যাচারী মুসলিম শাসকের কোন অধিকার নেয় যাকাত সংগ্রহ করে মানুষের মাঝে তা বণ্টন করার। আ র এই ফতোয়া কে উল্লেখিত কিতাবের **তাহতা ওয়ী** নামক টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।যেখানে উক্ত ফতোয়াকে সঠিক বলা হয়েছে। যাই জতে হাদের মাধ্যমে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, যাকাত দেয়া হয় প্রানী ও উশরের জন্য আর তখনই তাসহীহ বলে গণ্য হবে যখন মুসলিম সরকার সংগ্রহ করে ও **বায়তুল মাল** কিংবা রাষ্ট্রীয় কোষা ঘরে জমা দিয়ে সেখান থেকে গরীব বা অসহায় মুসলমানের মাঝে বণ্টন করে। অধিকাংশ আলেমের মতে যাকাত প্রদান করা হয় এমন সম্পদে সরকার কে কোন প্রকার কার প্রদান করা যাবে না। এখানে আরেকটি মত পাওয়া যায় যে যেকোন অমুসলিম সরকার ইসলামী সরকারের আদলে সম্পদ কিংবা নগদ অর্থ সংগ্রহ করে যাকাত হিসেবে প্রদান করতে পারবে, তবে এই মতটি অনেক দুর্বল যার কোন ভিত্তি নেই। দুর্বল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য

ইন্দলেস ব্লিস নামক কিতাবের ষঠতম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে,

হে আমার ভাই, সৎপথে আসও একগুমেয়িতা পরিহার কর| তোমার এই জীবন অনেক মূল্যবান, এটাকে হেলায় খেলায় নষ্ট করে দিও না! তোমার নফসকে যাবতীয় খারাফ কাজ থেকে রক্ষা কর| বাহিরেও ভিতরে সর্বাবস্তায় সচেতনতা অবলম্বন কর! যখন স্বর্ণকে তামার সাথে মিশ্রিত করা হয়| পোদ্দার কি এটাকে আমোদ প্রমোদ হিসেবে গ্রহণ করে? উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নেয়া সার্টিফিকেট দিয়ে অযথা গর্ভ কর না| চিন্তাভাবনা করে কথা বল, অন্যথায় আহমাকদের মধ্যে শামিল হবে! একজন ভাল লো কের খোঁজ করও তার যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ কর| তাহলে তুমি হকের পথে থাকতে পারবে! হাকীকতের সাগরে নিজেকে

ডুভিয়ে দাও ও সেখান থেকে ভাল গুণগুলো অর্জন করতে চেষ্টা চালিয়ে যাও! ভুল পথের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাক, তাহলে অতি তাড়াতাড়ি তুমি সঠিক পথের সন্ধান পাবে!

রোযা

রোযার ফরযঃ রোযার ফরয তিনটি। যথা- ১। নিয়ত করা, ২। রোযা শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত নিয়ত করা। অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত করা, ৩। রোযা রাখাকালীন সময়ে রোযা ভঙ্গ হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। যদি কোন ব্যক্তি নিয়ত ব্যতীত সুবে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখে তাহলে তার ঐ দিনের রোযা হবে না। পুনরায় ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

রোযা **ফরয হওয়ার শর্তাবলী ৭টিঃ**

১। মুসলমান হওয়া।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক (বালেগ) হওয়া। অপ্রাপ্তরাও রোযা রাখতে পারবে।

৩। বিচক্ষণতা সম্পন্ন হওয়া।

৪। মুসলিম শাসিত এলাকায় হওয়া ও রমযানের রোযা ফরয এটা নিশ্চিত হওয়া।

৫। মুকিম হওয়া।

৬। হায়েজ অবস্থায় না থাকা। (নারীদের ক্ষেত্রে)

৭। নেফাস অবস্থায় না থাকা। (নারীদের ক্ষেত্রে)

রোযা ভঙ্গের সাতটি কারণঃ

১। খাবার জাতীয় কোন কিছু খাওয়া।

২।পানি জাতীয় কিছু পান করা।

৩। হায়েজ হওয়া। (নারীদের ক্ষেত্রে)

৪। নেফাস হওয়া। (নারীদের ক্ষেত্রে)

৫। মুখ ভরে বমি করা।

৬। মিথ্যা বলা বা গীবত করা। মিথ্যা স্বাক্ষ্য রোযা ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এ জাতীয় কাজগুলো রোযায় অর্জিত সওয়াবগুলোকে নিষ্কাশন করে ফেলে।

যাদের উপর রোযা ফরয নয়ঃ

১। অমুসলিমের উপর,

২। মুসাফিরের উপর,

৩। হায়েজ হওয়া নারীর উপর,

৪। নেফাস হওয়া নারীর উপর,

৫। গর্ভবতী নারীর উপর যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়,

৬। সন্তানকে দুধ পান করানোকালীন সময়ে যদি তার রোযা সন্তানের ক্ষতি করার আশঙ্কা থাকা তাহলে রোযা রাখা ফরয নয়,

৭। এমন বয়স্ক ব্যক্তি যার পক্ষে রোযা রাখা আদৌ সম্ভব নয়।

ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া মতে রোযার জন্য প্রতিদিন নিয়্যত করা আবশ্যক। নিয়্যত অন্তর দ্বারা করা হয়। সেহরীর জন্য (শেষ রাতের খাবার) জাগ্রত হওয়ার নামকে নিয়্যত বলা হয়। দুই প্রকারের নিয়্যত রয়েছে, প্রথমত রমযান মাসের রোযার জন্য প্রতিদিন নিয়্যত করা। অথবা নফল কোন রোযার জন্য নিয়্যত, অথবা ঐ সমস্ত রোযা যা কোন নির্দিষ্ট মানতের জন্য রাখা হয়। যার জন্য পূর্ববর্তী দিনের সূর্যাস্ত ও আজকের দিনের **যাহুল কুবরার** মাঝামাঝি সময়ে নিয়্যত করে নিতে হবে। যার অর্থ হচ্ছে ঐ দিনের আযানের সময়ের আগে অথবা ঐ সময়ে নিয়্যত করে নিতে হবে। ফযরের পূর্বে হলে নিয়্যত এভাবে করতে হবে "যে আমি আগামি কালের জন্য রোযার নিয়্যত করছি"। আর ফযরের পর হলে নিয়্যত এভাবে করতে হবে, যে আমি আজকের রোযার জন্য নিয়্যত করছি।

দ্বিতীয় প্রকারের নিয়্যত হচ্ছে নফল অথবা কাফফারা রোযার নিয়্যত। এ সব প্রকারের নিয়্যত এক রকম হবে। অর্থাৎ এর নিকটতম সময় হচ্ছে পূর্ববর্তী দিনের সূর্যাস্ত আর সর্বশেষ সময় হচ্ছে ঐ রাতের ফজরে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। উপরোক্ত সময় ছাড়া নফল অথবা কাফফারার রোযার নিয়্যত করা বৈধ হবে না। এই বিষয়ে ইবনে আবেদীন ক্বাযা নামায সংবলিত কিতাবের শেষাংশে বিস্তারিত

উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি রমজান মাসের রোযা ক্বাযা করে থাকে তাহলে হারাম দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন ঐ রোযাগুলো পালন করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন দিনের নফল রোযা তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মানুষের উপর ভিত্তি করে রোযাকে তিন ভাগে ভাগ কর হয়েছে। অশিক্ষিত লোকের রোযা, শিক্ষিত লোকের রোযা এবং নবী, রাসুল ও আওলিয়াদের রোযা। যখন অশিক্ষিত লোকেরা রোজা রাখে তখন তারা কোন প্রকার আহার পানাহার ও সহবাস জাতীয় কাজ সম্পাদন করে না, কিন্তু অনেক প্রকার ভুল কাজ করে ফেলে। শিক্ষিত লোকেরাও কোন প্রকার ভুল করে না। অন্যদিকে আম্বিয়া ও আওলিয়ারা সকল প্রকার সন্দেহযুক্ত কাজ থেকে দুরে থেকে রোযা পালন করে থাকেন।

মানুষের উপর ভিত্তি করে ঈদুল ফিতরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও নবী আওলিয়াদের ঈদ। অশিক্ষিত লোকেরা রমযানের শেষ দিন সন্ধায় ইফতারের মাধ্যমে পছন্দ মত খাবার গ্রহন করে এবং বলে এটা আমাদের ঈদ। শিক্ষিত লোকেরাও খাবার গ্রহন করে এবং বলে এটা আমাদের ঈদ ও আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের উপর খুশি হয়েছেন। তারা গভীরভাবে চিন্তা করে বলে যে, আমাদের কি হতো যদি তিনি আমাদের কর্ম ক্ষমতার উপর সন্তুষ্টি না হতেন অর্থাৎ তারা তাদের রবের শুকরিয়া আদায় করে ভালভাবে। আর নবী ও আওলিয়ারা তাদের রবের শুকরিয়ার আদায়ের মাধ্যমে ঈদ উদযাপন করে।

মুমিনের নিকট ঈদ (খুশি) পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে

১। যখন ফেরেশতা মুমিন ব্যক্তির বাম হাতে কোন প্রকার গুনাহ খুজে পায় না।

২। যখন মুমিন বাক্তি মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন ফেরেশতা তার কাছে খোশ খবর নিয়ে এসে শুভেচ্ছা জানায় এবং সুসংবাদ দেয় যে, সে একজন মুমিন। সর্বশেষ তাকে জান্নাতের অভিমুখে করে দেয়া হয়।

৩। যখন মুমিন ব্যক্তি কবরে যায় এবং নিজেকে জান্নাতের বাগানের মধ্যে খুজে পায়।

৪। কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে মুমিন ব্যক্তি নিজেকে উলামা, আম্বিয়া, আওলিয়া ও সালেহীনদের সাথে একসাথে বসতে পারায়।

৫। মুমিন ব্যক্তিকে পুলসিরাতের রাস্তা পার হওয়ার সময় ৭টি প্রশ্ন করা হবে। যদি সে প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারে তবে সে সফল হবে। যে সফরের

রাস্তা হবে চুলের চেয়ে চিকন, ছুরির চেয়েও ধারালো, রাতের অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার। যে রাস্তার উপরের দিকে উঠতে হাজার বছর, সমান্তরালে হাজার বছর ও নিচের দিকে হাজার বছরের রাস্তা থাকবে। যদি সে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আবার হাজার বছরের জন্য ওখানে শাস্তি অথবা অপেক্ষা করতে হবে। ৭টি প্রশ্ন হচ্ছে ঈমান, নামায, রোযা, হজ, যাকাত, হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর অধিকারসমূহ ও সর্বশেষ পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে। ইস্তিঞ্জা হল কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন করা বা শারীরিক মিলনের পর ওজু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। এই বিষয়ে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি সূর্যাস্ত হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, যার নিয়্যত সে ইমসাকের পূর্বে করে ছিল। তাহলে তাকে পুনরায় ঐ রোযা ক্বাযা ও কাফফারাসহ আদায় করতে হবে। নফল রোযার ক্ষেত্রে কাফফারা আদায় করতে হবে না।

কাফফারার নিয়ম হলো রমযান মাসের এক রোযা ভঙ্গের জন্য বছরের হারাম পাঁচ দিন ব্যতীত একটানা ষাট দিন রোযা রাখা যদি তা কারো পক্ষে সম্ভব না হলে ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্ত করে দেয়া। যদি তা না হয় তাহলে ষাটজন গরীব মিসকিন মানুষকে একদিনে দুবেলা খাবার ভাল করে খাওয়াতে হবে। অথবা একজন গরীব বা মিসকিন মানুষকে দিনে দুবার করে একটানা ষাট দিন খাওয়াতে হবে, অথবা তা সম্ভব না হলে তাদের প্রত্যেককে ক্বাযা পরিমান সম্পদ একসাথে করে ফিতরা হিসেবে তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

আর নফল রোযার ক্বাযা আদায় করার জন্য যে কোন একদিন আদায় করলে চলবে। পাঁচজন লোকের জন্য কাফফারা আদায় করতে হবে না। তারা হলো দুর্বল লোক, মুসাফির, দুধ পানকারিণী মায়ের জন্য, ফীরে ফানি ও এমন ব্যক্তি যে কিনা রোযা রাখলে ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা আছে। এসব লোকের জন্য কাফফারা আদায় করতে হবে না কিন্তু এক রোযার জন্য একদিন করে ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে।

আইয়্যামে শাকের নিয়্যত (ইসলামী পরিভাষায় আইয়্যামে শাক বলতে সাবান মাসের শেষের দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখতে না পারার কারণে আগামী কাল রমযান মাসের ১ম দিন হওয়া না হওয়া নিয়ে সন্দেহ বিরাজ করাকে আইয়্যামে শাক বলে। আইয়্যামে শাক করা বৈধ যদিও মাকরুহ (কারাহাত) বলা

হয়েছে। আইয়্যামে শাক কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত রমযান মাসের রোযা অথবা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করা। অথবা কোন নফল রোযার নিয়্যত যা ওয়াজিব নয়, যদি এটা রমযানের রোযা না হয়। দ্বিতীয়ত হল শুধুমাত্র নিছক উপবাস অথবা সাবান মাসের রোযার জন্য নিয়্যত করা যাহা মাকরুহ হবে না। যার দ্বারা নফল রোযার নিয়্যত করা বুঝানো হয়েছে। কারাহাত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, এমন সময়ে বা এমনভাবে ইবাদত পালন করা যে সকল সময়ে আমাদের প্রিয় রাসুল পালন করেননি বা পালন করাকে অপছন্দনীয় বলেছেন। অর্থাৎ ঐ ইবাদতটি মাকরুহের সাথে পালিত হবে।

কোন ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা কাফফারা আদায় করার জন্য ষাট দিন রোযা রাখা শুরু করল, এরই মধ্যে ষাট দিন পূর্ণ হওয়ার আগে ঈদুল আযহা চলে আসল অথবা হারাম পাঁচ দিনের যে কোন একদিন চলে আসল তাহলে তাকে ঐ হারাম দিন রোযা সাথে পালিত হয়ে থাকে তাহলে তা পালন করার কোন অর্থই আসে না। কারাহাতের সময় সম্পর্কে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের দশম অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি রমজান মাসের রোযার জন্য নিয়্যত করব, রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে নফল রোযা রাখলে তার জন্য নিয়্যত লাগবে না এই প্রকারের নিয়্যত কখনো গ্রহণ যোগ্য হবে না।

ইমাম আবু হানিফার মতে, কোন ব্যক্তি রমযান মাসে ফযরের পর অথবা পূর্বাকাশে শুভ্রতা দেখার পরও রোযার নিয়্যত না করে এবং দুপর হওয়ার আগে কোন কিছু আহার করে তাহলে তার জন্য কাফফারা লাগবে না। ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে, যদি তার পক্ষে নিয়্যত ও রোযা পরিপূর্ণ করার ক্ষমতা থাকত তাহলে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। আর যদি সে বিকালে কোন কিছু আহার করে তাহলে সকল আলেমের সর্ব সম্মত মতে তার জন্য কাফফারা লাগবে না।

কোন ব্যক্তি তার জীবনের শেষের দুই অথবা তিন মাসের রমযানের রোযা রাখতে পারে নাই অথবা ভেঙ্গে ফেলেছে, তাহলে তাকে কি সকল মাসের রোজার কাফফারা পৃথক পৃথক করে আদায় করতে হবে না কি যে কোন এক মাসের আদায় করলে চলবে? এটা নিয়ে ইমামদের মাঝে ইখতেলাফ আছে। কারো মতে, পৃথক করে সকল মাসের কাফফারা আদায় করতে হবে। কারো মতে, যে কোন এক মাসের আদায় করলে চলবে। তবে তা পরিস্থিতির উপর নির্ভরক না

রেখে পুনরায় নতুন করে ষাট দিনের রোযা রাখা শুরু করতে হবে। আগেরগুলো এখানে বিবেচিত হবে না। এ জন্য কাফফারা রাখার ক্ষেত্রে হারাম দিনগুলো খেয়াল করে রাখলে আর কোন ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

যদি কোন ব্যক্তি সফরের (ভ্রমন) নিয়্যত করা ব্যতীত রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তারপর সফরের নিয়্যত ও স্থান ত্যাগ করে তাহলে তাকে ঐ রোযার ক্বাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে। সফরে যাওয়ার ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গা কখনো বৈধ হবে না। কোন ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় উচিৎ হবে না ঐ দিনের রোযা ভেঙ্গে ফেলা। আর যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি রাতে রোযার নিয়্যত করে অথবা যাহুল কুবরার সময়ের আগে নিয়্যত করে তাহলে তার ঐ দিনের রোযা ভাঙ্গা উচিৎ হবে না। আর যদি সে ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তাকে ঐ রোযার জন্য ক্বাযা আদায় করতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তির রমযান মাসে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে রোযা রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে তাকে পরবর্তীতে রোযা রাখতে হবে। পরে যে সব রোযা রাখতে পারে নাই তার ক্বাযা আদায় করতে হবে। আর যদি তার মানসিক সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তার জন্য বাকি রমযানে রোযা রাখার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ তাকে রোযা থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখাকালীন সময়ে ভুলে কোন কিছু খেয়ে ফেললো তাহলে তার রোযা ফাসিদ হবে না। ভুলে কিছু খাওয়ার সময় যদি মনে পড়ে সে রোযা অবস্থায় আছে তাহলে সাথে সাথে তাকে তা পরিহার করতে হবে অন্যথায় তার রোযা ফাসিদ হবে। তাহলে তার জন্য ক্বাযা আদায় করতে হবে। কাফফারা করতে হবে না। আর যদি সে রোযা অবস্থায় আছে জানা সত্ত্বেও খাবার পরিহার না করে এ কারণে যে তার রোযা ফাসেদ হবে না, তাহলে তার জন্য ক্বাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে। কোন ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় ঘাম, রঙ্গিন স্ট্রিং এর টুকরা, শিশুদের অথবা কারো মুখের লালা কিংবা নিজের মুখের লালা বাহির হওয়ার পর পুনরায় গিলে ফেলা, খাবারের কোন ক্ষুদ্র অংশ দাঁতের সাথে যুক্ত ছিল তা সেখান থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলা ও শরীরে ইঞ্জেকশান ব্যবহারসহ উপরোক্ত কাজগুলোতে রোযা বাতিল হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্বাযা আদায় করলে চলবে। কাফফারা দিতে হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি পেপারের টুকরা, কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন, চাল অথবা শস্যের অংশ গিলে ফেলে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। তার জন্য তাকে ক্বাযা রোযা

আদায় করতে হবে। এটা কোনভাবে বৈধ হবে না, যে রোযা অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ অথবা কোন মেডিসিন গ্রহন করা। তার মতে কোন কিছুর স্বাদ নেয়ার অর্থ হল পুরো খাবার গ্রহণ করা।

যদি কোন ব্যক্তি বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে, যদি এ কাজ তাকে অসুস্থ করার আশংকা রয়েছে তাহলে অসুস্থ হওয়ার আগে রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে না। যদি সে ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা পরিহার করার জন্য তাকে কিছু খাওয়ার পূর্বে পেপারের একটা অংশ গিলতে হবে। আর গর্ভবতী বা দুধ পানকারিণী নারী রোযার কারণে ক্ষুধার তাড়নায় মারাত্মক দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তারা শুধু মাত্র ক্বাযা আদায় করবে। ফতোয়ায়ে ফায়জিয়ার মতে, কোন ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখা অবস্থায় কোন প্রকার ওজর ব্যতীত অবজ্ঞা করে কোন কিছু আহার বা পান করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি তিলের পরিমান কোন কিছু চর্বণ করে তাহলে তার রোযা ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি সেটা গিলে ফেলে তাহলে ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং তার জন্য ক্বাযা আদায় করা আবশ্যক।

পনের প্রকারের রোযা রয়েছে। তার মধ্যে তিন ধরনের রোযা ফরয, তিন ধরনের ওয়াজিব, পাঁচ ধরনের হারাম, এবং চার ধরনের সুন্নত। ফরয রোযাগুলো হচ্ছে- রমজান মাসের, ক্বাযা ও কাফফারার রোযা। ওয়াজিব রোযা হচ্ছে- নাজরে মুয়ায়্যিন, নাজরে মুতলাক ও মানতের রোযা।

হারাম রোযা হচ্ছে- ঈদুল ফিতর ও কুরবানির ঈদসহ চার দিনের রোযা। এ সকল দিনে রোযা রাখা হারাম। সুন্নত রোযা হচ্ছে- **আইয়্যামে বীযের** রোযা (প্রত্যেক আরবি মাসের ১৪, ১৫, ১৬ তারিখের)। **শামেদা উদদিনের** রোযা, সোমবার ও বৃহঃ প্রতিবারের রোযা, **আশুরা ও আরাফার দিনের** রোযা।

রোযায় ১১ টি উপকার রয়েছে

১। রোযা ঢাল স্বরূপ।

২। রোযা একমাত্র আল্লাহর জন্য, এর প্রতিদান আল্লাহ নিজে দিবেন।

৩। রোযা এক প্রকারের জিকির, যাহা শরীর দিয়ে সম্পাদন করা হয়।

৪। রোযা দাম্ভিকতা, অহমিকা ও অহংকারের মত কবিরা গুনাহকে মুছে দেয়।

৫। রোযা স্বার্থপরতাকে দূর করে।

৬। এটা খুশু তথা আল্লাহ্ ভয় করাকে বৃদ্ধি করে।

৭। রোযায় অর্জিত সওয়াব দাঁড়ি পাল্লায় ওজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

৮। আল্লাহ্ তায়ালা রোযাদারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

৯। যদি কোন ব্যক্তি ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করলে রোযার কারণে জান্নাতে দ্রুত প্রবেশ করবে।

১০। রোযাদারের অন্তরকে নুর দ্বারা উজ্জ্বল করে দেয়া হয়।

১১। রোযাদারের অন্তরকে নুর দ্বারা আলোকিত করে দেয়া হয়।

সাবান মাসের ২৯তম দিন সূর্যাস্তের পর পূর্ব দিগন্তে নতুন মাস তথা রমযানের চাঁদ উঁকি দিছে কিনা তা দেখা আবশ্যক। মুসলমানদের থেকে যিনি আদিল, তিনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নতুন চাঁদ দেখলে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা অথবা সরকারকে অবহিত করবে। আর এভাবে রমযান শুরু হবে। আর যদি চাঁদ স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাহলে সবার কাছে বিষয়টি দিনের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাউকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন হবে না। যদি ঐ দিন চাঁদ না উঠে তাহলে সাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে। পরের দিন থেকে রমযান মাস শুরু হবে। **বাহরুর রায়েক, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ও কাযি খাঁ** মতে রমযান মাসের শুরু কোন ক্যালেন্ডার অথবা জ্যোতির বিদ্যা গণনার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং তা চাঁদের উপর নির্ভরশীল।

যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি **দারুল হারবে** বসবাস করে অথবা রমযানের শুরু হওয়ার বিষয়ে অসচেতন থাকে তাহলে সে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে পারবে। হতে পারে সে রমযানের একদিন আগে শুরু করবে অথবা একদিন দেরীতে অথবা সঠিক সময়ে শুরু করতে পারে। প্রথমত, সে রমযান শুরু হওয়ার একদিন আগে শুরু করলে একদিন আগে (রমযান শেষ দিন) ঈদ উদযাপন করবে। দ্বিতীয়ত, সে রমযানের প্রথম দিনে রোযা না রাখার কারণে রমযানের শেষের দিন তথা ঈদের দিন (৩০ দিন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে) রোযা রাখবে। অন্যথায় সে রমযানের ২৮ দিন রোযা রাখার পর ঈদ উদযাপন করবে, পরের মাসে রমযানের বাকি ২ দিনের রোযা ক্বাযা আদায় করে নিবে। তৃতীয়ত, একটি মাসের শুরু ও শেষ সন্দেহযুক্ত হওয়ায় সে তার রোযা রমযান মাসের সাথে এক সাথ করে ফেলছে। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত ঐ দিনের রোযা রমযান মাসের রোযার সাথে গন্য করা সহিহ হবে না। এ জন্যে তাকে ঐ দুই দিনের রোযা ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে। এখানে মানুষ যদি পূর্বাকাশে নতুন চাঁদ উদয় না হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী রোযা রাখা শুরু করে তাহলে তাদেরকে রমযান মাসের (ঈদের) শেষে ক্বাযার উদ্দেশ্যে ২ দিনের রোযা ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে। ইবনে আবেদিনের মতে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে ইফতার কর যাবে না। যদিও কোন ব্যক্তি নিজেকে

বুঝানোর চেষ্টা করে যে সূর্য অস্ত গিয়েছে, এমন কি যদি মাগরিবের নামাযের আযানও দিয়ে দেয়া হয়। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি ইশ্তে বা কুন্নুজুমের (এমন এক সময় অধিকাংশ তারকা প্রদর্শিত হয়) পূর্বে ইফতার করে ফেলল, অথবা কেউ মুস্তাহাব তথা তা'জিল (তাড়াতাড়ি ইফতার) করল। যখন সূর্য অস্ত যাবে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে তাহলে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানকারীদের ইফতার করতে বাধা নেই। কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য ইফতার করা বৈধ হবে না যে কিনা উঁচু বা মিনার জাতীয় স্থানে অবস্থান করছে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে সূর্য অস্ত হয়েছে নিশ্চিত না হয়। একই নিয়ম সেহেরী ও ফজরের নামাযের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। জ্যোতির্বিদ্যা বইয়ের **তামকীন** ট্যাবুলেটে লিস্টের আলোকে যা দিয়ে সময়ের উচ্চতা পরিমাপ করা হয়; যা **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের দশমতম অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে সকল নামাযের ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে কখন নামায আদায় করতে হবে তামকীনের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। এমনকি এর মাধ্যমে উঁচু স্থানেও কখন নামায আদায় করতে হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। যাহা **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের পঞ্চমতম অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তামকীন অনুযায়ী ক্যালেন্ডার তৈরি না করলে সেখানে সূর্য কয়েক মিনিট আগে অস্ত যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর যদি তামকীন অনুযায়ী তৈরি করা হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই তার অস্ত যাওয়ার কথা লিখা হয়েছে ক্যালেন্ডারে। আর যে ব্যক্তি উক্ত ক্যালেন্ডার দেখে রমযানের ইফতার করে তাহলে তার রোযা ফাসিদ হিসেবে গণ্য করা হবে। যা কিনা তামকীন অনুযায়ী তৈরি করা হয় নি।

কুরবানি

কুরবানি পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত রয়েছেঃ

১। বিচক্ষনতা সম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম হতে হবে।

২। মুকিম হতে হবে।

৩। নিসাব পরিমান যথেষ্ট সম্পদের মালিক হতে হবে।

কুরবানির করার জন্য পশু হতে হবে মহিষ, ছাগল, উট অথবা গৃহপালিত পশুদের মধ্য থেকে যেমন ষাঁড়, বলদ, গরু ইত্যাদি হওয়া বাধ্যতামূলক। সাত শরীকে কুরবানি করা যাবে। অর্থাৎ ষাঁড়, গরু, বলদ কুরবানির মধ্যে সাত শরীক অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আট কিংবা তার অধিক অংশ গ্রহণে কুরবানি ফাসিদ হিসেবে হবে। কুরবানির নিসাব আর ফিতরার নিসাব সমান।

সাত শরীকের কম শরীক দিয়েও কুরবানি বৈধ হবে। পশু জবাইয়ের সময় সকল অংশীদার উপস্থিত থাকা ভাল, অন্যথায় পশু জবাইয়ের পরে উপস্থিত হলেও সমস্যা নাই। কিন্তু কুরবানির আগে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে কুরবানি আদায় করার জন্য পশুর (গরু অথবা বলদ) সাত ভাগের একঅংশ পত্রের মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবে। তারা তাদের কুরবানির পশুর মাংসকে অংশীদার অনুযায়ী ভাগ করে নিবে। যদি কোন অংশীদার মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীরা যদি তার পক্ষে ও অপর অংশীদারের পক্ষে থেকে কুরবানি সম্পাদন করতে বলে তাহলে তা বৈধ হিসেবে গন্য হবে। অর্থাৎ এটা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করার জন্য তার নৈকট্য লাভের পন্থা হয়ে যাবে।আর যদি তারা রাজী না হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির (নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানি) ও অপর পার্টনারের কারো ত্যাগ সম্পাদন হবে না।কিন্তু কুরবানি সহিহ হবে। পার্টনারদের মধ্য থেকে কেউ যদি মুমিন না হয় অথবা সে শুধুমাত্র মাংস নেয়ার জন্য অংশগ্রহণ করেছে তাহলে তার ও অপর পার্টনারদের কারো কুরবানি সহিহ হবে না। কেননা, প্রত্যেকে ত্যাগের মহিমায় নিয়্যত করেছে আর নিয়্যত ছিল বাতিল। অর্থাৎ মাংস খাওয়ার নিয়্যত কখনো ত্যাগের নিয়্যত হতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি এ বছরের কোরবানির নিয়্যত করে এবং তার অপর পার্টনার পরের বছর কুরবানির নিয়্যত করে পরের ব্যক্তির নিয়্যত বাতিল হবে। এবং তাদের জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়া হালাল হবে না। বরং তা গরীব বা মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। প্রথম ব্যক্তির নিয়্যত হালাল হিসেবে গন্য হবে। কিন্তু সে মাংস খেতে পারবে না। কুরবানি করার ক্ষেত্রে নিয়্যতকে অবশ্যই প্রধান্য দিতে হবে তা কি কুরবানির মাংস খাওয়ার জন্য নাকি ত্যাগের জন্য। কুরবানি করা হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য। তাই এটা সুন্নত নাকি ওয়াজিব তা জেনে নিতে হবে।পাশাপাশি এই ত্যাগ করার সময় অনেকগুলো ওয়াজিব কাজ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তা ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে। কুরবানির সাথে সাথে শিশু অথবা বয়স্ক লোকের জন্য আকিকাও করা যাবে। আকিকা হচ্ছে নতুন শিশু জন্ম নেয়ার পর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া স্বরূপ ত্যাগ বা কুরবানি করা। আর তা হচ্ছে সকল মুসলমানকে (আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী) সমবেত করে বিবাহের মত আপ্যায়ন করাকে আকিকা বলে। অর্থাৎ আকিকা কুরবানির সাথে করা বৈধ। আর এই ধরনের ত্যাগ করাকে সুন্নত বলা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কুরবানির দিন সকল অংশিদার একসাথে হয়ে কুরবানি তথা আল্লাহ্‌র

নৈকট্য লাভের জন্য নিয়্যত করা। হানাফি মাযহাব মতে, আকিকার জন্য পশু কুরবানি করা সুন্নত নয়।বরং তা মুস্তাহাব বা মুবাহ (বৈধ)। মুস্তাহাব কাজ সম্পাদন করা এক প্রকারের ত্যাগ। এমনকি মুবাহ কাজ করাও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের আওতায় পড়ে, যদি তা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। এমন সামাজিক অনেক ধরনের প্রথা রয়েছে যা নিয়্যত ব্যতীত পালনের মাধ্যমে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আবার অনেক প্রকারের মুবাহ কাজ রয়েছে, যা কেউ নিয়্যত করলে (তা'আতের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কুরবানিও আকিকা সম্পর্কিত উকুদ উদ দুরায়্যাহ ও দররুল মুখতার নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হজ্ব

হজ্বের রোকন (ফরয) ৩টিঃ

১। ইহরাম বাঁধা।

২। আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে জিয়ারাত তথা কাবাঘর প্রদক্ষিণ করা।

আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য জিলহজ্ব মাসের ৯তম তারিখে সকাল অথবা দুপুরের মধ্যে অবস্থান করলে হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার একদিন আগে অথবা একদিন পরে আরাফায় অবস্থান করে তাহলে তার হজ্ব বাতিল হিসেবে গন্য হবে। ওহাবিরা কুরবানের ঈদ নতুন চাঁদ না দেখে উদযাপন করে। কোন ব্যক্তি যদি সঠিক সময়ে আরাফার ময়দানে উপস্থিত না হয় তাহলে তার হজ্ব বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

কাবা শরীফ তাওয়াফ করার নিয়ম সাতটিঃ

১। তাওয়াফে জিয়ারাত,

২। তাওয়াফে উমরাহ। (উপরোক্ত দুই প্রকার তাওয়াফ ফরয)

৩। তাওয়াফে কুদুম। যাহা সুন্নত বলা হয়েছে।

৪। তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ বিদায় বেলার তাওয়াফ।

৫। তাওয়াফে নাজর যা পালন করা ওয়াজিব।

৬। তাওয়াফে নাফিলা।

৭। তাওয়াফে তাতায়্যুহ যাহা পালন করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে।

হজ্ব পালনের জন্য ইহরাম বাধার নিয়্যত করা ফরয। ইহরাম হচ্ছে কাপড়ের টুকরা যা পরিধান করা সুন্নত বলা হয়েছে। সেলাই করা কাপড় অবশ্যই পরিহার করতে হবে অর্থাৎ পরিহার করা ওয়াজিব।

হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে আটটিঃ

১। মুসলমান হওয়া।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩। বিচক্ষণতা সম্পন্ন হওয়া।

৪। স্বাস্থ্যবান হওয়া।

৫। গোলাম না হওয়া। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া।

৬। হজ্ব যাওয়া ও ফিরে আসা পর্যন্ত এমনকি পরিবাবের জন্য যাবতীয় ব্যয়ের যথেষ্ট পরিমান সম্পদ থাকা।

৭। হজ্ব পালনের জন্য আরাফার ময়দানে একদিন ও কুরবানির জন্য চারদিন সময় হাতে রেখে বাড়ি থেকে বের হওয়া।

৮। মহিলার জন্য তার সাথে তার স্বামী অথবা মুহরিম থাকা আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব পালন করতে চায় তাহলে তাকে উপরোক্ত আঁটটি শর্তকে সামনে রেখে হজ্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় তার হজ্ব বৈধ হবে না। হজ্ব জীবনে একবার পালন করা ফরয। যদি কেউ একাধিকবার পালন করতে চায় তাহলে তার পরবর্তী হজ্বগুলো নফল তথা **অতিরিক্ত ইবাদত** হিসেবে তার আমল নামায় যুক্ত হবে। কেউ যদি নফল ইবাদত করতে চায় সেটা তার উপর নির্ভর করবে। কিন্তু ইহা ফরয বা ওয়াজিব না। নফল ইবাদতের সাওয়াব ফরয ইবাদতের সাওয়াব এক ফোটা পানির সাথে বিশাল সাগরের পানির মত সমতুল্য। মুসলিম স্কলাররা মক্কা থেকে দূরে বসবাস করা মুসলমানদের জন্য নফল তথা দ্বিতীয় হজ্ব করাকে বারণ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ দেহলবি (রাঃ) তার বিখ্যাত **মাকাতিবে শরিফা** নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, যদি কোন ভ্রমন মক্কার উদ্দেশ্যে হজ্বের জন্য হয়ে থাকে তাহলে তা সঠিকভাবে পালন করা অসম্ভব একটা বিষয়। আর এই কারণে ইমাম রাব্বানি (রাঃ) তার লিখিত চিঠিসমুহের মধ্যে উমরা অথবা নফল হজ্ব আদায় করার জন্য মক্কায় ভ্রমণ করাকে অনুমোদন দেন নি। তার মতে নফল হজ্ব পালন করা হারাম কেন না এটা অন্যন্য ইবাদত কাজে বাধা হয়ে দাড়াঁবে। ছগিরা গুনাহ মাপের জন্য

নফল হজ্ব পালন করার চেয়ে অন্য কোন ভাল কাজের মাধ্যমে প্রদায়ক সাওয়াব অর্জন করা অধিকতর উত্তম। তার চেয়ে বরং ওমরা পালন করা অধিক শ্রেয়।

৫৪টি ফরয কাজ

একজন মুসলমান ঘরের বালক যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন তাকে **মুসলমান** বলা হয় ও একজন নন মুসলিম যখন **কালিমায়ে তাওহীদ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ** পাঠ করার পাশাপাশি কি বুঝানো হয়েছে তা বিশ্বাস করলে তাকে মুসলমান হিসেবে অভিহিত করা হবে। মুসলমান হওয়ার পর তার সকল গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং ক্ষমা করে দিবেন। যাই হোক, এই দুই ধরণের ব্যক্তি অন্যান্য মুসলমানদের মত ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয় মুখস্ত করবে যার শুরুটা আমানতু দিয়ে। যখন তাদের সময় হবে এই সকল বিষয় তারা মুখস্ত করে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এবং বলবে আমি বিশ্বাস করি ইসলামে যাবতীয় সকল কিছুর আদেশ কিংবা নিষেধ একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। পরবর্তীতে তাদের যখন সময় বা অনুকুল পরিবেশ পাবে প্রথমে ইসলামের ফরয, নির্দেশ ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নিবে। পরে ইসলামের নিষেধাজ্ঞাসহ তাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক আচরণ কেমন হবে সময় করে শিখে নিবে। কিন্তু তারা যদি এগুলোকে শিখতে অনীহা পোষণ করে কিংবা ইসলামের ফরয বা অন্যন্য বিধানগুলোর কোনটি অস্বীকার করে বা অবজ্ঞা করে তাহলে মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে।

অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যদি কেউ ইসলামের কোন বিধানকে অবজ্ঞা করে যেমন পর্দা করা ইসলামে ফরয যদি এটাকে সে অবজ্ঞা করে তা হলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে যদিও সে কিনা তাওবা করে বা ইসলামের কোন হুকুম যেমন নামায পালন, রোযা রাখা, হজ্জ করা, যাকাত প্রদান করা ইত্যাদি পালন করে তবুও সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না। এমন কি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বললেও মুসলমান হবে না। তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে কৃতকাজের জন্য তাওবা করতে হবে। কেননা তারা ইসলামের মতাদর্শকে অস্বীকার করে ছিল।

ইসলামী স্কলারগণ এমন ৫৪টি ফরয নির্ধারণ করেছেন, যাহা প্রত্যেক মুসলমান তার ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাস ও পালন করার জন্য বলেছেন। যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১- মহান আল্লাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় এবং তাকে কখনো ভুলা যাবে না,

২- হালাল জিনিস খাওয়া ও পান করা,

৩- সব সময় পবিত্র অবস্থায় থাকা,

৪- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত আদায় করা,

৫- নামায আদায়ের আগে অপবিত্র থাকলে গোসল করে নেয়া,

৬- একথা বিশ্বাস করা যে, রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা,

৭- পরিষ্কার ও হালাল উপার্জনের টাকায় খরিদ করা কাপড় পরিধান করা,

৮০০- সর্ববস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা,

৯- সর্ববস্থায় সন্তুষ্ট থাকা,

১০- সর্ববস্থায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা,

১১- তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা, যাহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে,

১২- যে কোন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা, আর এটা কারো বিরুদ্ধে কোন প্রতিরক্ষামুলক ব্যবস্থা নয়,

১৩- যাবতীয় গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, (নিয়মিত ইস্তেগফার করা),

১৪- ইখলাসের সহিত যাবতীয় ইবাদত পালন করা,

১৫- মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং শয়তানকে নিজের শত্রু মনে করা,

১৬- কুরাআন শরীফকে নিজের একমাত্র দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা,

১৭- সকলকে একদিন মত্যুবরণ করতে হবে, তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা ও তার জন্য প্রস্তুত থাকা,

১৮- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাউকে ভালোবাসা ও তার জন্য কাউকে অপছন্দ করা,

১৯- মাতাপিতার প্রতি সর্বদা সদাচরণ করা,

২০- কাউকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা ও খারাপ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করা,

২১- আত্মীয়দের খোজ খবর নেয়া,

২২- কারো সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা না করা,

২৩- সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা ও যাবতীয় হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা,

২৪- মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও রাসুলের আনুগত্য করা,

২৫- হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ও ইবাদতের মাধ্যমে সময় আতিবাহিত করা,

২৬- উলুল আমরের আনুগত্য করা ও আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়া,

২৭- গভীর দৃষ্টিতে নিজের শরীরের দিকে পরমানন্দ করা,

২৮- মহান আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্বের ব্যপারে গভীরভাবে ধ্যান ধারণা করা,

২৯- হারাম কাজ ও অশোভন কর্ম কাণ্ডের বিপক্ষে অবস্থানকারীকে সহায়তা করা,

৩০- দুনিয়াবী বিষয়ে ব্যস্ত কাউকে আখেরাত সম্পর্কে উপদেশ দেয়া,

৩১- কাউকে উপহাস না করা,

৩২- হারাম কোন বস্তুর দিকে না তাকানো,

৩৩- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যদিও কোন প্রকার ক্ষতি হয়ে যায়,

৩৪- নিজের কর্ণদ্বয়কে অশোভন বাক্যালাপ ও গান শুনা থেকে বাঁচিয়ে রাখা,

৩৫- ফরয ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা,

৩৬- ওজনের ক্ষেত্রে ভারসম্যতা ও সততা ঠিক রাখা,

৩৭- নিরাশ বা হতাশ না হওয়া,

৩৮- গরীব মুসলমানদেরকে যাকাত প্রদান ও যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করা,

৩৯- মহান আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও রহমতের বিষয়ে কাউকে আশা না দেয়া, যাতে করে সে নিয়মিত আমল করতে পারে,

৪০- নফসের ইচ্ছায় হারাম কাজে জড়িয়ে না পড়া,

৪১- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় অভুক্তকে খাওয়ানো,

৪২- কাজের মাধ্যমে রিজিকের তালাশ করার চেষ্টা করা,

৪৩- সম্পদের জন্য যাকাত ও ফসলাদির জন্য উশর প্রদান করা,

৪৪- স্ত্রীর মাসিক চলা অবস্থায় শারীরিক সম্পর্কে না জড়ানো,

৪৫- নফসকে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে দূরে রাখা,

৪৬- অহংকার ও দাম্ভিকতা এড়িয়ে চলা,

৪৭- প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের ধন সম্পদের সুরক্ষা করা,

৪৮- যুবক ছেলেদের নিকটবর্তী না হওয়া,

৪৯- সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ও ক্বাযা যাতে না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা,

৫০০- বল প্রয়োগ করে কারো সম্পত্তি দখল না করা,

৫১- মহান আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক না করা,

৫২- পর্ণগ্রাফিকে এড়িয়ে চলা,

৫৩- মদ অথবা নেশা জাতীয় বস্তু থেকে নিজেকে, পরিবার ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা,

৫৪- নিজে বা অন্য কারো সাথে মিথ্যা শপথ না করা,

[পানি জাতীয় সকল মদ নাজাসাতের অন্তর্ভূক্ত। নাজাসাতের দুই প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হল কাবা নাজাসাত যাহা **ইন্দলেস ব্লেস** নামক কিতাবের ষষ্টতম অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। **বাহরুর রায়েক** ও **ইবনে আবেদীন** নামক কিতাবে বলা হয়েছে, যখন মাটি ও পানি মিশ্রিত হয় তাদের দুইটির একটির উপাদান পরিষ্কার হয় তখন কাদাযুক্ত মাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এটাই শুদ্ধ মত। ইজতেহাদ করার মাধ্যমে এই ফতোয়াটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও এখানে অনেক স্কলারস ভিন্নমত পোষণ করেছেন । তারা বলেছেন এটি দুর্বল ফতোয়া। **ইবনে আবেদীন** ও **হাদীকা** নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, এই দুর্বল ফতোয়াটিকে গ্রহণ করা যাবে যখন কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে। আবার এলকোহল জাতীয় পনি মাটির সাথে মিশ্রিত হলে কিছুক্ষণ পরে তাও পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এটি বলা হয়েছে শাফী মাযহাবের অন্যতম কিতাব **আল মাফুয়াত**

গ্রন্থের হাশিয়ার মধ্যে। যা সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ সিরাজী কর্তৃক মোল্লা হালিল সিরাজীকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও এই জাতীয় পানি ব্যবহারের মাধ্যমে নামায আদায় করে না। তাত্ত্বিকভাবে এই জাতীয় পানি কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের অনুমতি আছে। কিন্তু তা কখনো পান করা যাবে না কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও । এলকোহল জাতীয় পানীয় সর্বাবস্থায় নাপাক। ঐ জাতীয় পানি যদি অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয় তা হলে সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য নয় বরং জরুরী অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহার অবস্থায় পান করা হারাম।]

কবিরা গনাহ

অনেক ধরনের বড় গুনাহ রয়েছে যাকে গুনাহে কবিরা বলে। নিম্নে ৭২টি কবিরা গুনাহ উল্লেখ করা হল-

১। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

২। ব্যাভিচার করা।

৩। সমকামিতা।

৪। নেশা জাতীয় কিছু পান করা।

৫। চুরি করা।

৬। মাদক গ্রহন করা।

৭। চাঁদাবাজি বা জোর করে কারো সম্পত্তি আত্নসাৎ করা।

৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

৯। কোন কারণ ছাড়া রমযান মাসে অন্য মুসলিমের সামনে খাবার খাওয়া।

১০। সম্পদ, টাকা বা অন্য কিছুর বিনিময়ে সুদ নেয়া।

১১। অযথা আল্লাহর নামে শপথ করা।

১২। মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া।

১৩। আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

১৪। শত্রুদের ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

১৫। এতিমের অনুমতি ব্যতিত তার সম্পদ ব্যবহার করা।

১৬। সঠিক মাপ (দাড়ি পাল্লা) না দেয়া।

১৭। সিরিয়াল অনুযায়ী দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় না করা।

১৮। অপর মুসলিম ভাইকে আঘাত দেয়া।

১৯। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা অথবা তার হাদীসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা। যদিও ঐ সকল মিথ্যারোপ রাসুলের সাথে সম্পর্কিত নাই।

২০। ঘুষ গ্রহণ করা।

২১। সত্য সাক্ষ্য প্রদানে এরিয়ে চলা।

২২। সম্পত্তির যাকাত বা উশর প্রদান না করা।

২৩। কোন ব্যক্তিকে অন্যায় করতে দেখে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করা।

২৪। কোন জীবন্ত পশুকে অন্যায়ভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা।

২৫। কুরআন শিখার পর তা আবার ভুলে যাওয়া।

২৬। আল্লাহর মার্জনা পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়া।

২৭। মানুষের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করা, মুসলিম অথবা অমুসলিম হোক।

২৮। শুকরের মাংস খাওয়া।

২৯। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সাহাবীকে ঘৃণা অথবা ভৎসনা করা।

৩০। তুষ্ট লাভের পরেও খাবার চালিয়ে যাওয়া হারাম।

৩১। কোন কারণ ছাড়া স্বামীর সাথে মিলিত হতে অস্বীকার করা।

৩২। স্বামীর অনুমতি ছাড়া পরিচিত কারো সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে যাওয়া।

৩৩। কোন সতী, পবিত্রা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।

৩৪। গীবত অর্থাৎ একের কথা অন্যের কাছে লাগানো।

৩৫। কারো গোপনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

৩৬। মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া।

৩৭। বিশ্বাস ভঙ্গনের অঙ্গীকার করা।

৩৮। অপর মুসলিম ভাইয়ের নিন্দা করা।

৩৯। হিংসা করা।

৪০। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

৪১। মিথ্যা বলা।

৪২। অহংকার করা।

৪৩। কোন ব্যক্তি মৃত্য শয্যায় থাকা অবস্থায় তাকে তার উত্তরাধীকার থেকে বঞ্চিত করা।

৪৪। কৃপণতা করা।

৪৫। দুনিয়ামুখী হওয়া।
৪৬। আল্লাহর তায়ালার যাবতীয় আজাবের ভয় না করা।
৪৭। হারামকে হারাম হিসেবে না মানা।
৪৮। হালালকে হালাল হিসেবে না মানা।
৪৯। জাদুকরের ভবিষ্যৎবানীকে বিশ্বাস করা।
৫০। নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া।
৫১। কোন কারণ ছাড়া অন্য কারো স্ত্রী অথবা মেয়ের দিকে তাকানো।
৫২। নারী পুরুষদের কাপড় পরিধান করা।
৫৩। পুরুষ নারীদের কাপড় পরিধান করা।
৫৪। হারাম শরীফের মধ্যে কোন পাপ কাজ সম্পাদন করা।
৫৫। নামাযের সময় হওয়ার আগে নামায আদায় করা।
৫৬। রাষ্ট্রের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।
৫৭। স্ত্রীর কোন অঙ্গের সাথে মায়ের কোন অঙ্গকে তুলনা করা।
৫৮। মায়ের নামে কসম খাওয়া।
৫৯। কারো দিকে বন্দুক তাক করা।
৬০। কুকুরের মুখ লাগানো জিনিস খাওয়া অথবা পান করা।
৬১। কাউকে বিদ্রূপ করা।
৬২। পুরুষের জন্য রেশমী (পাতলা) কাপড় পরিধান করা।
৬৩। কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বাড়াবাড়ি করা।
৬৪। আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা।
৬৫। জ্ঞান অর্জন না করা।
৬৬। মূর্খতা অথবা অজ্ঞতা এক প্রকার খারাপ বস্তু তা বুঝতে না চাওয়া।
৬৭। ছোট কোন অপরাধ নিয়মিত করা।
৬৮। কোন কারণ ছাড়া উচ্চস্বরে হাসা অথবা চিল্লাচিল্লি করা।
৬৯। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ শারীরিক অপবিত্র থাকার কারণে নামায ক্বাযা করা।
৭০। স্ত্রীর মাসিক থাকা অবস্থায় তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া।
৭১। গান বাজনা করা।

মির্জা মাজহার জানে জানান (রাঃ) ভারতের ইসলামী স্কলারদের অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি তার কিতাব **কালিমাতে তায়্যিবাত** নামক কিতাবে উল্লেখ করেন- গান বাজনা করা বা শুনা কিংবা গানের তালে তালে ড্যান্স করা হারাম এই

বিষয়ে সকল ইসলামী স্কলাররা একমত হয়েছেন। এখানে আরও বলা হয়েছে যে বাঁশি বাজান যাবে তবে মাকরুহ হিসেবে গণ্য হবে। আর বিবাহের অনুষ্ঠানে ঢোল বাজান মুবাহ। তাতে কোন সমস্যা হবে না। উচ্চস্বরে কুরআন ও আযান পড়া বা তিলাওয়াত করা যাবে কিন্তু অর্থ পরিবর্তন হবে এমনভাবে তিলাওয়াত বা পড়া হারাম। **আল ফিকহ আলাল মাযহাবিল আরবা** উল্লেখ আছে আ**যান**কে উচ্চ স্বরে দেয়া হারাম। অনুরূপ ভাবে ঐ অবস্থায় তা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন বা আ**যান**কে **তাগান্নী** বা **শিমা** করে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাগান্নী বা শিমা বলতে এমন যন্ত্র ব্যবহার করা যার মাধ্যমে উচ্চারণকৃত শব্দটি শুনতে খুব শ্রুতি মধুরভাবে শুনা যায়। কুরআনে কারীম তিলাওয়াত কিংবা আযান দেয়ার সাথে সম্পর্কিত দুই প্রকারের তাগান্নী রয়েছে।

১। এমন তাগান্নী যা করা সুন্নত, যার মাধ্যমে সাওয়াব পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে এটি এমনভাবে করা হয় যার নাম হল তাজবীদ। যার মাধ্যমে কুরআন কারীমকে সহিহ ও সুন্দর করে তিলাওয়াত অর্জন করা যায়। আর এই প্রকারের তাগান্নী দেহ ও আত্মাকে প্রাণবন্ত করে।

২। দ্বিতীয় প্রকার তাগান্নী যা করা হারাম। এটি মুলত উচ্চ স্বরে ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এই প্রকারের তাগান্নী মাধ্যমে উচ্চারণের পরিবর্তন হয় যার ফলে অর্থের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয় যা কবিরা গুনাহ। আর নাফসে আম্মারা এ ধরণের স্বর শুনে আনন্দ উপভোগ করে। তারা মুলত মানুষদেরকে নিজেদের স্বার্থের জন্য এ যাবতীয় যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মন জয় করতে চায়। যা মুলত শ্রোতাদেরকে মুল অর্থ কিংবা উদ্দেশ্য থেকে গাফিল বা বিরত রাখে আর এভাবে করতে থাকলে তারা অজ্ঞতা কিংবা মূর্খতা থেকে কখনো বের হয়ে আসতে পারবেনা।

মুহাম্মদ বিন আহমদ জাহিদ (রাঃ) (মৃত্যু ৬৩২, ভারত) কতৃক সংকলিত **তারগীবুস সালাত** নামক কিতাবের ১৬২ পৃষ্ঠা, মুহাম্মদ বিন মুস্তাফা হাদেমী (রাঃ) (মৃত্যু ১১৭৬, হাদেম, কনিয়া, তুরস্ক) কর্তৃক সংকলিত **বারিকা** নামক কিতাবের ১৩৪২ পৃষ্ঠা ও আব্দুল গনী বিন ইসমাইল নাবলুসী (মৃত্যু ১১৪৩, দামেস্ক) কর্তৃক সংকলিত **হাদিকা** নামক কিতাবের ১৯৮ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে, নিজেকে আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে জন্তুকে সজ্জিত করে ঘণ্টা ধ্বনি নিয়ে ভ্রমণ করা উচিৎ হবে না।

এরূপ করা মাকরুহ। ঘণ্টা ধ্বনি শয়তানের এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। এরূপ যেখানে করা হবে সেখানে ফেরেশতা অবতরণ করে না। যা হোক, কিছু কিছু ব্যবসার ক্ষেত্রে এরুপ করা যেতে পারে।

ইসলামী ফিকহবিদদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের সাথে বেমানান কোন কবিতা পড়া বা পাঠ করা যাবে না অর্থাৎ হারাম। আরও বলা হয়েছে যে, যেখানে গান বাজনা হয়, মিউজিক্যাল বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান পরিবেশন করে কিংবা নারী -পুরুষ একসাথে একত্রিত হয়ে ড্যান্স করে অথবা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য এমন কোন কবিতা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে পরিবেশন করা হয় ঐ সকল স্থানে যাওয়া হারাম বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ যাতীয় কর্মকাণ্ডগুলো রেডিও, টেলিভিশন কিংবা মোবাইলের মাধ্যমে দেখা বা শুনাকেও হারাম বলা হয়েছে। ছেলে- মেয়েদের একসাথে কবিতা আবৃতি করাকে হারাম বলা হয়েছে। তবে উল্লেখিত স্থান বা শর্ত ব্যতীত কবিতা আবৃতি করলে কোন প্রকার সমস্যা হবে না। এর মাধ্যমে হতে পারে অনেক শ্রোতা আল্লাহর খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম হতে পারে। অনেক আলেম শেমার মাধ্যমে কবিতা আবৃতি করাকে অপছন্দ করেন। তাদের মতে এরূপ করার মাধ্যমে গান বা কবিতা তার নিজস্ব প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। ফিসক জাতীয় স্থানে কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ শরীফ পাঠ ও মিলাদ পাঠ করাকে হারাম বলা হয়েছে। যদিও তা সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে। ফিসক হল এমন স্থান যেখানে গুনাহ সংগঠিত হবেই হবে। আর যদি তা আনন্দ দানের জন্য করা হয় তা হলে কুফর হিসেবে সাব্যস্ত হবে। **দুররুল মারুফ** নামক কিতাবে বলা হয়েছে, মিউজিক্যাল যন্ত্র দিয়ে পুরুষ কিংবা নারীর গান পরিবেশন করাকে হারাম বলা হয়েছে। শেমার মাধ্যমে করাকে মুবাহ বলা হয়েছে। যদিও তা স্বরকে পরিবর্তন করে।

৭২। আত্নহত্যা করা অর্থাৎ নিজে নিজেকে হত্যা করা। আর যে ব্যক্তি এই কাজটি করবে শাস্তি হিসেবে সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে চেষ্টা করার পর মৃত্যু না হয় তাহলে তাওবা করলে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[তবে নামাযের ক্ষেত্রে তা ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে। আর যদি তা সংখ্যার বাহিরে হয় তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত নামায ক্বাযা আদায় করবে। তার নিয়্যত যদি এরূপ থাকে তা হলে তার সকল ক্বাযা ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন কোন অবিশ্বাসী বা নাস্তিক ব্যক্তি যদি আস্তিক কিংবা বিশ্বাসী হয়ে যায় তা হলে সে

নাস্তিক থাকা কালীন সময়ে অবিশ্বাসের কারণে যত প্রকার গুনাহ সম্পাদন করেছে তার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তার গুনাহ এ জন্যে ক্ষমা করা হয়েছে সে তার নিয়্যত পরিবর্তন করে বিশ্বাসী হয়ে পূর্বের অবস্থান থেকে দূরে সরে এসেছে। যা মুলত নতুন ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে।]

নারীর হিজাব সম্পর্কিত অধ্যায়

আশয়াতুল লোমআত নামক গ্রন্থের নিকাহ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত আলোচনাগুলো নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই বইয়েও বিবাহ সম্পর্কে পৃথক একটি অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে নারীর আওরাত বা হিজাব সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কোন একজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি আনসারদের মধ্য থেকে ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে চাই। রাসুল বললেন, **"তুমি ঐ নারীকে দেখে নাও কিংবা সাক্ষাৎ কর, কেননা আনসার গোত্র সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়"**। অথবা দেখার মাধ্যমে যাতে করে কোন প্রকার সন্দেহ প্রবণতা বিরাজ না করে- **সহিহ বুখারি**। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীকে বিবাহের পূর্বে দেখে নেয়া সুন্নাত।

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, **"স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে অন্য কোন নারীর রূপের মহত্ত, গুণাবলী ইত্যাদি বলা উচিৎ নয়। ঐ সকল নারীর ক্ষেত্রে যাদেরকে তারা দেখতে পাচ্ছে। তবে বলতে পারবে যদি স্বামী ঐ সকল নারীকে চিনে কিংবা জানে এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না"**। **বুখারি ও মুসলিম**।

৩। হযরত আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল ইরশাদ করেন যে, **"একজন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের গোপনাঙ্গ বা আওরাত অংশ কিংবা একজন নারী অন্য কোন নারীর আওরাত বা গোপনাঙ্গের প্রতি নজর দিতে পারবে না। এমনিভাবে একজন পুরুষ অন্য একজন নারীর গোপনাঙ্গের দিকে তাকাবে না অনুরূপভাবে তা নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে"**। এটা সম্পূর্ণরুপে হারাম করা হয়েছে। পুরুষ অন্য কোন পুরুষের বা নারী অন্য কোন নারীর শরীরের কোন গোপনাঙ্গের দিকে তাকাতে পারবে না। একজন পুরুষের নাভি থেকে টাকনু পর্যন্ত হল আওরাত কিংবা গোপন রাখার অঙ্গ। যা তাকে সব সময় আবৃত করে রাখতে

হবে। আর নারীর ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য হবে। নারীর আওরাত হল হাত কিংবা মুখ ব্যতীত পুরো শরীর আবৃত করে রাখা। এখানে আওরাত বলতে নারীকে বুঝানো হয়েছে। তাই সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম হোক। নন মুহরিম এমন নারীর চেহারার দিকে কুনজরে তাকানোকে হারাম করা হয়েছে। এমন কি তার আওরাত অঙ্গের দিকে কুদৃষ্টি ব্যতীত তাকানোকে হারাম করা হয়েছে।

৪। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ইরশাদ করেন, **"কোন বেগানা নারীর বাড়িতে রাত যাপন করিও না"**।

৫। হযরত আকাবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল ইরশাদ করেন যে, **"বেগানা নারীর সাথে কোন গোপন কিংবা পৃথক রুমে অবস্থান কর না। যদি কোন নারী পৃথক কোন রুমে তার স্বামীর ভাই কিংবা অন্য কোন বেগানা পুরুষের সাথে অবস্থান করল সে যেন মৃত্যুর মত কোন কাজ সংগঠিত করল"-** বুখারি ও মুসলিম ।

৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল বলেন, **"নারীর শরীর হচ্ছে আওরাত কিংবা গোপন রাখার বস্তু"**। একে অবশ্যই আবৃত করে রাখতে হবে। **"যখন সে বাহিরে যায় শয়তান তাকে সব সময় অবলোকন করতে থাকে"**। অর্থাৎ শয়তান তাকে মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে করে মানুষ পাপ কাজ করতে বাধ্য হয়।

৭। হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসুল হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন**, "হে আলী, যখন তুমি কোন বেগানা নারীকে দেখে ফেলবে তখন তোমার চক্ষুকে ফিরিয়ে ফেলবে। দ্বিতীয় বার তার দিকে তাকাবে না। যদি তাকাও তাহলে গুনাহগার হবে। কিন্তু প্রথম বার তোমার ভুলবশত হয়েছে তার জন্য তুমি দায়ী নও। কিন্তু দ্বিতীয়বার সাবধান হয়ে যাও"**। আবু দাউদ ও দারিমি।

৮। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ইরশাদ করেন, হে আলী, "**তুমি তোমার পাঁজর কিংবা রানকে মানুষের সামনে প্রকাশ করি ও না। এমন কি কোন জীবিত কিংবা মৃত্য ব্যক্তির পাঁজরের দিকে নজর দিবে না**"। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। মৃত্য ব্যক্তির গোপন কোন অঙ্গের দিকে তাকানো হচ্ছে জীবিত কোন ব্যক্তির গোপন অঙ্গের দিকে তাকানো। তা সমান অপরাধ। তাই আমাদের উচিৎ খেলোয়াড় কিংবা সাঁতারু ব্যক্তিদের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকান।

৯। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ইরশাদ করেন, **"তুমি তোমার গোপন অঙ্গ প্রকাশ করিও না। একাকী অবস্থায় হলেও। এটা এ জন্যে যে, এমন অনেক ফেরেশতা আছে যারা সবসময় তোমার সাথে অবস্থান করে অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করে না। তাই তাদের প্রতি সম্মান কিংবা উপস্থিতি থাকার কারণে লজ্জা প্রদর্শন করা উচিৎ"**। এরা হল এমন ফেরেশতা যাদেরকে হাফাদা বলা হয়। যারা তোমাকে জিন থেকে রক্ষা করে। শুধুমাত্র বাথরুমে যাওয়া কিংবা শারীরিক মিলনের সময় তারা তোমাদেরকে ত্যাগ করে।

১০। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, মায়মুনা (রাঃ) ও আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সাথে ছিলাম। যখন ইবনে উম্মে মাখতুম (রাঃ) রাসুল এর কাছে অনুমতি চাইলেন ভিতরে প্রবেশ করার জন্য। রাসুল তাকে অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে বললেন, **"তোমরা পর্দার ভিতরে অবস্থান কর'**। তখন আমি বললাম সে কি অন্ধ নয়? সে আমাদেরকে দেখতে পারবে না। জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "**তুমি কি অন্ধ নাকি? তুমি কি তাকে দেখতে পাবে না? যার অর্থ হল, তার অন্ধত্ব তোমাকে অন্ধ করে রাখবে না**" অর্থাৎ তুমি কিন্তু ঠিকই তাকে দেখাতে পাবে। (তিরমিজি, আহমদ ও আবু দাউদ)। এই হাদিসের আলোকে একজন পুরুষ অন্য কোন বেগানা (নন মুহরিম) নারীর দিকে তাকান কিংবা কোন নারীর কোন নন মুহরিম পুরুষের দিকে তাকান হারাম। ইমাম আবু হানিফা অন্য একটি হাদিস গ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদেরকে নন মুহরিম পুরুষদের দিকে তাকানোকে হালাল হিসেবে বলেছেন। অর্থাৎ মহিলাদের ক্ষেত্রে একজন পর পুরুষের মাথা কিংবা চুলের দিকে না তাকানো অনেক কঠিন একটা বিষয়। যাকে শরীয়তের দিক থেকে এই কঠিন কাজকে **আজমত** বলা হয়েছে। একজন পুরুষের পর নারীর জন্য আওরাত অংশ হল তার নাভি থেকে টাকনু পর্যন্ত। এসব অঙ্গের দিকে না তাকান একজন নারীর জন্য অনেক সহজ কাজ শরীয়ত এই সহজ কাজ করাকে **রুখসত** বলা হয়েছে।

লিখক বলেন যে, হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ মুসলিম জাহানের মাতা হিসেবে বলা হয়েছে ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আনহুম সব সময় রুখসত পরিহার করে আজমত পালন করতেন। রাসুল এর কাছে ঐ মহিলার আরজুর বিষয়টি তখন ছিল যখন পর্দার বিধান নাজিল হয় নাই। আজকের দিনে এমন সব বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে যার মাধ্যমে নারী তাকে আবৃত করার পরও সব

দেখা যায়। যা ঐ সময় কালে ছিল না। হযরত মা আয়েশা (রাঃ) এমনভাবে নিজেকে আবৃত করতেন কেউ তাকে চিনতে পারত না। বর্তমান সময়ে নারী নিজেকে আবৃত করার অর্থ হচ্ছে সে ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। তাই ইসলাম বিপরীত শক্তি ইসলাম ও মুসলিম সমাজ ধ্বংস করার জন্য আমাদের নারীদের মাঝে নানা ধরণের কুধারণা প্রচার করতেছে। তার মানে পর্দা করা হচ্ছে গোঁড়ামি ধর্মান্ধ তার পথ বেঁচে নেওয়া। তবে এটা ঠিক ইসলামের প্রাথমিক যুগে পর্দার বিধান ছিল না। হিজরির তৃতীয় কিংবা পঞ্চম বছরে মহিলাদেরকে নিজেদের শরীর আবৃত করার হুকুম আসে। এই বিষয়ে টার্কিশ কিতাব **তেরিদ-ই সারিহ তেরজুমেসি** নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১১। বেহেজ ইবনে হাকিম, তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তিনি তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ইরশাদ করেন, **"তুমি তোমার গোপন অঙ্গ আবৃত কর। তোমার স্ত্রী কিংবা জারিয়া ব্যতীত কাউকে তা দেখতে দিওনা। এবং আল্লাহ্ তায়ালার উপস্থিতিতে নিজের প্রতি লজ্জা প্রদর্শন কর"**। (তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

১২। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ইরশাদ করেন, **"যদি কোন নন মুহরিম নারী অন্য কোন নন মুহরিম পুরুষের সাথে পৃথক কোন রুমে অবস্থান করে তাহলে শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়"**। অর্থাৎ তাদের মাঝে খারাপ কাজ সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (তিরমিজি)। এটি হারাম কোন প্রাইভেট রুমে নন মুহরিম নারীর সাথে নন মুহরিম ব্যক্তির নির্জন বাস করা। ইবনে আবেদিনের মতে, যদি ঐ রুমে পুরুষ ব্যক্তিটির কোন মুহরিম আকরাবা অবস্থান করে তাহলে তা হারাম হিসেবে গন্য হবে না। অর্থাৎ হালওয়াত বা নির্জন বাস হবে না।

১৩। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসুল ইরশাদ করেন যে, **"যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তাকে বেশী বেশী পরিদর্শন কর না। এরূপ করলে শয়তান তোমার শিরার মাঝে রক্ত সঞ্চালন করবে খারাপ কাজ করার জন্য"**। সে বলতে থাকবে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।**"আল্লাহ্ তায়ালা বলেন শয়তান তার মনেও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি রফায় তারা করতে থাকবে। যথক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাকে শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য না করবেন।কেননা আল্লাহ্ তাকে মুসলমান বানিয়েছেন। আর এ কারণে সে আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করবে"**। **তিরমিজি শরীফ**।

১৪। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল আমার সাথে একসাথে ছিলেন। আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উভাইয়ার গোলাম ও আমাদের সাথে একই রুমে ছিলেন। দাসটি ছিল মুখান্নাত (মেয়েলী স্বভাবের)। রাসুল তাকে দেখতে পেলেন এবং বললেন, তোমার বাড়িতে ওর মত অন্য কোন মানুষকে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। সে কিন্তু রাসুলের কথা শুনতে ছিল। (বুখারি ও মুসলিম শরীফ)। মুখান্নাত বলে এমন পুরুষকে যার কথা বার্তা, আচার আচরণ ইত্যাদি পুরুষের মত হয়ে থাকে। এমন পুরুষ যারা এরূপ করবে তাদেরকে অভিশপ্ত করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে যে, **"আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সকল পুরুষের নিন্দা করেছেন যে কিনা নারীর জীবনের মত জীবন যাপন করে এবং ঐ সকল নারীর নিন্দা করেছেন যারা পুরুষের মত নিজেদের জীবন পরিচালনা করে"**। অর্থাৎ কোন প্রকার ওজর ব্যতীত কোন নারী যদি পুরুষের মত কাপড় পরিধান করে, তাদের চুলের মত চুল রাখে এবং পুরুষ যেভাবে চলা ফিরা করে ওভাবে জীবন পরিচালনা করে, অন্য দিকে কোন পুরুষ যদি নারীর মত চুল লম্বা রাখে, নারীর মত আচরণ করে বা নারীর জীবন সদৃশ জীবন পরিচালনা করে তা হলে উক্ত হাদিসের আলোকে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি নিন্দা করেছেন।

১৫। হিজরির দ্বিতীয় সনে মিসয়ার ইবনে মাহরামা (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ কন্যার সুযোগ্য সন্তান। তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা আমি একটি পাথর বহন করতে ছিলাম। তখন আমার কাপড় খুলে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে পুনরায় পরিধান করতে ব্যর্থ হলাম। ঐ অবস্থায় রাসুল আমাকে দেখতে পেলেন এবং বললেন, **"তুমি তোমার কাপড় পরিধান কর। শরীরকে আবৃত করা ব্যতীত বাহিরে যেও না"**। (সহিহ মুসলিম)। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে নারী কিংবা পুরুষ যে হোক না কেন শরীর আবৃত করা ব্যতীত কোনভাবে রাস্তা, বীচ ও খেলার মাঠে যেতে পারবে না।

১৬। হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল ইরশাদ করেন, **"কোন ব্যক্তি যদি কোন বেগানা নারীকে দেখার সাথে সাথে তার চক্ষুকে ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এমন সাওয়াব দান করবেন যেন সে এই মাত্র কোন ইবাদত সম্পাদন করল। এবং সে এর স্বাদ অতি শিগ্রই তা আস্বাদন করবে"**। (আহমদ)।

১৭। হাসান বসরি (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **"যে ব্যক্তি নিজের আওরাত কিংবা গোপন অঙ্গ প্রদর্শন করে বা**

অন্য কারো গোপনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন"। উপরোক্ত হাদিসটি মুরসাল হাদিস। (ইমাম বায়হাকি)

১৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **"যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অনুসরণ করল তাহলে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল"**। (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ)। যার অর্থ হল কোন ব্যক্তি ইসলাম বিপরীত কোন ধর্মের মত করে জীবন যাপন পরিচালনা করে তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কিয়ামতে তাদের সাথে তার হিসাব নিকাস করা হবে। তাই আমাদের উচিৎ মুসলমান নয় এমন কারো সাথে সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা। যারা কিনা ইসলামের কোন হারাম বিষয়কে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

১৯। হযরত আমর শুয়াইব (রাঃ) তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ইরশাদ করেন যে, **"আল্লাহ্ তায়ালা এমন হাদিয়াকে দেখতে পছন্দ করেন যা কিনা সে তার বান্দাকে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেছেন "**। (তিরমিজি শরীফ) অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা কোন ব্যক্তির জামা কাপড় পরিষ্কার হওয়াকে পছন্দ করেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন যে অন্য কোন ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে কাপড় দেন কিংবা পরিধান করান। আবার তিনি ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে অপছন্দ করেন যারা কিনা নিজের সুনামের জন্য কাউকে কোন কিছু উপহার দেন। আল্লাহ্ তায়ালার দান করা কোন বস্তু নিজের সুনামের জন্য কাউকে হাদিয়া হেসেবে দান করা বৈধ নয়। জ্ঞান ও আল্লাহ্ তায়ালার দানকৃত এক প্রকারের বস্তু।

২০। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল আমাদের নিকট আসলেন। আমাদের মধ্য থেকে অপরিচ্ছন্ন চুলের অধিকারী একজনকে দেখতে পেয়ে বললেন, **"সেকি এমন কোন বস্তু খুঁজে পায়না যার মাধ্যমে তার চুল পরিষ্কার করতে পারবে"**। আবার তিনি যখন ময়লা কাপড়ের অধিকারী একজনকে দেখতে পেলেন এবং বললেন, **"তার কাছে কি ঐ কাপড়গুলো পরিষ্কার করার মত কোন বস্তু নাই নাকি"?**

২১। বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আবু ওয়াহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রাসুল এর কাছে গিয়েছিলাম। আমার কাপড় ছিল পুরাতন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, **"তোমার কাছে কি কোন সম্পত্তি নাই"**? আমি বললাম, আমার সম্পত্তি ছিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, **"তোমার কাছে কোন ধরনের সম্পদ বিদ্যমান আছে"?** আমার কাছে সব ধরণের সম্পদ

আছে জবাবে আমি বললাম। অতঃপর রাসুল বললেন, যেহেতু **"আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে সম্পদ দান করেছেন সেহেতু তার নিদর্শন তোমার কাছে বিদ্যমান থাকা উচিৎ"**। (ইমাম আহমদ ও নাসায়ি)।

২২। **ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান** নামক কিতাবে ইউসুফ আল কারজাবি উল্লেখ করেন, **"ইসলাম কোন নারীকে এমন সব কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন যা পরিধান করলে তার ভিতরে কি আছে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। হাদিসে এসেছে, যে নারী কাপড় পরিধান করল কিন্তু সব দেখা যাচ্ছে এবং ঐ নারী যার মাথার সামনের অংশ দেখতে উটের সিনার মত দেখা যাচ্ছে, এ সকল নারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের ঘ্রান পর্যন্ত নিতে পারবে না। অন্য জায়গায় বলা আছে যে জান্নাতের ঘ্রাণ খুব কাছ থেকে পাওয়া যায়"**। (**মুসলিম ও মুয়াত্তা**)। উক্ত হাদিসের আলোকে একজন নারীকে পাতলা, আলকভেদ্য কিংবা টাইট কাপড় পরিধান করেত নিষেধ করা হয়েছে। এবং তাদের মাথাসহ চুলকে ভাল করে কাপড় দিয়ে আবৃত করতে বলা হয়েছে। এই ধরণের কাপড় পরিধানের চেয়ে পরিধান করা ভাল। যার দ্বারা গুনাহ অর্জিত হয়। মুসলিম নারী কিংবা মেয়েদেরকে সকল ধরণের পাতলা ও টাইট কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে ও মাথার চুলসহ মাথাকে এমনভাবে আবৃত করতে হবে যাতে করে উটের সিনার মতনে দেখা যায়। তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে, এধরণের গুনাহের কাজ একজন মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার জন্য একাই যথেষ্ট। কারজাবি হলেন কোন মাযহাবকে অনুসরণ করে না এমন এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম নারীদেরকে ভাল করে তাদের শরীর আবৃত করার আদেশ (ফরয) করেছে। এবং আবৃত করার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটি ভাল করে বর্ণনা করেন নি যে কোন প্রকারের বস্ত্র দিয়ে, কোন ধরণের পোশাক, স্কার্ফ বা কোট ব্যবহার করতে হবে অথবা পরিধান করতে হবে। ফিকহের কিতাবে লিখা আছে যে, মহিলাদের জন্য ফরয হচ্ছে তাদের নিজেদেরকে ভাল করে আবৃত করা, ও যে সমস্ত কাপড় কিংবা পোশাক পরিধান বাব্যবহার করলে **সুন্নতে জেওয়াইদের** আলোকে হবে সেভাবে পরিধান করতে হবে। যাহা ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত না বা ইবাদত করতে করতে কোন সমস্যা হবে না অর্থাৎ যা সুন্নতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটা এ জন্য যে, ঐ কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত করতে হবে যা ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে খাপ খায়। তবে ঐ এলাকার কালচার কিংবা পোশাক ইসলাম বিরোধী হলে তা পরিধান

করা মাকরুহ ও ইবাদত করতে বাধা প্রদান করতে পারে। এটাকে হারাম করা হয়েছে যদি তার দ্বারা ফিতনা ছড়ার আশঙ্কা থাকে। **ফতওয়ায়ে হিনদিয়ার** মতে, সাবলীল বা ভাল মানের পোশাক পরিহিত নারীর দিকে তাকালে কোন সমস্যা হবে না বরং তা বৈধ। অন্যদিকে টাইট কিংবা পাতলা পোশাক পরিহিত কোন নারীর দিকে তাকান জায়েজ নয়। বরং তা হারাম। খারাপ নিয়তে সাবলীল পোশাক পরিধানকারী কোন নারীরদিকে তাকান হারাম। এমন কি কুনজর ব্যতীত ও কোন কারণ ছাড়া তার দিকে তাকান মাকরুহ বলা হয়েছে। একই হুকুম অমুসলিম নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে কোন কোন স্কলারের মতে শুধুমাত্র তাদের চুলের দিকে তাকালে কোন সমস্যা হবে না। **হালাবি ই কাবির** নামক গ্রন্থে সাবলীল, গাড় কিংবা কালো রঙের কোট পরিধান করা যা হাতের গোড়ালি থেকে শুরু করে বাহু ও হাতের কব্জি পর্যন্ত প্রসারিত হয় এমন কাপড় সারশাফ নামক কাপড় থেকে অনেক ভাল যাকে দুইটি ভাবে তৈরি করা হয়। ওলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে একজন স্বাধীন নারীর চুলের যে অংশ তার কান পর্যন্ত ঝুলে থাকে তা তার আওরাতের অন্তর্ভুক্ত। কিছু কিছু ওলামাদের মতে নামাযের সময় ঝুলন্ত চুলের ঐ অংশ টুকু আওরাতের অংশ হিসেবে গণ্য হবেনা । যাই হোক কোন পুরুষের ক্ষেত্রে নন মুহরিম নারীর ঐ ঝুলন্ত অংশের দিকে তাকান বৈধ নয়। সে অবশ্যই তার চুলকে সম্পূর্ণ রূপে পাগড়ী দিয়ে ভাল করে ঢেকে রাখবে। পাগড়ী কিংবা আবৃত করার কাপড়ের মধ্য ভাগের সামনের অংশ দিয়ে সম্পূর্ণ মাথাকে অবশ্যই ঢাকার পর তাকে ভ্রু পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। এমনভাবে প্রসারিত করতে হবে যা তার ভ্রু পর্যন্ত পোঁছাতে হবে। নিচের দিকে তার থুতনি পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। এবং নিচের ঝুলন্ত অংশকে তার বক্ষ ও থুতনির মাঝামাঝি স্থানে রেখে পিন দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। আর ঐ কাপড়ের পেছন ভাগের মধ্যাংশ দিয়ে তার শরীরের পিছনের ভাগ আবৃত করে দিতে হবে। আর যদি এভাবে না করা হয় তাহলে ফিতনা হওয়ার আশংকা থাকবে। তাকে অবশ্যই ঢালু ও কালো রঙের মুজা পরিধান করতে হবে। যদি নারীর ঝুলন্ত চুলের চার ভাগের এক অংশ আবৃত অবস্থায় না থাকে তাহলে তার আদায়কৃত নামায সহিহ হবে না। এবং ঝুলন্ত চুলের ক্ষুদ্র একটা অংশও যদি খোলা অবস্থায় থাকে তাহলেও মাকরুহ হবে। নারীর বয়সের ক্ষেত্রে যুবতী নারী কিংবা বয়স্ক নারীর ইসলামী বইগুলোর মধ্যে কোন বৈষম্য পার্থক্য দেখা যায় নাই। কোন কোন ইসলামী স্কলারের মতে বয়স্ক নারীর সাথে হ্যান্ড স্যাক করা বা তাকে অভ্যর্থনা জানানো যাবে (হ্যান্ড শেক এই

বিষয়ে বিস্তারিত **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ৬২ তম অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে)। তার সাথে খালয়াত (নির্জন রুমে অবস্থান) করা যাবে। তবে সকল আলেমার মতে বয়স্ক মুসলিম নারী সে তার চুল প্রদর্শন করতে পাবে না এমন কি তার চুলের দিকে নন মুহরিম ব্যক্তিরা তাকাতে পারবে না। কিছু আলেমের মতে নন মুসলিমদের চুলের দিকে তাকানো যাবে। কিন্তু তাদের কেউ একথা বলে নি যে বয়স্ক মুসলিম নারীর চুলের দিকে তাকানো যাবে। যে সকল স্কলাররা নারীদের মসজিদে প্রবেশ বা কবর স্থান পরিদর্শন করতে পারবে বলে তাদেরকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে তাদের চুল আবৃত করার শর্তকে সামনে রেখে তা সম্পন্ন করতে হবে।

সুরা আহজাবের ঊনষাট নং আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলিম নারীরা নিজেদেরকে অবশ্যই **জিলবা** দ্বারা আবৃত করবে। এই কথা বলা মোটেও ঠিক হবে না যে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলিম নারীদেরকে ছারশাফ পরিধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আয়াতে ছারশাফ পরিধান করার নির্দেশ দিত তাহলে রাসুল এর সম্মানিত স্ত্রীগণ ও সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীগণ ছারশাফ পরিধান করতেন। কিন্তু ইসলামের কোন বইয়ে তাদের ছারশাফ পরিধান করার কোন প্রমান আমরা পাই নাই। টার্কিশ তাফসীর গ্রন্থ **তিবইয়ানে** বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মহিলাদেরেক তাদের মাথা আবৃত করতে বলেছেন। **তাফসীরে জালালাইনে** বলা হয়েছে, জিলবাবের মাধ্যমে নারী তার মাথা আবৃত করার পাশাপাশি চেহারাকেও ঢেকে রাখবে। সাওয়ির মতে, জিলবাব বলতে পাগড়ী বা ঐ জাতীয় কোন কাপড় যা দ্বারা কোন কিছুকে ভালভাবে আচ্ছাদান করা যায়। তাফসিরে **রুহুল বয়ান** ও **আবুস সুদের** মতে, জিলবাব হল এমন এক কাপড় বা পাগড়ী যা সম্পূর্ণ মাথার চারপাশ এমনভাবে জড়িয়ে রাখে যাতে করে চুলকে যাবতীয় অপরিষ্কার থেকে রক্ষা করতে পারে। জিলবাব গাজ থেকে অনেক প্রশস্থ। এটি এমনভাবে প্রসারিত করা হয় যা তার শরীরের বক্ষ ও পিছনের অংশকে পুরোপুরি আবৃত করে রাখে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা নারীদেরকে তাদের মাথা ও সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। **জেওহার** এবং **আল ফিকাহ আলাল মাযহাবিল আরবা** নামক গ্রন্থ দ্বয়ে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, জিলবাব পুরুষের কাপড় হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জিলবাব হচ্ছে পুরুষদের জন্য তৈরি লম্বা এক ধরনের কাপড় যার অপর নাম কামিস। নারীদের জন্য বাড়ির বাহিরের পোশাক হচ্ছে লম্বা জামা, পাগড়ী বা ছারশাফ জাতীয় কোন

কাপড় যার দুইটা অংশ থাকে। যেগুলোর মাধ্যমে নারীকে তার মাথা কিংবা শরীর আবৃত করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সমান এই সব কাপড় দিয়ে করা যাবে। যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপরে আলোক পাত করা হয়েছে। নারীকে তার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্য থেকে ইসলামের আলোকে পোশাক পরিধান করলে কোন প্রকার ফিতনার আশংকা থাকবে না। **সহীহ্ বুখারির** ষষ্ট তম অধ্যায়ের ছাব্বিশ তম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, কুরআনে কারিমের যে অংশটা নারীর আওরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে তা ঐ দিন নাযিল করা হয়েছে যখন জয়নাব (রাঃ) বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। ঐ বিবাহ হিজরির তৃতীয় বর্ষে সম্পাদন হয়ে ছিল। যে ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার দাবি করে তাহলে তাকে অবশ্যই ইসলামের বিধান অনুযায়ী করে তবে যা সে করতে চায়। অর্থাৎ জেনে শুনে ইসলাম পালন করতে হবে। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা যাবে না। আর সে যদি না জানে, তাহলে তাকে কোন ইসলামী স্কলারকে জিজ্ঞেস করতে হবে অথবা ইসলামের সঠিক বই পড়ে তা জানতে হবে। কোন কাজ করার সময় সে যদি না জানে এটি ইসলামে বৈধ কিনা তাহলে সে পাপ কাজ থেকে পবিত্র হতে পারবে না। প্রতিদিন তাওবা করা উচিত। তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা সকল ধরনের পাপ কাজের গুনাহ মাফ করে দেন। আর যদি তাওবা না করা হয় তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়ই স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন নির্যাতনের প্রকার কিংবা ধরন সম্পর্কে এই বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের নামায আদায় করার সময় তাদের শরীরকে অবশ্যই আবৃত করে রাখতে হবে। **"আওরাত অংশ বলতে শরীরের এমন সব স্থানগুলোকে বুঝায় যাহা প্রদর্শন করা কিংবা কারো ঐ সকল অঙ্গের দিকে তাকান সম্পূর্ণ রূপে হারাম করা হয়েছে"**। পুরুষ নামায আদায়ের সময় তার পায়ের তালুতে মুজা পরিধান করে আদায় করাকে সুন্নত বলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি বলে ইসলামে আওরাত পার্ট বলতে কোন কিছু নাই তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে আওরাত অংশগুলোকে আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছে । যে সব স্থানে নারী পুরুষ এক সাথে উলঙ্গ হয়ে নাচ গান করে, যেখানে উলঙ্গ নারীর গান শ্রবণ করা হয়, যেখানে এলকোহল কিংবা মদ পান করা হয় অথবা যেখানে নারী বা পুরুষের গোপন অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে ঐ সকল স্থানকে **ফিসকের স্থান** বলা হয়। এ সকল স্থানে যাওয়া একজন মুসলমানের জন্য হারাম। আমাদের অন্তরকে আরও বেশী করে পবিত্র করতে হবে। অন্তর

পবিত্র করার অর্থ হল আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ করা । ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমে তাকে বিশোধিত করতে হবে। যে ব্যক্তি ইসলামের যথার্থ অনুসরণ করে না সে তার অন্তরকে পবিত্র করতে পারবে না। যেমন কেউ বলল, শরীরের কোন অঙ্গ প্রদর্শন করা হালাল যা ইজমা কিংবা সকল মাযহাবের মতে শরীরের গোপন অঙ্গ বলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি পাপ কাজের জন্য শাস্তিকে ভয় না পায় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। নারীর ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সে কোথাও গান পরিবেশন করে কিংবা গোপন অঙ্গ প্রদর্শন করে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, পুরুষের হাঁটু থেকে রানের মধ্যবর্তী স্থান আওরাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইজমা ও সকল মাযহাবের ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে তার উচিৎ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ থেকে যেমন ঈমান, হালাল, হারাম ও ফরয জ্ঞান অর্জন করা। এক্ষেত্রে ঐ সকল বিষয় না জানার জন্য কোন অজুহাত প্রকাশ করা যাবে না। ইসলামের এসকল বিষয় জানার পাশাপাশি তা মেনে চলতে হবে। **"সকল মাযহাবের আলোকে একজন নারীর তার মাথা ও হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর আওরাত"**। যদি কোন নারী কিংবা পুরুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে তার কোন গোপন অঙ্গ প্রকাশ পায়, (যেখানে ইজমা নেই) আর তা যদি তার মাযহাবের আলোকে আওরাত না হয় তাহলেও সে তার মাযহাবের আলোকে গুনাহের কাজ সম্পাদন করল। যদিও সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে না। উদাহারণ স্বরূপ একজন পুরুষের রান থেকে হাঁটু পর্যন্ত আওরাত অংশ। যার সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে আলেমদের মাঝে। একজন মুসলিমের উচিৎ নাজানা কোন বিষয়কে জেনে নেওয়া। এমন একদিন আসবে যখন তারা জানতে পারবে এবং তাড়াতাড়ি করে তাওবা করে নিবে। এমন কি সকল বিষয়কে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পালন করতে থাকবে।

একজন মুমিনদের গুনাবলি

মুমিনের হকঃ একজন মুমিনের উপর আরেকজন মুমিনের সাতটি হক বা অধিকার রয়েছে।

১। মুমিনের আমন্ত্রণে (দাওয়াত) সাড়া দেওয়া।

২। অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া।

৩। মুমিন ব্যক্তির জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা।

৪ ।তাকে উপদেশ প্রদান করা।

৫। তাকে অভিবাদন জানানো। **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের ৬২অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

৬। তার দুঃখ কষ্টে অংশীদার হওয়া।

৭। যখন সে হাঁচি দেয় তখন তার আলহামদু লিল্লাহ্ এর জবাবে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলা।

নোটঃ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "মানুষ একে অপরকে ভালবাসবে আর এটাই হচ্ছে মানব জাতির প্রকৃতিগত বহিঃ প্রকাশ"। একজন মানুষের স্বভাবত নিয়ম হচ্ছে যে ব্যক্তি তাকে কোন কাজে সহযোগীতা করবে তার নফস বা অন্তর স্বভাবিকভাবে তাকে তার প্রতি দুর্বল হবে। আর এটা শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মানুষ যে তাকে সাহায্য করে সে তার প্রতি অনরুপভাবে দুর্বল বা তাকেও সাহায্য করার চেষ্টা করে। কথা আছে ভাল মানুষ ভাল মানুষকে পছন্দ করে, খারাপ মানুষ খারাপ মানুষকে পছন্দ করে। কিভাবে মানুষ একজন ভাল মানের মনের মানুষ খুঁজে পাবে যে কিনা তাকে অন্তরস্থল থেকে ভালবাসবে বা সাহায্য করবে। তাই আমাদের উচিৎ মানুষের সমালোচনার দিকে না তাকিয়ে শক্র- মিত্র, মুসলিম- অমুসলিমের মাঝে হাসিমুখে ও সুন্দর বাক্যলাপের মাধ্যমে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব বন্ধন তৈরি করা। আর এর জন্য প্রয়োজনে তাদের পরস্পরের মাঝে হাঁসিমুখে উওম বাক্যালাপ বিনিময়ের চেষ্টা চালান ও উপহার প্রদান করতে হবে। যখন একে অপরের মাঝে খারাপ বাক্য বিনিময় করে আমাদের উচিৎ হবে তা বন্ধ করে দেয়া। তখন দেখা যাবে এক পক্ষের আমাদের দিকে চলে আসবে ও আমাদেরকে শক্র ভাবাপন্ন মনে করবে। আমাদের উচিৎ হবে না তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বরং আমাদের কাজ হবে যারা বন্ধুত্বের মাঝে বাধা হয় অথবা শক্রতা বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলে তাদেরকে ওখানে থামিয়ে দিতে হবে। আমাদের কারো সহিত রাগ করা চলবে না। রাসুল আমাদেরকে রাগ করতে নিষেধ করেছেন। হাদিসের পরিভাষায় **"তোমরা রাগান্বিত হইয়ো না, অর্থাৎ রাগ করো না"**।

চারটি বিষয় গোপন করাঃ একজন ভাল মানুষ নিন্মোক্ত চারটি বিষয় গোপন করে চলে-

১। তার দারিদ্রতা।

২। তার সাদাকাত।

৩। তার দুঃখ কষ্ট।

৪। তার যাবতীয় সমস্যাবলী।

জান্নাতের ঢালঃ চার ধরনের মানুষের জন্য জান্নাত ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে–

১। এমন ব্যক্তি যে তার জিহ্বাকে যিকিরে রূপান্তরিত করেছে।

২। এমন ব্যক্তি যে নিজেকে হাফিযে কালামুল্লাহ বানিয়েছে।

৩। এমন ব্যক্তি যে মানুষদেরকে খাইয়েছে।

৪। এমন ব্যক্তি যে রমযান মাসের সকল রোযা রেখেছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির নিন্মোক্ত সাতটি বিষয় অর্জন করা আবশ্যক। আর তা হল-

১। কোন কিছু শুরু করার পূর্বে অবশ্যই **বিসমিল্লাহ্** বলা।

২। কোন ভাল খবর শুনার সাথে সাথে **আলহামদু লিল্লাহ্ বলা**।

৩। কোন কাজ করার ক্ষেত্রে **ইনশা আল্লাহ্** অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

৪। দু:সংবদ শুনে **ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না এলায়হি রাজেউন"** পড়তে হবে।

৫।কোন খারাপ কাজ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা বা ইস্তিগফার পড়তে হবে। তাওবা করার অর্থ হল কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া। দ্বিতীয়বার এই যাবতীয় গুনাহ সম্পাদন না করা ও আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গুনাহ করব না বলে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়া। ইস্তেগফার অর্থ হল আস্তাগফিরুল্লাহ বলা। অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে গুনাহ ক্ষমার জন্য পার্থনা করা।

৬। অধিকাংশ সময়**" কালেমা-তাইয়্যেবা** পড়া। **"লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর"** পাঠ করা ও কালিমায়ে শরীফ পড়া। **"আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসালুহু"।**

৭। রাতে ও দিনে এই দোয়াগুলো পড়া। ক)**আস্তাগফিরুল্লাহ,** খ) **সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর, ওয়া লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউয়ুল আজিম** দোয়া পড়তে হবে।

নৈতিক গুনাবলিসমূহ

৭২টির মত প্রশংসনীয় নৈতিক গুণাবলী রয়েছে যা একজন মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করে। আর সেগুলো হচ্ছে ঈমান, সুন্নতে বিশ্বাসী হওয়া, ইখলাস, ইহসান, বিনয়ীতা, যিকিরে মিন্নাত, উপদেশ, তাসফিয়া, গায়রাত, গিবত, শেখহা, ঈসার, মুরুওয়্যাত, ফুতুওয়্যাত, হিকমাত, শুকরিয়া, রেযা, সবর, খাওফ, রেযা বুগযি ফিল্লাহ, হুব্বু ফিল্লাহ, হামুল, ইস্তিওয়ায়ে দমওমদ, মুজাহাদা, চেষ্টা, কাসদ, আমল, যিকরে মাউত, তাফওয়িদ, তাসলিম, তালাবুল ইলম, সালাহাত, ইনযাওয়াদ, হুসনে খুলক, জুহুদ, কানাআত, রুশদ, সাইয়ে ফিল খায়রাত, রিক্কাত, সাওক, লজ্জা, তাবাতি ফিআমরিল্লাহ, উনসু বিল্লাহ, আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আশা পোষণ করা, ওয়াকার, দেখাওয়াত, ইসতিকামাত, আদাব, ফিরাসাত, তাওয়াক্কুল, সিদক, মুরাবাতা, মুরাকাবা, মুহাসাবা, মুয়াতাবা, কাদামে গাইদ, হুব্বেতুল হায়াতুল ইবাদাতি, তাওবা, খুশু, ইয়াকিন, উবুদিয়াত, মুকাফাত, রিয়ায়াতে হুকুকি ইবাদাত।

তাওয়াদু বলতে বিনয় বা নম্রতাকে বুঝানো হয়েছে। যিকিরে মান্নত বলতে দুনিয়াতে সকল বস্তু তার নিয়ন্ত্রণাধীন এমনকি তার দয়া বা অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ চলতে পারবে না। আর এই সকল কারণে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। নসিহত বলতে কোন মুমিন ভাইকে উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করা। তাসফিয়া বলতে কারো অন্তর থেকে খারাপ গুণাবলী বিতাড়িত করে ভাল গুণাবলী স্থাপিত করা। গায়রাত বলতে ঈমানকে মজবুত রাখার জন্য অধ্যাবসায় করা। আদর্শবাদী মতকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা। সেখহাবা ফুতুওয়াত বলতে বদান্যতাকে বুঝানো হয়েছে। ইসরার বলতে কোন মুমিন ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের পথ বাহির করা। মুরুওয়্যাত বলতে মানবীয় কাজে দায়িত্বশীল হওয়া। হিকমত বলতে জ্ঞান ও ইলমে হাল চর্চা বা জ্ঞানের অনুশীলন করা। শুকর বলতে ইসলামের পরিভাষায় কোন কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। রযা বলতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা। সবর বলতে সুখ-দুঃখ ও বিপদ -আপদে ধৈর্যধারণ করা।

রিওয়াতে হকুকি ইবাদ বলতে দাসীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সহিত বাবা মায়ের মত আচরণ করা। হাসিমুখে ও মিষ্টিময় বাক্যলাপের মাধ্যমে আমাদের উচিৎ তাদের সাহায্য ও মন

জয় করা। পরবর্তীতে আমরা আমাদের পাড়া প্রতিবেশী, শিক্ষক, পারিবারিক বা জৈবিক, বন্ধু-বান্ধব ও সর্বপরি সরকারের অধিকারসমূহ আদায় করা আমাদের কর্তব্য। কারো সাথে খারাপ আচরণ বা ধোঁকা দেয়া আমাদের উচিৎ হবে না। সবার সাথে সমান ব্যবহার ও মজদুরের প্রাপ্য পাওনা তার ঘাম শুকানোর আগেই পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ না করা, বাস অথবা যে কোন ধরণের ভাড়া পরিশোধ না করে প্রতারণা করা কোনভাবে ঠিক হবে না। সরকারের কর পরিশোধ না করে হাজার মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি করা ঠিক হবে না। হতে পারে এই ধরণের কুকর্মের কারণে সরকার জনগণের উপর নির্যাতন বাড়িয়ে দিল। যার ফলে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা শুরু করেদিল, এই ধরণের পরিস্থিতিতে কোনভাবে জনগনের পাশে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না। এই সম্পর্কে বিস্তারিত **ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ, বারিকা ও দুররুল মুখতার** নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদিস শরীফে এভাবে বর্ণিত আছে, **"যে কোন ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে (শরীয়তের বিষয় ছাড়া) অবস্থান করল আল্লাহ্‌ তার বিরুদ্ধে অবস্থান করবে"**। তিনি প্রতীবাদকে ভঙ্গ করে দিয়ে তাকে অপমানিত বা ঘৃনিত করবেন (নিবরাস)। এই কারণে মুসলমানদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান করার জন্য উদ্দীপক নাশকতামূলক এবং ধবংসাত্নক প্রকাশনা প্রত্যয় ধার থেকে দূরে থাকতে হবে। সাইয়্যেদ কুতুব ও আবুল আলা মওদুদি একই চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। জালিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কখনও সমর্থনীয় আন্দোলন হতে পারে না। ইবনে আবেদিন (রাঃ) মতে, পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা হারাম। ঈদের দিন অথবা বিবাহের মত অনুষ্ঠানে নিছক সরকারের আদেশ পালনের জন্য স্বর্ণ বা রূপা ব্যবহার করা ব্যতীত সাধা মাটের রেশমি কাপড় পরিধান করা যাবে তবে তা হতে হবে জাঁকজমকবিহীন। বিবাহের মত দিনে লাইটিং, মোমবাতি জ্বালানোর মত অযথা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা হালাল হবে না। তবে যদি সরকারের আদেশ থাকে তাহলে উপরোক্ত কাজ করা যাবে । কিন্তু ঐ সকল স্থানে কোনভাবে করা যাবে না, যেখানে নারীপুরুষ একসাথে উৎযাপন করলে পর্দার মারাত্নক সমস্যা হতে পারে। **ইবনে আবেদিনের** মতে, কাফির কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কোন কোন ইসলামিক স্কলারের মতে, আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় ইবাদাত পালন করার নিমিত্তে রাজপথে বিদ্রোহ করা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য না। এমনকি জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এ ধরণের আমল কোন কাজে আসবে না। আমরা সকলের সাথে ভাল

আচরণ করব। এবং কোনভাবে শয়তানের ফাঁদে পা দিব না। একজন সত্যিকারের মুসলিম আল্লাহ্ তায়ালা ও সরকারের প্রণীত আইন মেনে চলবে।

সাহাবীদের গুণাবলী

সাহাবাদের মধ্য খোলাফায়ে রাশেদা তথা হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রাঃ) সবচেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। বলা আছে যে, সকল সাহাবা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সাহাবীদের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বা ধারনা করা কোনভাবে বৈধ হবে না। আওলিয়াদের কারামত তথা অলৌকিকতা সত্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক গুণের অধিকারী ও সকলের নেতা ছিলেন। তার খিলাফত ছিল সত্য। অর্থাৎ সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর ছিলেন। তিনি তার কন্যা আয়েশা (রাঃ) কে রাসুল এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। হাকিকত সম্পর্কে তার জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক। তিনি তার সকল ধনসম্পত্তি আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছেন। এমন হয়ে ছিল যে তার কাছে একটি চাদর ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না গায়ে দেওয়ার মত। এমতাবস্থায় ঐ একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে জীবন যাপন শুরু করলেন। এদিকে জিবরাঈল (আঃ) ও ঐ একই ধরণের কাপড় পরিধান করে রাসুল এর সাক্ষাতে আসলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই অস্বাভাবিক পরিধান দেখে বলল, **"ওহে আমার সহোদর, তোমাকে এ পোষাকে আগে কখনো দেখি নি। কি হল তোমার"?** জিবরাঈল (আঃ) তার ব্যাখ্যায় বললেন যে, শুধু আমি এ পোষাকে নই বরং সকল ফেরেশতা এ একই অবস্থায় বিদ্যমান। এতা এ কারণে যে, আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করলেন, **"আমার বান্দা আবু বকর একমাত্র আমার পথে ও আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তার সকল সম্পত্তি আমার রাস্তায় দান করেছে যার ফলে তার পরিধান করার মত কিছু না থাকায় একটি মাত্র কাপড় দিয়ে শরীর আবরণ করে জীবন যাপন করছে। হে জিবরাঈল তুমিও তার মত পরিধান কর। এ কারণে সকল ফেরেশতার একই অবস্থা বিদ্যমান"**। তখন থেকে তাঁকে আবু বকরকে সিদ্দিক হিসেবে অবিহিত করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে দ্বিতীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)। ইজামায়ে উম্মতের মতে তার খিলাফাতও

সত্য। সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী। একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন মুনাফিক ও ইহুদী তাদের উভয়ের মাঝে একটি সমস্যা সমাধান করার জন্য আসলেন। রাসুল তাদের অভিযোগ শুনলেন। রায় আসলো ইহুদী ব্যক্তির পক্ষে। মুনাফিক রাসুলে পাকের রায়ে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ওমর (রাঃ) কাছে গিয়ে বিচার চাইলেন। ওমর (রাঃ) বললেন যে, রাসুল থাকা অবস্থায় আমি কিভাবে এর মীমাংসা করব? মুনাফিক ব্যক্তিটি বলল, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। আমি তাঁর এ রায়ে সন্তুষ্টি না হয়ে আপনার কাছে আসলাম। অতঃপর ওমর (রাঃ) তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি এর সমাধান নিয়ে আসছি। কিছুক্ষণ পর তিনি তার জামার ভিতরে লুকিয়ে ধারাল একখানা তলোয়ার নিয়ে এসে বিদ্যুৎ গতিতে তার কাঁধে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, এটিই হল তার প্রতিদান যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মীমাংসিত কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট না হয়। এটা ছিল ওমর (রাঃ) এর সুন্দর একটি ব্যখ্যা। এসব কারণে তাঁকে ওমর ফারুক (রাঃ) নামে খেতাব প্রদান করা হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেন, **"ইহাই হল ওমর, যে মিথ্যা থেকে সত্যর পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখেন"**। সাহাবীদের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। ইজামায়ে উম্মতের মতে তার খিলাফতও সত্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান (রাঃ) এর কাছে তার দুই কন্যা বিবাহ দিয়ে ছিলেন। একজনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জনকে বিবাহ দিয়েছিলেন। যখন তার দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যু হয়, রাসুল বলেন, **"আমার কাছে যদি আরও একজন কন্যা থাকত তাহলে তাকেও তার কাছে বিবাহ দিতাম"**। যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দ্বিতীয় মেয়েকে উসমান (রাঃ) কাছে বিবাহ দিলেন তখন তিনি তার জামাতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিবাহের পর তার কন্যা রাসুলকে বললেন। হে আমার বাবাজান, আপনি তার অনেক প্রশংসা করেন কিন্তু তিনি আপনার ধারণা বা প্রশংসা অনুযায়ী অতটা ভাল আমার কাছে মনে হয় না। এই কথা শুনে আল্লাহ্র রাসুল তার কন্যাকে বললেন, **"ওহে আমার আদরের কন্যা, ফেরেশতারা পর্যন্ত হজরত উসমান (রা) এর হায়া বা লজ্জা অনুভব করে"**। রাসুল তার দুই কন্যাকে তার কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন তাই তাঁকে বলে হয় উসমান জিননুরাইন। জিন-

নুরাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে, দুই নুরের অধিকারী। হযরত উসমান (রাঃ) মারিফাত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। ইজমায়ে উম্মাতের মতে তার খেলাফাতও সত্য। তিনিও রাসুল এর জামাতা ছিলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে তার কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। তরিকতের সম্পর্কে তার জ্ঞানের প্রখরতা ছিল ব্যাপক। তার একটি পুরুষ গোলাম ছিল। একদিন গোলাম মনঃস্থির করল যে তার মালিক তথা আলী (রাঃ) কে পরীক্ষা করবে। ঐ সময় আলী (রাঃ) ঘরের বাহিরে অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি ঘরে আসলেন এবং গোলাম থেকে খেদমত চাইলেন, কিন্তু গোলাম কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) গোলামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমার সাথে এমন কি বাজে বা খারাপ আচরণ করলাম অথবা আমি এমনকি কাজ করলাম যা তোমার মনে আঘাত দিয়েছে? পরে গোলাম উত্তর দিলেন যে, আপনি আমার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেন নি। আমি আপনার গোলাম। আমি শুধুমাত্র আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এ ব্যবহার করেছি এবং বুঝতে পারলাম যে আপনি সত্যি আলী (রাঃ)।

মুসলমানদের মধ্যে যারা সাহাবীদেরকে ভালবাসে ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদেরকে **আহলে সুন্নত** বলা হয়। আর যারা বলে আমরা কিছু সংখ্যক সাহাবীকে ভালোবাসি এবং অধিকাংশকে অস্বীকার করি তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় **শিয়া** বলা হয়। যারা সকল সাহাবিদেরকে দেখতে পারে না তাদেরকে **রাফেজি** বলা হয়। যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে ভালবাসার দাবি করে কিন্তু বাস্তবে তাদের একজনকেও অনুসরণ করে না তাদেরকে **ওয়াহাবি** বলে। ওয়াহাবিবাদ এমন একটি মিশ্রিত মতবাদ যার প্রবক্তা হলেন প্রচলিত মতবিরোধী ধর্মীয় নেতা আহমদ ইবনে তাইমিয়া ও ব্রিটিশ গুপ্তচর হেম্পার। তারা বলে আহলে সুন্নত মুসলিমরা হল অবিশ্বাসী কেননা তারা অর্থাৎ আহলে সুন্নত অনুসারীরা মুসলিমরা ওয়াহাবি নামক মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ওয়াহাবি মতবাদ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগিতায় গঠন করা হয়েছিল। শহীদ হওয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের রক্তের বিনিময়ে তারা আজ ব্রিটিশদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আজকের দিনেও দেখা যাচ্ছে যে, তারা প্রত্যেক দেশে ওয়াহাবি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে যার নাম দিয়েছে **রাবেতা আল আলমে ইসলামী**। যার মাধ্যমে

তারা অশিক্ষিত লোকদেরকে টার্গেট করে কাজ করছে। আর বুঝানো হচ্ছে যে তারা একমাত্র ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। তারা আহলে সুন্নাতের আলেমদেরকে যার ইসলামের জন্য চৌদ্দশত বছর ধরে থেকে কাজ করে যাচ্ছে তাদের এবং তাদের অবিভাবক অটোম্যানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে। এরা হচ্ছে তারা, যারা কুরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি সংকলিত ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচার করে যাচ্ছে। কিছু কিছু ওয়াহাবি আছে যারা নিজেদেরকে সুন্নি মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করে। আমরা হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী। এদের সাথে মুতাজিলা মতবাদের পুরাপরি মিল রয়েছে। এরাও নিজেদেরকে সুন্নি মুসলিম বলে দাবি করে এবং বলে আমরা হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তারা বলে, যে সব লোক সুন্নি মাযহাবে নাই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

খাবার

খাবার গ্রহণেরউপকারিতাঃ খাবার গ্রহণের পূর্বে হাত পরিষ্কার করার দশটি উপকারিতা রয়েছে। পাশাপাশি তা এক প্রকারের সুন্নত। আর তা হল।

১। একজন ফেরেশতা আরশের নিচে খাবারের জন্য হাত পরিষ্কার করা ব্যক্তিটির ছগীরা গুনাহ মাফের জন্য এই দোওয়া করতে থাকবে।

২। হাত পরিষ্কার করলে নফল নামাযের সওয়াব অর্জন করা হয়।

৩। দারিদ্রতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৪। সে সিদ্দীকদের জন্য গৃহীত সওয়াব অর্জন করবে।

৫। ফেরেশতারা তার জন্য ইস্তিগফার করবে।

৬। হাত পরিষ্কারের পর যে খাবার সে ভক্ষণ করবে ঐ সকল খাবার মিসকিনদের দান করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে তার সমতুল্য সওয়াব তাকে প্রদান করা হবে।

৭। হাত পরিষ্কারের পর সে যদি বিসমিল্লাহ্ দিয়ে খাবার গ্রহন শুরু করে তাহলে তার সকল গুনাহ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

৮। তার ঐ খাবার মহান আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক কবুল করা হয়।

৯। যদি সে ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে শহীদ কর্তৃক অর্জিত সওয়াব প্রদান করা হবে।

১০। আর যদি তার ঐ দিনে মৃত্যু হয় তাহলে তাকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সুন্নতের আলোকে খাবারের পূর্বে হাত পরিষ্কার করার ছয়টি উপকারিতা রয়েছে।

১। একজন ফেরেশতা আরশের নিচে বলতে থাকবে, হে ঈমানদারগণ রাসুল তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

২। রাসুলের সুন্নত পালনের জন্য অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে।

৩। তার শরীরের পশম পরিমান সমতুল্য সওয়াব প্রদান করা হবে।

৪। মহান আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের অধিকারী হবে।

৫। প্রচুর পরিমান সওয়াবের অর্জন করবে যা গুনাহের কারণে তোমার হাত থেকে ফসকে গিয়েছে।

৬। একজন শহীদ হিসেবে মৃত্যুর সৌভাগ্য অর্জন করবে।

আল্লাহ তায়ালার আদেশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমরে তাকউঈনি ও আমরে তাকলিফি।

আমরে তাকউঈনিঃ আমরে তাকউঈনি অর্থ হল এই কথা বলা **"হও"**। সাথে সাথে ঐ বস্তু হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন কিছু হওয়ার জন্য আদেশ করবেন **হও**, সাথে সাথে হয়ে যাবে। কারো পক্ষে তার প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা নেই বরং তা হয়ে যাবে। তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেন অন্য কিছুর জন্য অর্থাৎ তিনি যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেন তার একটি অপরটির পরিপূরক। তার সৃষ্টির মধ্যে কোন অযথা সৃষ্টি নেই। সব কিছুরই উপকারিতা আছে। যেমন মানুষকে তিনি বস্তু গত বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষমতা দিয়েছেন তার এমন অনেক সৃষ্টি রয়েছে যার একটির পিছনে অন্যটির সৃষ্টির কারণ রয়েছে।

আমরে তাকলিফিঃ এটি হচ্ছে এমন সব বিধি বা আদেশ, যা আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের সম্পর্কে উপভোগ করেন যে তার বান্দারা কি কি করে আর কি কি করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। তার এ আদেশ বান্দার ইচ্ছা ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও পছন্দ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যা হোক, এটি হচ্ছে তিনি, যিনি বান্দা যা সংকল্প কিংবা পছন্দ করে তা সৃষ্টি করে থাকেন। যখন মানুষ কোন কিছু করার ইচ্ছা করে তখন তিনি তা সৃষ্টি করেন যদি তিনি তা ইচ্ছে পোষণ করেন। যদি তিনি তা ইচ্ছা না করেন তাহলে তা তিনি সৃষ্টি করেন না।

তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেন এবং সকল পদার্থকে কার্যকরভাবে বিভিন্নভাবে সরবরাহ করে থাকেন। তার সাথে অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনিই একমাত্র ইলাহ। তার সাথে কাউকে শরীক করা মানে হচ্ছে তার বিশেষণের (উলুহিয়্যাত) সাথে কাউকে যোগ করা। তিনি ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করল তিনি তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এবং তাকে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। যখন মানুষ আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার দয়া অনুযায়ী তার সে কাজ সম্পাদন করে দেন। অর্থাৎ বান্দার ভাল কাজ করার ইচ্ছাটাকে তিনি বাস্তব রুপদান করেন । আর যখন মানুষ কোন খারাপ কাজ করার সংকল্প করে আল্লাহ্ তায়ালা তার ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ খারাপ কাজ সম্পাদন করে দেন। অর্থাৎ তিনি তা তার জন্য সৃষ্টি করেন। যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে কিন্তু সে খারাপ কাজ করার জন্য তার নিকট প্রার্থনা করল। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি দয়া করল। তিনি তার খারাপ ইচ্ছাকে তার জন্য সৃষ্টি করবেন না। কারণ সকল কিছুর চাবি কাঠি একমাত্র তার হাতে। শয়তান যত চেষ্টা করুক না কেন সে কখনো সফল হতে পারবে না দয়াময় আল্লাহ্র নিকট।

আল্লাহ্ তায়ালা আমরে তাকলিফিসমূহকে তাদের প্রয়োজনের আলোকে শ্রেণি ভাগ করে থাকেন। নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। আল্লাহ্ তায়ালা মানব জাতিকে তার প্রতি ঈমান ও পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

২। যারা ঈমান এনেছেন তারা যাতে কোন প্রকার হারাম কাজ ও পাপ কাজ সম্পাদন না করে তার আদেশ দিয়েছেন।

৩। ইমানদারদেরকে ফরজ কাজসমুহ সম্পাদন করার আদেশ রয়েছে।

৪। যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকে ফরজ, নফল ও সুন্নত পালন করার আদেশের পাশাপাশি হারাম কাজ সম্পাদন, মাকরুহ কাজ বর্জন এমন কি যাবতীয় পাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন। উপরোক্ত প্রকারভেদ থেকে আমাদেরকে সবগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ সবগুলো একসাথে পালন করতে হবে। একটি পালন করলাম অন্যটি করলাম না তাহলে কোন উপকারে আসবে না। সিরিয়াল অনুযায়ী সবগুলোর উপর আমল বা বিশ্বাস করতে হবে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে-

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলো কিন্তু হারাম কাজ ছাড়তে পারে

নাই, ইসলামের ফরযগুলো পালন করার সাথে সাথে পাপ কাজও সম্পাদন করল, কিংবা সুন্নত ও নফলের করল কিন্তু ফরয পালন করল না আসলে তার কোন আমল কাজে আসবে না। তার কোন আমল কবুল করা হবে না। কারণ একটি ব্যতীত অন্যটি পরিপূর্ণ হবে না। একইভাবে কোন ব্যক্তি তার ফরয নামায ও যাকাত আদায় করল না এবং তার পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকারসমূহ আদায় করল না তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার সকল ধরণের ভাল কাজসমূহ যেমন বদান্যতা, দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ, কাউকে সাহায্য করা এমন কি খাবারের পূর্বে হাত পরিষ্কার কিংবা ওমরা পালনসহ কোন কাজই তিনি কবুল করবেন না। তাই আমাদের সকলকে সিরিয়াল অনুযায়ী আমরে তাকলিফিসমূহকে পালন করা উচিৎ। যার অবস্থান যেখানে তাকে সেখানে রেখে আমল করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তার উপরের কাজগুলো রেখে এবং সে যদি বলে এগুলো উপরেরগুলো থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা কোন হারাম কাজ সম্পাদন করে তাহলে ঐ কাজ গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু তাকে অবশ্যই উপরের ভাল কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। এই বিষয়ে তাফসিরে **রুহুল বয়ানে** বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে ভাল কোন কাজ করা বরকতকে বৃদ্ধি করে। আশার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর আদেশগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণগুলো পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন অধিকতর সহজ।

খাবারের মধ্যে ৪ টি ফরয রয়েছেঃ

১। যখন খাবার গ্রহণ করবে তখন ইহা সামনে রাখতে হবে যে সন্তোষ ও তৃপ্ততা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক গৃহীত হবে।

২। হালাল খাদ্য গ্রহণ করা।

৩। খাবার গ্রহণের মাধ্যমে যে শক্তি অর্জিত হয় তার সবটুকু আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৪। যা তোমার কাছে আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। খাবার যা হোক না কেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

খাবার গ্রহণের শুরুতে এই নিয়্যত করতে হবে যে, আমার এই খাবারের মাধ্যমে যে শক্তি উপার্জিত হবে তা আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত ও গোলামীর জন্য ব্যয় করব, তার ধর্মকে তথা ইসলামকে সেবা করার জন্য ও চিরস্থায়ী পাওয়ার জন্য। অনাবৃত মস্তকে খাবার গ্রহণ করা বৈধ।

খাবারের মুস্তাহাবসমূহঃ

জমিনের উপর দস্তর খান বিছানো। খাবারের গ্রহণের জন্য নতুন কাপড় পরিধান করা। নিজ হাঁটুর উপর বসা। খাবার গ্রহণের পূর্বে হাত ও মুখ ভাল করে ধুয়ে নেয়া। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা। লবণের মাধ্যমে খাবার গ্রহণ শুরু করা। অর্থাৎ লবণের স্বাদ নিয়ে শুরু করা। যবের ময়দা দিয়ে তৈরি রুটি খাওয়া। হাতে দিয়ে রুটিকে ভাঙ্গা। রুটির ক্ষুদ্র অংশ যাতে অপচয় না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা। বাসনের যে অংশ তোমার নিকটে তার থেকে খাবার গ্রহণ শুরু করা। সামান্য পরিমান টক ব্যবহার করা। রুটিকে ছোট ছোট করে ভক্ষণ করা। খাবারকে ভাল করে চিবিয়ে ভক্ষণ করা। আঙ্গুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করা। আঙ্গুল দিয়ে বাসনকে ভাল করে পরিষ্কার করে খেয়ে নেওয়া। আঙ্গুলসমূহকে তিন বার ছেঁটে নেওয়া। খাবারের শেষে আল্লাহ্র প্রশংসা করা। দাঁত পরিষ্কার করে নেয়া।

খাবারের মাকরুহসমূহঃ

বাম হাত দিয়ে খাবার নেওয়া। খাবার গ্রহণের পূর্বে তার ঘ্রান নেওয়া। বিসমিল্লাহ বলতে অবহেলা বা অবজ্ঞা করা।

খাবারের হারাম কাজসমূহঃ

তৃপ্ত হওয়ার পরেও খাবার গ্রহণ চালু রাখা। (যদি তোমার নিকট মেহমান থাকে তাহলে তার তৃপ্তি হওয়া পর্যন্ত তাকে খাবার পরিবেশন করতে হবে)। খাবার নষ্ট বা অপচয় করা। কোন কোন স্কলারের মতে, খাবার যখন সামনে চলে আসে তখন বিসমিল্লাহ পড়ে নিতে হবে। কোন প্রকার দাওয়াত ব্যতীত ভোজে অংশ গ্রহণ করা। কারো অনুমতি ব্যতীত তার খাবার গ্রহণ করা। এমন কোন খাবার খাওয়া যা শরীর খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে। এমন খাবার যাহা দাম্ভিকতার সহিত তৈরি করা হয়েছে। এমন ধরণের খাবার গ্রহণ যার শপথ পূর্বে দেয়া হয়েছিল।

গরম খাবার গ্রহণঃ

গরম খাবার বধিরতার কারণ হতে পারে। চেহারা বিবর্ণ হওয়ার আশংকা রয়েছে। এটি চোখ দিয়ে ভাল করে না দেখার কারণ হতে পারে। এটি দাঁতের রঙ পরিবর্তন করে ফেলতে পারে অর্থাৎ হলুদ বর্ণ ধারণ করতে পারে। মুখের স্বাদ নষ্ট করে দিবে। যার ফলে স্বাদহীনতায় ভুগতে হবে। এটি বোধশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এটি মনের ক্ষতি সাধন করে। এর কারণে শারীরিক রোগ ব্যাধি হতে পারে।

অল্প খাবারের উপকারিতাঃ

শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হবে। তোমার অন্তরকে নুর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে। শক্তিশালী স্মৃতিশক্তির অধিকারী হবে। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। কাজ করতে আনন্দ পাবে। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য আনন্দের সহিত ভাল করে জিকির করতে পারবে। তুমি তার জন্য গভীরভাবে ধ্যান করতে পারবে। এমনকি তার ইবাদত করা থেকে নিজেকে অনেক সুখী অনুভব করবে। এর মাধ্যমে সকল কাজে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর মনোযোগ দিতে পারবে। কিয়ামতের দিন হিসাব প্রদানের ক্ষেত্রে সহজতর হবে।

বিবাহ

বিবাহের উপকারিতাঃ

প্রথমত, এটা তোমার ঈমানকে রক্ষা করবে। তুমি সুন্দর আচরণের অধিকারী হবে। তোমার রুজি রোজগারে বরকত আসবে। বিবাহ করা সুন্নত অর্থাৎ তার মাধ্যমে রাসুলের একটি সুন্নত পালিত হল। আমাদের রাসুল ইরশাদ করেন, **"বিবাহ করো অধিক পরিমান সন্তান জন্ম দাও। এটা এই জন্যে যে কিয়ামতের দিন আমি সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের উম্মত বেশী হওয়ার গর্ব করব"**।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই তাদের একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। কোন ব্যক্তি বিয়ে করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ভাল করে মেয়ে দেখে নিতে হবে। অর্থাৎ মেয়ে সালিহা (মুমিনা) কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মুহরিম বা কোরআনে বর্ণিত পনেরজন নারী ব্যতীত অন্য সকল মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে। কোন মেয়ে যদি বিবাহের জন্য সকল শর্তাবলী পরিপূর্ণ করতে পারে তাহলে তাকে যে কেউ চাইলে বিবাহ করতে পারবে। ফতওয়ায়ে ফায়জিয়ার মতে, যেনার মাধ্যমে গর্ভ ধারণকৃত নারীর সাথে বিবাহ দেয়া বৈধ। আর যদি যেনাকারী অন্য কোন ব্যক্তি হয় তাহলে সন্তান জন্ম নেয়ার আগে তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে জোড়ান বৈধ নয়। কোন নারীকে তার রূপ বা সম্পত্তি দেখে বিবাহ করো না। অন্যথায় তুমি ঘৃণিত পাত্রে পরিণত হবে। আমাদের রাসুল ইরশাদ করেন, **"যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে তার সম্পদ ও রূপের জন্য বিবাহ করল তাহলে তাকে ঐ মহিলার সম্পদ ও রূপ থেকে বঞ্চিত করা হবে"**। কোন ব্যক্তি কোন নারীকে তার খোদাভীরুতা ও সুন্দর আখলাকের জন্য বিয়ে করলে আল্লাহ্ তায়ালা

তার সম্পদ ও রূপ বাড়িয়ে দিবেন। স্ত্রীরা সাধারণত চারটি বিষয়ে স্বামীদের চেয়ে নিম্নগামী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর বয়স, শারীরিক উচ্চতা, আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্কের দিকে নিম্নগামী হওয়া ভাল। অনুরূপভাবে স্বামীদেরকেও চারটি বিষয়ে স্ত্রীদের চেয়ে নিম্নগামী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীদের অবশ্যই সুন্দর ও আদবের অনুসারী হতে হবে, সুন্দর আচরণ, তাকে অবশ্যই হারাম সন্দেহমূলক কাজ পরিত্যাগ এবং তার মাথা, মাথার চুল, বাহু ও পা ইত্যাদি বেগানা কোন পুরুষকে দেখাতে পারবে না। যুবতী কোন মেয়েকে বয়স্ক লোকের সাথে বিবাহ দেয়া কোনভাবে বৈধ হবে না। এটা ফাসাদ বা ফিতনার কারণ হতে পারে।

বিবাহের অনুষ্ঠান হওয়ার আগে বর ও কনে পক্ষের অবিভাকদেরকে তাদের উভয়ের সম্পর্কে ভাল করে তদন্ত বা জেনে নেওয়া উচিৎ, এতে করে সুন্নত পালনের পাশাপাশি যাতে করে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী ও সুন্দর হয়। স্কলারদের মতে এখানে তিনটি উপকার রয়েছে। প্রথমত, দাম্পত্য জীবনে তাদের ভালবাসা আরও বৃদ্দি পাবে। দ্বিতীয়ত, তাদের রিজিকের বরকত হবে ও এই কাজটির মাধ্যমে তারা রাসুল এর একটি সুন্নত পালন করতে পারল। সরকার বা ঐ দেশের কোন শহরের বৈবাহিক আইনকে সামনে রেখে বিবাহ সম্পন্ন করা আবশ্যক। সরকারী আইন না মেনে বিবাহ দেয়া বা করা কোনভাবে বৈধ হবে না এমনকি সুন্নত ও পালন হবে না। এভাবে বিয়ে করলে বা দিলে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে যার জন্য শাস্তি অবধারিত। সরকারী আইন ও সুন্নতকে সামনে রেখে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর ছেলের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী সকলের উচিৎ কনের পরিবারকে উন্নত মানের উপহার প্রদান করা। এটা এজন্যে যে, তাদের উভয়ের মাঝে ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রী নিজেকে তার স্বামীর সামনে সুন্দর করে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা বৈধ। এর দ্বারা অধিক সাওয়াব অর্জিত হয়। বিবাহের দিন সন্ধায় ভোজ করানো সুন্নত। অর্থাৎ রাতের নামাজের পর রাতের খাবার গ্রহণ করা উচিৎ। রাতের নামাযের পর বর নববধূর ঘরে প্রবেশ করবে। নফল বা শুকরিয়ার নামায আদায় করে তারা তাদের কাজে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সুন্নত হিসেবে বিয়ের প্রথম দিন রাতে স্বামী তার নববধূ স্ত্রীর পা ধুয়ে দিবে এবং ধোয়াকৃত পানি পুরো বাড়িতে ছিটিয়ে দিবে। তারপর দুই রাকআত নামায আদায় করে নিবে। বলা হয়েছে যে, ঐ দিন আল্লাহ্ তায়ালা নামায আদায় করা বরের সকল দোয়া কবুল করবেন। মানুষ

বরকে দেখার সাথে সাথে এ বলে স্মরণ করিয়ে দিবে যে, **"বারাকাল্লাহু ওয়া বারাকাল্লাহু আলায়হি ওয়া জামায়া বায়নাকুমা বিলখায়রি"**।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ও তোমার স্ত্রীকে বরকত ও কল্যাণ কামনা করুক, সারা জীবন তোমাদেরকে কল্যাণের সহিত একসাথে রাখুক। অনেক মানুষ নব বিবাহিত দম্পতিকে এই বলে সম্বোধন করে শুভ কামনা ভাল হোক তোমাদের নতুন জীবন অথবা সুখী হোক তোমাদের সুখী সংসার। এটা মূলতঃ অপ্রয়োজনীয়মূলক বাক্য বা অজ্ঞতার পরিচয়। বরং নামায পড়ে তাদের জন্য দোয়া করা উচিৎ। বরের উচিৎ হবে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা ও পরিবার বা স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া। এটা এজন্য নয়, যে তুমি কোন দিন তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হবে বরং এটি শিক্ষা করা ফরয। অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। কোনটি হালাল, কোনটি হারাম ও কোনটি ফরয এগুলো জানতে হবে ও তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। এবং এটি সুন্নত যে, সুন্নতকে জানার পাশাপাশি পরিবারের সবাইকে তা জানানোর নামও সুন্নত। এটা কোনভাবে বৈধ নয় যে স্ত্রীকে বাহিরে এমন জায়গায় পাঠানো যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। স্বামীর জন্য স্ত্রীকে শরীয়তের আলোকে ভাল করে পোশাক পরিধান না করে বাহিরে নেয়া কোনভাবে বৈধ নয়। আমাদের রাসুল ইরশাদ করেন যে, **"যদি কোন নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে নামায আদায় করার জন্য মাসজিদে আসে তাহলে তার নামায কবুল করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ নারী বাড়িতে গিয়ে ভাল করে গোসল না করে। ঐ গোসল হতে হবে এমন অপবিত্র থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য যেভাবে গোসল করা"**। অর্থাৎ এটা কোনভাবে বৈধ হবে না যে, সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে গিয়ে নামায আদায় করা। বরং এর মাধ্যমে গুনাহ অর্জিত হবে। তাই এসকল কাজ থেকে আমাদের স্ত্রীদেরকে দূরে রাখতে হবে। আমাদের উচিৎ হবে নিজেদের মাঝে তুলনা করে একটি সহনীয় পন্থা আবিষ্কার করা যাতে করে সে তা বুঝতে পারে যে এটা অন্যায় কাজ যা ইসলামী শরীয়ত কখনো অনুমতি দিবে না।

রাসুল ইরশাদ করেন, **"জান্নাতের অধিকাংশ মানুষ হবে গরীব বা মিসকিন যারা দুনিয়ার জীবনে গরীব ছিল, আর জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা হবে নারী"**। এটা শুনে মা আয়েশা (রাঃ) রাসুল এর কাছে জানতে চাইলেন, জাহান্নামে অধিকাংশ বাসিন্দা নারী হওয়ার কারণ সম্পর্কে। রাসুল এর ব্যখ্যায় বলেন, **"তারা কোন বিপদে পড়া লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসে না। যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে

সর্বদা সাহায্য করে কিন্তু তার বিনিময়ে তারা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আর বলে এসবতো আমাদের জন্য অর্থাৎ সাহায্য ও অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা শুধু আমাদেরই। এমনকি তারা তাদের ঐ সাহায্যের কথা ভুলে যায় ও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তারা শুধুমাত্র সাজগোজ ও অলঙ্কার নিয়ে ব্যস্ত থাকে ও তাদের অধিকংশ সময় গল্প করে কাটায়"**। উপরোক্ত খারাপ কাজগুলো পুরুষ কিংবা নারী দ্বারা সম্পাদিত হলে সকলেই জাহান্নামি হবে।

হজরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন একজন নারী রাসুলে পাক এর নিকট আসলেন এবং বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি একজন মানুষকে বিবাহ করতে চাই এতে আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি। দয়ার রাসুল বললেন, **"একজন স্বামীর তার স্ত্রীর উপর অনেক অধিকার আছে তুমি কি তা পালন করতে পারবে"?** মহিলাটি বলল স্বামীর অধিকারসমুহ কি কি ইয়া রাসুলাল্লাহ? **"যদি তুমি তাকে কষ্ট বা আঘাত দাও তাহলে তুমি আল্লাহর বিপক্ষে অবস্থান করলেও তোমার নামায কবুল হবে না"**, বললেন আল্লাহ র রাসুল। মহিলা জানতে চাইল আর কোন অধিকার আছে? রাসুল বললেন, **"যদি কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ির বাহিরে গেল তাহলে তার প্রত্যেক কদমে কদমে গুনাহ লিখা হবে"**। মহিলা বলল আর কোন অধিকার? রাসুল বললেন, **"কোন নারী যদি তার স্বামীকে কথার মাধ্যমে আঘাত করে তাহলে কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তার কণ্ঠনালীকে কাধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাহিরে নিয়ে আসবে"**। মহিলা জানতে চাইল আর কোন অধিকার? রাসুল বলল, **"কোন মহিলার কাছে সম্পত্তি থাকার পরেও সে তার স্বামীর প্রয়োজনে ব্যয় করেন নি তাহলে ঐ মহিলা কিয়ামতের দিন কাল চেহারায় আগমন করবে"**। মহিলাটি আবার জানতে চাইল আর কোন অধিকার? রাসুল তার উত্তরে বললেন, **"যদি কোন নারী তার স্বামীর সম্পদ থেকে কিছু অংশ ছিঁচকে চুরি করে কাউকে দিয়ে দিল, আল্লাহ তায়ালা তার এ জাকাত বা দান কবুল করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্বামীর কাছে ক্ষমা না চায় ও স্বামী ক্ষমা না করে"**। মহিলাটি জানতে চাইল আর কোন অধিকার? রাসুল বললেন, **"যদি কোন নারী তার স্বামীর নামে শপথ করে যে সে তার আনুগত্য করবে না, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তার জিহবাকে জাহান্নামের গর্তের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে। কোন মহিলা স্বামীর বাড়ির বাহিরে গিয়ে কোন বারে মহিলার নৃত্য উপভোগ করে গান শুনে তাহলে তার শিশু থেকে এপর্যন্ত অর্জিত সকল সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। আর ঐ সকল পোশাক যেগুলো সে পরিধান করেছিল সেগুলো আজ তার বিরুদ্ধে**

সাক্ষী দেবে এবং বলবে সে আমাদেরকে ঐ সকল পবিত্র দিনে অথবা তার স্বামীর সাথে থাকা কালীন সময়ে পরিধান করে নি বরং ঐ সময়ে পরিধান করেছিল যে সময় সে হারাম জায়গাগুলোতে অবস্থান করত। অর্থাৎ খারাপ জায়গায় অবস্থান করত। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করবেন যে, আমি এই সমস্ত নারীদেরকে হাজার বছর যাবত আগুনে দাহন করব"। এই সকল বিষয়ে শুনে ঐ নারী রাসুলকে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই সকল কাজ করতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিয়ে করবো না।

এমন সময় রাসুল তার উপরোক্ত বাক্যসমূহের ব্যখ্যা দিলেন এভাবে, **"হে খাতুন, এখন আমাকে একজন পুরুষের সাথে বিবাহ করার উপকারিতা বলার সুযোগ দাও। শুনো, কোন স্ত্রীর স্বামী তাকে একথা বলে আল্লাহ্ তোমার উপর খুশি হোক। তাহলে তার এবাক্য দ্বারা স্ত্রীর ষাট বছর ইবাদত করার সওয়াব পাবে। স্ত্রী তার স্বামীকে এক গ্লাস পানি পান করানো এক বছর রোযা রাখার চেয়ে অধিক ফজিলতের। শারীরিক সম্পর্ক সম্পাদনের পর স্ত্রীর গোসল করলে একটি কোরবান পালন করার মত সওয়াব অর্জন তার নামে দেয়া হবে। যদি কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে হটকারিতা না করে ফেরেশতারা তার জন্য তাসবিহ পাঠ করে। স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে কৌতুক বা মজা করে তাহলে ষাটটি দাস মু ক্ত করার মত গুণের অধিকারী হবে। যদি কোন নারী তার স্বামীর দুঃখের দিনে সম্পদ অর্জন করে বা রিজিকের ব্যবস্থা করে ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিকভাবে আদায় করে এবং রমযান মাসের রোযা রাখে তাহলে এটা তার জন্য হাজার বার কাবা ঘর তাওয়াফের চাইতেও অধিক সাওয়াবের মালিক হবে"**।

হযরত ফাতিমা (রা) রাসুল এর কাছে জানতে চাইলেন যে, যদি কোন মহিলা তার স্বামীকে আঘাত করে তাহলে তার কি হবে? তখন তার পিতা রাসুল বললেন, **"যদি কোন নারী তার স্বামীকে আনুগত্য করার অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার বিরুদ্ধে অবস্থান করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্বামীর কাছে ক্ষমা না চায় ও তার স্বামী তাকে ক্ষমা না করে। আর সে যদি শারীরিক সম্পর্ক করতে অস্বীকার করে তাহলে তার সকল সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে স্ত্রী আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধের বস্তুতে পরিণত হবেন। অথবা স্ত্রী যদি স্বামীকে একথা বলে যে তুমি আমাকে ব্যবহার করার কোন অধিকার নাই তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার দয়া তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যদি**

কোন স্বামী তার স্ত্রীকে শরীয়ত সম্মত পোশাক না পরে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে তাহলে ঐ স্বামী র নামে হাজারের চেয়েও অধিক গুনাহ লিখা হবে কেননা সে হারাম কাজ করার উৎসাহিত করেছে"। এর থেকে বুঝা যায় যে একজন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাহিরে যাওয়ার শাস্তির পরিমান। রাসুল ইরশাদ করেন, **"হে ফাতিমা, যদি আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাহ বা মানবজাতিকে অন্য কোন বিষয় থেকে আল্লাহ্কে ব্যতীত সিজদা করার আদেশ দেন, তাহলে আমি মহিলাদেরকে অন্য কোন বিষয়ের পূর্বে তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করার আদেশ করতাম"**। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আমি আমার নিজের ভালোর জন্য রাসুলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, **"হে আয়েশা, আমি তোমার ভাল হওয়ার জন্য তোমাকে যেমন উপদেশ দিচ্ছি ঠিক তেমনি তুমি আমার উম্মতের ভালোর জন্য উপদেশ বা কাজ করে যাবে। যখন মানব জাতিকে কিয়ামতের দিন বিচারের মুখোমুখি করা হবে তখন তাদেরকে প্রথম প্রশ্ন করা হবে ঈমান সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে পবিত্রতা ও নামায সম্পর্কে। তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীর আনুগত্যের বিষয়ে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হযরত আইয়ুব (আঃ) কতৃক অর্জিত সওয়াবের পরিমান সমান সওয়াব দ্বারা পুরস্কৃত করবেন। আর যদি কোন নারী তার স্বামীর খারাপ আচরণ করা সত্তেও ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার মর্যাদা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর মত বাড়িয়ে দিবেন"**। রাসুল ইরশাদ করেন যে, **"যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আঘাত করে তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে অবস্থান করব"**। তিনটি কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে হাতের তালু দ্বারা মৃদু আঘাত করতে পারবে অন্যথায় নয়। নামায বা গোসল আদায় না করা, স্বামীর আহবানে মিলিত হতে অস্বীকার করা ও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ির বাহিরে যাওয়া। কোন ভাবেই স্ত্রীকে লাঠি কিংবা অন্য কোন ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করার অনুমতি নেই। অথবা তাকে লাথি মারা অথবা হাতের মধ্যে ভারী কোন কিছু লাগিয়ে আঘাত করা যাবে না। এমনকি স্ত্রীর শরীর কিংবা মাথায় কোনভাবে আঘাত করা বৈধ নয়। উপরোক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে আঘাত করার অনুমতি নেই। প্রথমে তার ভুলের জন্য তাকে সংশোধন বা সময় দেয়া। এরপরেও যদি না শুনে তাহলে তাকে শাস্তি স্বরূপ বিছানা আলাদা করে দেয়া যাতে করে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে ও যাবতীয় দায় দায়িত্ব তখন স্ত্রী নিজেরটা নিজে বহন করবে। **ইসলামের শরীয়তে** এভাবে

বলা আছে যে, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খারাপ আচরণ করে তাহলে স্বামী নিজেকে এর জন্যে দায়ী করতে হবে। নিজে নিজেকে বলতে হবে আমি যদি ভাল হতাম বা ভাল আচরণ করতাম তাহলে সে আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করতো না। যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী সালিহা বা মুমিনা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহন বৈধ হবে না। কোন ব্যক্তি তার পরিবারে প্রথম স্ত্রীর সাথে ন্যায় বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিবাহ করলে তা বৈধ হবে না। যদি সে মনে করে যে, তাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে পারবে তাহলে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। অধিকন্তু এটি স্বামীর বুদ্ধিমত্তার বিষয় ঐ কাজটি সম্পাদন না করা। স্ত্রী কোন কাজে বাহিরে যেতে চাইলে তার জন্য তা বৈধ, তবে সে তার শরীর ও মাথাকে ভাল করে কাপড় দিয়ে পরিধান করে নিতে হবে। অর্থাৎ শরীয়তের আলোকে বাহিরে যেতে পারবে। সুগন্ধি ও অলঙ্কার ব্যবহার করে নারীর বাহিরে যাওয়াটা ইসলামে হারাম। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত ও মূল্যবান বস্তুর মধ্যে একজন নেক্কার নারী হল তার স্বামীর জন্য উত্তম সম্পদ। **রিয়াদুন নাসিকিনের** মতে, কোন মুসলিম ব্যক্তি তার স্ত্রী সাথে নম্র ও আবেগ দিয়ে কথা বলে তাহলে তাকে নফল ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। সুরা নিসার অষ্টমতম আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, **"স্ত্রীর সাথে নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বা আচরণ করতে"**। হাদিসে এসেছে, **"হে আবু বকর, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হাসি মুখে ও নম্রভাবে কথা বলল তাহলে তাকে একটি দাস মুক্ত করার অধিক সওয়াব প্রদান করা হবে। এবং আল্লাহ্ তায়ালা ঐ নারীর প্রতি দয়া করবেন না যে কিনা একজন ফাসিক ব্যক্তিকে বিয়ে করল। এবং যে ব্যক্তি আমার সাফায়াত পাওয়ার আশা করে কিন্তু সে তার স্ত্রীকে তা প্রদান করে না সে ব্যক্তি ফাসিক। এবং ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল যে কিনা মানুষের নিকট ভাল। ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ যে কিনা মানুষের নিকট খারাপ। কোন মুসলমানকে আঘাত করার অর্থ হল কাবা শরীফকে সাত বার ধবংস করার চেয়েও অধিক খারাপ কাজ"**। **দুররুল মুখতার** গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন নারীর সাথে সহিহ পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। স্বামীর উপর তার স্ত্রীর জন্য **নাফাকা** বা ব্যয় করা ফরয। নাফাকা বলতে খাবার, পোশাকসহ যাবতীয় বিষয়কে বুঝায়, যাহা স্বামীকে তার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করতে হবে। তারা যে বাড়িতে বসবাস করবে তা স্বামীকে ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর কাছে তার আত্মীয়দেরকে ঐ বাড়িতে আসার জন্য বলতে পারবে, অনুরূপভাবে স্বামীও তার স্ত্রীকে তার আত্মীয়

স্বজন ঐ বাড়িতে আসার জন্য তার স্ত্রীকে বলে নিতে পারবে। অর্থাৎ তাদের উভয়ের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করতে হবে। বাড়িটি এমন হতে হবে যেখানে একজন নব মুসলিম দম্পত্তি ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে। যেখান থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভাল করে শুনা যায়। স্বামী তার স্ত্রীকে সপ্তাহে একদিন তার পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য বাধা প্রদান করতে পারবে না। এতে তার কোন অধিকার নাই। অনুরুভাবে স্ত্রীর পরিবারেরও সপ্তাহে একদিন তাদের মেয়েকে দেখার অধিকার আছে। যদি তার মাতা পিতার কেউ একজন অসুস্থ হলে স্বামীর আপত্তি থাকা সত্তেও তার মাতা পিতার সেবা করতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সুস্থ না হয়। স্ত্রীর মুহরিম আত্মীয় স্বজনদেরকে তাকে দেখতে আসার বা সে তাদেরকে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বাহিরে কোন খারাপ জায়গায় পাঠায় তাহলে উভয়েই গুনাহগার হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে সকল প্রকার কাজ থেকে রক্ষা করবে। যেমন বাড়িতে কিংবা বাহিরের কারো জন্য কাজ করা, কোন কিছু পরিশোধ করা। নারীর উচিত বাড়ির যাবতীয় কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকা, তার অলসভাবে বসে থাকা উচিত হবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে এমন সব স্থানে গমনের অনুমতি দেয়া উচিত হবে না যেখানে গেলে তার পর্দার সমস্যা হতে পারে । যেমন, বীচে ও যেখানে নারী- পুরুষ একসাথে খেলা উপভোগ করে। বাড়িতে এমন কোন টেলিভিশন সেট রাখা উচিত হবে না যার দ্বারা ঐ সকল প্রোগ্রামগুলো দেখা যাবে। স্ত্রীর ক্ষেত্রে নতুন কাপড় বা অলঙ্কার ব্যবহার করে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি নেই। সে ঐ সকল স্থনে যেতে পারবে যেখানে কোন হারাম কাজ সম্পাদন হয় না, এমনকি তারা যদিও তার মুহরিম আত্মীয় না হয়। মুহরিম আত্মীয় হওয়ার পরও নারী -পুরুষ সকলকে পৃথক পৃথক রুমে অবস্থান করতে হবে। একজন নারীর আঠারো জন **মুহরিম আত্মীয়** থাকে তারা হলেন তার বাবা, দাদা, পুত্র, নাতী, তার আপন ভাই, তার ভাই অথবা বোনের পুত্র আরো অনেকে। এই সকল ব্যক্তিরা তার মুহরিম আত্মীয় যারা দুধ পানের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। এমন চারজন ব্যক্তি আছে যারা বিবাহের মাধ্যমে তার সাথে মুহরিম আত্মীয় হয়েছে। তার শ্বশুর, তার পিতা, জামাতা, সৎপিতা, সৎ ছেলে। একজন ব্যক্তির ছেলের কন্যা জামাতা ও একজন মায়ের কন্যার জামাতা তাদের মুহরিম ব্যক্তি, তাদের সাথে বিবাহ করা হারাম। মুহরিম আত্মীয় বলতে এমন সব আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। অর্থাৎ যাকে বিবাহ করা যাবে না। যেমন,

একজন ব্যক্তির জন্য তার বোন তার জন্য মুহরিম। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু একজন ব্যক্তির ভাইয়ের স্ত্রী কিংবা তার পৈতৃক বা মাতৃ পক্ষের খালাতো বা মামাতো বোন যে কেউ হোক না কেন তাদের সাথে বিবাহ করেত পারবে। তারা হারাম নয়। তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে পারবে। তোমার খালাতো বোন কিংবা তার স্বামী তোমার জন্য হারাম নয়। তোমার স্বামী কিংবা স্ত্রীর সহোদররা তোমার জন্য মুহরিম নয়। সেই নারীর বোন অথবা খালার স্বামী অথবা তার স্বামীর ভাই তার নিকট নন মুহরিম। যাহা **নিয়ামত ইসলাম** নামক কিতাবে হজ্জের অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই সকল পুরুষের সাথে কোন স্ত্রীর কোন প্রকার পর্দা ব্যতীত দেখা বা সাক্ষাৎ করা বৈধ নয়। এমন কি পর্দার সহিত কোন নির্জন রুমে দেখা বা গল্প করা বৈধ নয়। অথবা তাদের সাথে কোন দীর্ঘ ভ্রমনে বাহির হওয়া। যদিও একজন নারীর পৈত্রিক কিংবা মাতৃক দিক থেকে সে তার জামাতা হয় তাহলেও তার সাথে বের হওয়া বৈধ হবে না। একজন নারী তার মুহরিম আত্মীয় কারো সাথে বিয়ে করতে পারবে না। তবে সে তাদের সাথে পর্দা করা ব্যতীত বসতে পারবে যা কিনা সে মুহরিম নয় এমন আত্মীয়দের সাথে কোন ভাবে বসতে পারবে না। এমনকি সে তাদের যে কোন একজনের সাথে গোপন কোন রুমে বসতে পারবে ও দীর্ঘ কোন ভ্রমনে বের হতে পারবে। মুহরিম নয় এমন কোন আত্মীয় তাদের বাড়িতে আসলে সে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তাকে স্বাগতম জানাতে পারবে এমনকি সে পর্দার সহিত তার সাথে কথাও বলতে পারবে এবং চা, কফি ও খাবার পরিবেশন করেতে পারবে। কিন্তু সে ওখানে বসতে পারবে না। মুসলিমদেরকে তাদের সমাজের প্রথা থেকে বের হয়ে ইসলাম কি বলে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার স্ত্রীকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা ও ইসলামের মাযহাবের যথাযথ অনুসরণ করানো। যদি সে ভাল করে শিক্ষা না করে তাহলে তার জন্য কোন শিক্ষিত মহিলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যাতে করে একজন মুমিন বা পরহেজগার নারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। যদি সে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন নারী না পায় তাহলে তারা দুইজন এক সাথে ইসলামের প্রাথমিক বইগুলো থেকে ইসলামের মধ্যে ঈমান, হালাল, হারাম, ফরজ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করবে। ঐ সকল বই থেকে যা আহলে সুন্নত কর্তৃক অনুমদিত। কোন মাযহাবের অনুকরণ করা ব্যতীত কোন বই কিংবা তাফসীর তাদের বাড়িতে স্থান দেয়া ও তা পড়ে আমল করা কোনভাবে উচিত হবে

না। ইসলাম কিংবা মুসলামদের জন্য ক্ষতির আশঙ্কা হতে পারে এমন কোন বস্তু যেমন রেডিও বা টেলিভিশন তার বাড়িতে আনা বৈধ হবে না। যা শয়তানের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এগুলো ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমুহ, ঈমান, আধ্যাত্মিকতা, সন্তান ও স্ত্রীর আচরণের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে, যা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। স্ত্রী ও কন্যাদেরকে বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাদের উচিত হবে না কল-কারখানা, ব্যংক, কোম্পানি কিংবা সামাজিকমূলক কোন কাজে চাকুরী করা। স্ত্রী কিংবা কন্যাদের তাদের বাবার বা স্বামীর চাকুরী অথবা ব্যবসায় সহযোগিতা করা। এই সব কাজ হচ্ছে পুরুষদের জন্য। মহিলাদের যাবতীয় আসবাব পত্র, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি তাদের অবিভাবকরা ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে আসবেন। এটা তাদের দায়িত্ব। আর যদি মহিলা তা করতে বাধ্য হয় তাহলে তার ঈমান, মৌলিক ইবাদাতসমুহ ও তার স্বাস্থ দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এইরূপ করলে তাদের দুনিয়া সম্পূর্ণভাবে ছারখার হয়ে যাবে। পরে তারা অনুশোচনা করলেও কোন উপকারে আসবে না। এমনকি এটি তাদেরকে তাদের পাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত দিতে পারবে না। কোন ব্যক্তি ইসলামের আলোকে বসবাস করতে চায় তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হবে। আমাদের উচিত ইসলামের বইয়ের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়া অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষায় নিজেদেরকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে ধর্ম পালন করা। আমাদের নিজেদেরকে শয়তানের শয়তানি থেকে নিজেদেরকে বাচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা অর্থাৎ শয়তান বা মুনাফিকের ফাদেঁ নিজেকে না জড়ানো। আমাদের নিজেদেরকে হারাম থেকে বাচাঁর পাশাপাশি আমাদের সন্তান ও কন্যাদেরকেও রক্ষা করতে হবে। তাদেরকে ইসলাম শিক্ষার জন্য ইসলামী বিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো উচিৎ।নারীকে পুরুষের পাশাপাশি দোকান, কলকারখানায় কিংবা ব্যংকে কাজ করার কোন দরকার নাই। যদি তার স্বামী না থাকে অথবা স্বামী কাজ করতে পারে না সেক্ষেত্রে তার মুহরিম ব্যক্তি তার সংসারের যাবতীয় কাজ করে দিবে। আর যদি তার আত্মীয়রা অসহায় হয় সেক্ষেত্রে ঐ দেশের সরকার তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করবে। আল্লাহ্ তায়ালা ঐ মহিলার সকল প্রয়োজন নিষ্পত্তি করে দিবেন। সে তার বসবাস করার বোঝা তার স্বামীর উপর দিয়ে দিবেন । যদিও নারীর জীবনযাপন করার জন্য তার হাতে কোন কাজ নেই। সে তার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ তাকে দিয়ে দিবে। নারীর দায়িত্ব বা কাজ হল বাড়ির ভিতরে। তার প্রথম ও প্রধান কাজ হল সন্তান লালন পালন করা। সন্তানের পথ প্রদর্শক হলেন

তার মা। সন্তান ইসলামের যাবতীয় মৌলিক জ্ঞান তার মা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাহলে ঐ সন্তান শয়তানের বা অন্য কারো প্ররোচনায় যেমন মুনাফিক কিংবা জিন্দিকের দ্বারা কখনো বিপদগামী হবে না। সে একজন সত্যিকারের মুসলামানে পরিণত হবে তার পিতামাতার মত। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **ইন্দলেস ব্লিস** কিতাবে দেখার জন্য বলা হয়েছে। ঐ ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হয়, যে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য গোপনে কার্যক্রম পরিচালিত করে। তাকে **জিন্দিক**ও বলা হয়।

মৃত ব্যাক্তির কাফন, দাফন ও জানাযার নামায

মুসলিম মৃত ব্যক্তি বা মুর্দাকে গোসল করানো, কাফনের কাপড় ও জানাযার নামায, তার দাফন সম্পাদন করা ফরযের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে (মুর্দা) গোসল করানোর পর কাঠের কিংবা মার্বেলের তৈরি খাটিয়া (মুর্দা বহনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন খাট) মাধ্যমে বহন করে সমাহিত করা। মৃত্য ব্যক্তির শার্ট খুলার পর তাকে ওযু করিয়ে দিতে হবে। তারপর শরীরের উপরের অংশ তথা মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত কুসুম পানি দিয়ে ধৌত করে দিতে হবে। নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশটা আবৃত রেখে পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কারকারী ব্যক্তির পরিষ্কারের সময় তার ডান হাতে গ্লোবস লাগিয়ে নিতে হবে। গ্লোবস লাগানো হাত দিয়ে আবৃত জায়গা পরিষ্কার করতে হবে। পরে মৃত ব্যক্তির অপর পিঠও একইভাবে গ্লোবস লাগান হাত দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। কাফনের তিনটি কাপড় থেকে একটি খাটিয়ার উপর প্রসারিত করতে হবে তার উপর মুর্দাকে শোয়াতে হবে। তারপর ঐ কাপড় দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আবৃত করে দিতে হবে। অতঃপর মুর্দাকে কফিনে স্থানান্তর করতে হবে। কাফন কাপড় তিন প্রকারের হয়ে থাকে। কাফনে ফরয যাকে কাফনে জুরুরতও বলে, কাফনে সুন্নত, কাফনে কিফায়া। কাফনে সুন্নত পুরুষের জন্য যা তিনটি নিয়ে গঠিত আর মহিলাদের জন্য পাঁচটি নিয়ে গঠিত। কাফনে কিফায়া পুরুষের জন্য যা দুইটি নিয়ে গঠিত এবং কাফনে কিফায়া মহিলাদের জন্য যা তিনটি কাপড় নিয়ে গঠিত। **বাহর উর-রাফিকে** বলা হয়েছে যে, ইজার, লাফিফা এবং হিমার মহিলাদের জন্য কাফনে কিফায়া। মহিলারা যখন জীবিত থাকবে তখন তাদেরকে অবশ্যই এতিন প্রকারের কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে হবে। ইজার, বয়স্ক মহিলাদের জন্য যা দিয়ে

শরীরের মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করবে। ইবনে আবেদিনের মতে, লাফিফা হল মহিলাদের জন্য কামিস। অর্থাৎ মহিলারা যখন বাড়ির বাহিরে যাবে তখন তা পরিধান করে থাকে। **দুরুল মুওতাকাতে** লিখা হয়েছে, পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য নাফাকা তথা কাপড়, খাবার থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যয়ভার সরবরাহ করবে। কাপড় বলতে এখানে হিমার (হিজাব) এবং মিলহাফা বুঝানো হয়েছে। যা সাধারণত নারীরা বাহিরে পরিধান করে। বর্তমান সময়ে যাকে ফেরাযা, মানতো বা ছায়া বলা হয়। অর্থাৎ মহিলাদের কাপড় তিন ভাগে হয়ে থাকে। যা সারশাফের ক্ষেত্রে হয় না। সারশাফ মুলত আধুনিকতা হিসেবে পরবর্তীতে আবিষ্কৃত করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে সারশাফ পড়তে কোন সমস্যা হবে না ঐ সকল স্থানে যেখানে তার প্রচলন বা প্রথা চালু আছে। যেখানে গুনাহের কোন আশংকা থাকবে না। নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক করে উপস্থাপন করা নিজেকে আকর্ষণ করানোর জন্য সারশাফ পরিধান করা ফিতনার কারণ হতে পারে। যা ইসলামে হারাম করা হয়েছে। কাফনে ফরয হল, মহিলা ও পুরুষের জন্য একটি কাপড় নিয়ে গঠিত কাফনের কাপড়। কোন প্রকার উপাদান ব্যবহার করা ব্যতীত সাধারণ মানের সিল্ক কাপড়, যাহা পুরুষের জন্য একটি ও মহিলাদের জন্য দুইটি কাপড় নিয়ে গঠিত। জানাযার নামাযের ইমাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। আর তাযদি সে মুসলমান হয়, শহরের বিচারক, জুমার নামাযের খতিব ও সর্বশেষ ওয়ারিশ কর্তৃক নিযুক্ত ইমাম। ইমামে হাই কিংবা জানাযার নামাযের ইমামতি করবেন ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। অর্থাৎ যখন সে জীবিত ছিল। পরে তা ওয়ারিশের উপর নির্ভর করবে, চাইলে সে নিজেই ইমামতি করতে পারবে। আর যদি সে অনুপস্থিত থাকে তাহলে এমন ব্যক্তি নামায পড়াবে যে উপরোক্ত লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না এক্ষেত্রে ওয়ারিশের যা চায় তাই করতে পারবে। অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে নামায সম্পাদন করাতে পারবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত **ইন্দলেস ব্লিস** নামক গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত দেয়া আছে। কোন ব্যক্তির মৃত দেহের অর্ধেক অংশ পাওয়া গিয়েছে বাকি অংশ পাওয়া যায় নাই তাহলে মৃত ব্যক্তির ঐ অংশের জন্য জানাযার নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। আবার কোন ব্যক্তির মৃত দেহের অংশ ছোট ছোট আকারে পাওয়া গিয়েছে তাহলে তার জন্য জানাজার নামায লাগবে না। আর যদি সবগুলোকে একসাথ করা হয় তাহলে তার জন্য নামায আদায় করতে হবে। কোন ব্যক্তির মৃতদেহকে বা মুর্দাকে গোসল করানোর পর সমাহিত করার জন্য নেওয়া

হয়েছে এই মুহূর্তে বলা হল যে মুর্দার একটি হাত ধোয়া হয় নাই তাহলে তা ধোয়ার পর তাকে সমাহিত করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, জানাযার নামায সম্পাদন করার পর সমাহিত করার জন্য কবরে আনা হল, তখন বলা হল তার একটি হাত ধোয়া হয় নাই তাহলে তার ঐ হাতটি পরিষ্কার করে নামায আদায়ের পর তাকে দাফন বা সমাহিত করতে হবে। আর যদি মুর্দাকে দাফন করার পর বলা হয় তাহলে আর মুর্দাকে কবর থেকে উঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি মুর্দাকে বাহিরে কোথাও পাওয়া গিয়েছে ও তাকে গোসল করানো হয় নাই এমনকি সমাধিও হয় নাই তাহলে অবশ্যই তাকে গোসল করানোর পর দাফন করতে হবে। আবার কোন মুর্দাকে তায়াম্মুম করে গোসল করানোর পর যদি পানি পাওয়া যায় তাহলে তাকে ইচ্ছা করলে দাফন বা আবার পুনরায় পানি দিয়ে গোসল করাতে পারবে।

কোন শহরে একসাথে অনেকগুলো মানুষ মারা গেলে তাদেরকে ইচ্ছা করলে এক সাথে জানাযার নামায পড়ে দাফন করা যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে নামায সম্পাদন করতে পারলে। জানাযার নামাযের জন্য নিয়্যত অবশ্যই এভাবে করতে হবে, **"আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মৃত মুসলিম ব্যক্তিটির কল্যাণের জন্য এ ইমামের পিছনে চার তাকবীরের সহিত জানাযার নামায আদায় করছি"**। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা যাত্রীকে অপহরণ করার কারণে গ্রেপ্তার করা হল বিচারক অথবা তার অভিভাবক তাকে হত্যার আদেশ দিল, দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে হত্যা করা হয়েছে কিংবা এমন ব্যক্তি যে তার মাতাপিতাকে হত্যা করেছে তাহলে এই তিন ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায সম্পাদন করা যাবে না। **দুররুল মুখতারের মতে,** আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায পড়া যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে।

সুন্নি মুসলিমের ১০ টি বৈশিষ্ট্যঃ

১। সুন্নি মুসলিম সব সময় মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

২। সে ঐ ইমামের পিছনে জামাতের সাথে নামায সম্পাদন করবে যে ইমাম ফাসিক কিংবা খারাপ কোন গুণাবলীর অধিকারী না হয়।

৩। সে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ জানবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে।

৪। সে কোন সাহাবায়ে কেরামের নিন্দা করবে না।

৫। সে দেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহ করবে না।

৬। সে ধর্মীয় কোন বিষয়কে সামনে রেখে কোন প্রকার সংগ্রাম কিংবা মারামারি করবে না।

৭। সে নিজের মধ্যে ধর্মের বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করবে না।

৮। ভাল কিংবা মন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।

৯। সে মুসলামানদের মধ্যে তাদের কিবলা সম্পর্কে কোন প্রকার বিভ্রান্ত প্রচার করতে পারবে না।

১০। সে সকল সাহাবীদের মধ্য থেকে চারজন খলীফাকে তথা হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলী (রাঃ) কে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে

হে গরীব ও দুর্বল প্রাণী, তুমি মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য যত দূরে যাও না কেন মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করবে। তোমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। সে বলবে, আমি যদি তার নিকটবর্তী হই তাহলে হতে পারে সে আমার কাছে কোন রোগ হয়ে আসত। অথবা যখন কোন সংক্রামক মহামারী, মারাত্মক কোন রোগ তোমার উপর আসে তাহলে তুমি অন্য কোথাও পলায়ন করতে এবং তা তোমাকে আর আক্রমণ করতে পারবে না এই জাতীয় কাল্পনিক ধারনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হারাম। কোন প্রকার রোগ তোমার উপর তখনই বর্তাবে যখন আল্লাহ্‌ ইচ্ছা পোষণ করবে অন্যথা নয়। ওহে দুর্বল জাতের প্রাণী, কোথায় তুমি পলায়ন করছো? মৃত্যু হচ্ছে তোমার সর্বশেষ ঠিকানা। যা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এক সেকেন্ডের জন্যেও তা মুলতবী করা হবে না । যখন তোমার মৃত্যুর ফরমান আসবে আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাকে চোখের পলক নেওয়ার জন্য কোন প্রকার অবকাশ দিবেন না। অর্থাৎ যখন তোমার মৃত্যুর সময় হবে তখন তা এক সেকেন্ড আগে কিংবা পরে হবে না। যথাসময়ে তোমার জান কবজ করে নেওয়া হবে। মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে রেখেছেন। ঐ ব্যক্তি তার অর্জিত

সকল সম্পত্তি, পরিবার ও সন্তানদের রেখে ঐ স্থানে চলে যাবেন। কিন্তু তার আত্মাকে বাহির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ মাটির ভিতরে প্রবেশ না করবে যে মাটি তার জন্য অপেক্ষা করতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করবে। সুরা আরাফে চৌত্রিশ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, **"যখন তাদের সময় ফুরিয়ে আসবে তখন মৃত্যু এক সেকেন্ড আগে বা পরে আসবে না। ঠিক সময়ে আসবে"**। মানুষ জন্ম নেওয়ার পূর্বে তার হায়াত নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে কত বছর সে দুনিয়ায় বসবাস করবে। যাহা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কোথায় সে মৃত্যুবরণ করবে। সে কি তাওবা কিংবা তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে, বা কোন রোগের মাধ্যমে তার মৃত্যু হবে, এমন কি সে ঈমান কিংবা ঈমান ব্যতীত মৃতুবরণ করবে সব কিছু সেখানে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সুরা লোকমানের শেষ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন অনুরূপভাবে তার জীবনও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই অনুসারে তিনি আমাদের রিজিক সৃষ্টি করে তা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা জানেন যে, তুমি কত নিঃশ্বাস এই দুনিয়াতে নিবে সেই অনুসারে তিনি তা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। ফেরেশতারা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। আর যখন সময় পরিপূর্ণ হয়ে যায় ফেরেশতারা তখন তা মালাকুল মাউতকে জানিয়ে দেয়। যদি তুমি তোমার পুরো জীবনটাকে কুরআনে বর্ণিত আদেশের আলোকে পরিচালিত করো, তদানুযায়ী আমল করো তাহলে তুমি একজন সুখী মানুষ হবে। সব কিছু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এই কথা বিবেচনা করো। যে মারা গিয়েছে তার জন্য কান্নাকাটি করো না। এরূপ করলে ব্যক্তি ঈমান ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ তায়ালার উপর সবসময় ভরসা রাখ। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যখন কোন প্রকার গুনাহ হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে তাওবা করে ফেল।

আল্লাহ্ তায়ালা জিবরাঈল (আঃ) কে আদেশ করবেন,**"আমার বন্দুদের জান (আত্মা) সহজ করে কবজ কর, আর আমার শত্রুদের জান রূঢ়ভাবে কবজ কর"**। আউজুবিল্লাহ, যদি কোন ব্যক্তি অবিশ্বাসী হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে এ অবস্থা হবে। ভবিষ্যতে একদিন হাজার কিংবা পঞ্চাশ বছরের সমান দিন হবে। এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আল কুরআনে সুরা সেজদার পঞ্চম ও সুরা মেরাজের চতুর্থ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের জান নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কঠিন হবেন। আর এই সম্পর্কে খুব

কম বর্ণনা রয়েছে। আমাদের উচিত আল্লাহ্কে বিশ্বাস করা। যিনি আমাদেরকে সামান্য একটা বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন। কিছু মৃত্যু মানুষকে মোচড় দেয় যার ফলে তারা বসন্তের মত একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাক আবর্তন করে। সুরা নাজিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ফেরেশতারা ঐ সকল লোকদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে। ঐ সুময় তারা একে অপরের সাথে কথা বলতে থাকে। কিন্তু জিবরাঈল (আঃ) তদেরকে এই বলে আদেশ করেন যে তাদের উপর কোন প্রকার দয়া করবে না। মুনাফিকের আত্মা তার নাসিকার উপর চলে আসবে। অতঃপর ফেরেশতা তা আলগা করে ফেলবেন। অতঃপর তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমন করে চাপ দিবেন যে সে তার চোখের আলো হারিয়ে ফেলবেন। তখন ফেরেশতারা তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতবাসী নও। তুমি কি ভুলে গিয়েছ নাকি জীবিত অবস্থায় কোন ধরণের কাজ সম্পাদন করেছিলে। ওহে হতভাগা ব্যক্তি, তোমার জন্য ঐ সকল আজাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে যাহা কিনা মুনাফিক কিংবা অবিশ্বাসীদের জন্য রাখা হয়েছিল। এটা এ জন্যে যে তুমি দুনিয়াতে নামায, রোযা, যাকাত, সাদাকাত কিংবা মানুষকে দয়া কিছুই কর নাই। তুমি কোন প্রকার পাপ কাজ কিংবা হারাম কাজ পরিত্যাগ করনি। তোমাকে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য বলা হয়ে ছিল কিন্তু তুমি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও তা সম্পাদন করনি। আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণনা করেন যে, **"মুনাফিকরা এক দিনের জন্যও মৃত্যুর কথা চিন্তা করেনি, তারা সব সময় অহংকারীসুলভ আচরণ করতো। তারা কোন প্রকার নামায, সুন্নত বা ওয়াজিব কোন কাজ করে নি। তাই আজ তাদেরকে আমার আযাব বা নির্যাতন দেখতে দাও"**। পুনরায় আযাবের ফেরেশতা তার নখগুলোকে উপড়িয়ে ফেলবেন, তার শরীর থেকে আত্মাকে আলাদা করে নিবেন। এভাবে সে বার বার করতে থাকবে। আবার তা পুনরায় আগের জায়গায় চলে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালা পুনরায় আবার বলবেন। **"কোন নবী বা রাসুল কি কিছু বলেনি, আমাদের কিতাব কি তিলাওয়াত করোনি? তোমাদেরকে কি বলা হয় নাই যে অজ্ঞতাবশত কোন প্রকার কাজ করিও না এবং শয়তানকে অনুসরণ করিও না? এমনকি একথা বলা হয়নি যে সব কিছু মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি সব কিছু জানেন"**। দুনিয়ার সাথে মিশিয়ে যেওনা যা কিনা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা যা দিয়েছেন তার সাথে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তায়ালা যা দিয়েছেন তা থেকে গরীব মিসকিনদের সাহায্য করার চেষ্টা করা। সার্বভৌমত্যের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। তিনি

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাকে তিনি রিযিক দান করেন। যদি কোন প্রকার রোগ তোমার উপর আসে তাহলে তার নিকট প্রার্থনা করবে তা থেকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু একথা বলা যাবে না যে আমাকে ডাক্তারকে বিনিময় দেওয়ার কারণে সে আমাকে ভাল করে দিয়েছে। একথা বলতে হবে যে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে রোগ থেকে উদ্ধার করেছে। যে সম্পত্তি তুমি তোমার বলে দাবি করছো তা মূলতঃ তোমার উপকারের স্বার্থে দান করা হয়েছে। এটা তোমার রোগ কিংবা দুঃখ কষ্টের প্রতিকারের জন্য নয়। যদি তোমার ঐ সম্পদ হালাল পন্থায় উপার্জন হয় তাহলে তা তুমি ব্যবহার করতে পারবে। আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করার মাধ্যমে তুমি তা গ্রহণ করতে পারবে। কোন প্রকারের সাহায্য তোমার সম্পদ, সন্তানাদি ও তোমার বন্ধুদের থেকে আসে না। সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। এমনকি তুমি যত চেষ্টা করো না কেন তুমি তোমার মৃত্যু থেকে কোনভাবে পলায়ন করতে পারবে না । অথবা পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থান করো না কেন তা তোমাকে গ্রাস করবে । সর্বশেষ তোমাকে ঐ স্থানে মাটি দিয়ে দাফন কর হবে যা তোমার সর্বশেষ স্থান কবর হিসেবে পরিচিত। যখন তোমার মৃত্যুর সময় হবে কেউ তোমাকে ক্ষতি করতে পারবে না । একমাত্র তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঐ ভয়ঙ্কর নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করার। আর এটা করতে পারলে তোমার কষ্ট কিংবা যাতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে সুস্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও সন্তান দান করেছেন। তুমি তখন আনন্দ চিত্তে তাদেরকে বলছো, আমাদের উপর দয়া করেছেন। আর যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোন প্রকার রোগ কিংবা অন্য কিছু দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করেছেন তখন তুমি আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করার পরিবর্তে ক্রোধ প্রকাশ করো তার যাবতীয় দয়া ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা ভুলে যাও। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, **"ও আমার ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করো"**। ফেরেশতারা তার রুহকে তার শরীরের নীচ থেকে চুল পর্যন্ত স্থানগুলো থেকে কবজ করবে। আল্লাহ্ তায়ালার আজাব থেকে কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। যখন মুর্দা ব্যক্তিকে খাটের উপর শুয়ে রাখা হবে তখন সে যন্ত্রণায় বিলাপ করতে করতে বলবে, আমি যদি জীবিত থাকা আবস্থায় দুনিয়ার জীবনে নিজেকে ইসলাম অনুযায়ী আমল করতে পারতাম তাহলে আমার অবস্থ এরূপ হতো না। অর্থাৎ আমি এখন নির্যাতন ভোগ করতাম না। ঐ অবস্থায় আল্লাহ্ তায়লার বানী, **"ও হে আমার অহংকারী বান্দারা, যাও তোমার এই সব বন্ধুদেরকে তোমার সম্পদের মাধ্যমে রক্ষা কর। দুনিয়ার

জীবনে আমার পক্ষ থেকে যাওয়া কোন প্রকার রোগকে ভালভাবে গ্রহণ করোনি বা আমার কাছে সাহায্য চাওনি বরং আমার প্রতি অভিযোগ করেছো। এখন ঐ বান্দাহ নিপীড়নের মধ্যে আছে ও তার আত্মা যাবতীয় আযাবের স্বাদ নিচ্ছে। এটাই আমার শক্তি"**। ফেরেশতারা তার এই কথাটি শুনবে ও তাদেরকে উপর করে শুয়ে রেখে বলবে, হে আমাদের প্রভু আপনার আযাব সত্য। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এই সম্পর্কে কুরানুল কারিমে বিস্তারিত জানিয়েছেন। অতঃপর আরেকটি আদেশ আসবে তার পক্ষ থেকে এই বলে তাকে পাকড়াও করো। তাদের পাকড়াও এমন কঠিন হবে যে শরীরের প্রত্যেক স্থানে তার ব্যথা অনুভব হবে। ফেরেশতারা তাদেরকে চিৎকার সম্বোধন করে বলবে, হে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারীরা, প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আজ হচ্ছে তোমাদের জন্য আজাবের দিন। কেননা তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করেছ। দুনিয়াতে তুমি অহংকারী ছিলে। গরীব আর মিসকিনদের সাথে খারাপ আচরণ করতে ও হারাম কাজ সম্পাদন করতে এমনকি সত্য মিথ্যার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করতে না। এই সকল বিষয়ে কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি ফেরেশতাকে এক মুহূর্তের অবকাশের জন্য অনুমতি চাইবে যাতে করে সে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে। সে দেখতে পারবে ফেরেশতা তার পাশে বিদ্যমান। সে আরও দেখতে পারবে যে ফেরেশতা তার উপর পূর্বের শাস্তির কথা ভুলে গিয়ে আবার অমানসিক নির্যাতন শুরু করে দিবে। ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি আজ এখানে কেন? সে বলবে তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমাকে এখানে নিয়ে আসছ। তারা বলবে তোমার রেখে আসা সম্পত্তির কি হল। তার মালিক তোমার সন্তানরা ও তোমার নিকট আত্মীয়রা পেল। তোমার কি উপকার হল তাতে। যখন সে মৃত্যু সম্পর্কে ফেরেশতাদের থেকে এই সব কথা শুনতে পাবে তখন সে এদিক সে দিক ঘুরতে থাকবে কি করবে সে নিজে বুঝতে পারবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ রাসুল ইরশাদ করেন। **"যখন সে ফেরেশতাকে শুনতে পাবে বা দেখতে পাবে সে তার চোখের সামনে একটি ওয়াল দেখতে পাবে। যেখানে সে নিজেকে দেখার পূর্বে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পাবে"**। সে যখন তার ডান পাশে তার মৃত্যু দেখতে পাবে সাথে সাথে সে বামে তাকাবে সেখানেও সে তার মৃত্যু দেখতে পাবে। ফেরেশতা চিৎকার দিয়ে বলবে আমি সেই ফেরেশতা যে কিনা তোমার মাতা পিতার রুহ কবজ করেছি। তাদের পর এখন তোমার রুহ নেওয়ার জন্য এসেছি। তোমাকে তোমার আত্মীয় স্বজনরা অনেক সাহায্য সহযোগিতা

করেছে কিন্তু কোন প্রকার কাজে আসেনি। আমি অনেক শক্তিশালী ফেরেশতা যে কিনা তোমার পূর্বে তোমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী লোকদের রুহ কবজ করেছিলাম। মৃত্য ব্যক্তিকে খাটিয়ায় শোয়ানোর সময় সে ফেরেশতার সাথে কথা বলতে থাকবে। ঐ সময় আজাব দানকারী ফেরেশতারা তাকে ত্যগ করে চলে যাবে। যখন সে দেখতে পাবে জিবরাঈল (আঃ) তার ফেরেশতাদেরকে আজাব প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিচ্ছে তা দেখে সে ঐ মুহূর্তে আরও ভয় পেয়ে যাবে যে সামনে তার জন্য কি অপেক্ষা করতেছে । জিবরাঈল (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করবে, দুনিয়া থেকে তুমি কি পেলে? সে বলবে দুনিয়া থেকে আমি প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই পাই নাই। আমি যদি ভাল কাজ করতাম তাহলে আমার আজ এই অবস্থা হতো না। অতঃপর ফেরেশতারা তার সামনে তার অর্জিত সম্পদ উপস্থাপন করবে। ঐ সকল সম্পদ যা সে দুনিয়াতে হালাল হারামের পার্থক্য ছাড়া অর্জন করে ছিল। তার পর তার সম্পত্তি তাকে বলতে থাকবে**" ওহে অবিশ্বাসী বান্দা, তুমি আমাকে অর্জন করে ছিলে এবং তা কোন প্রকার যাকাত কিংবা সাদাকাত প্রদান ব্যতীত নিজের জন্য ব্যয় করেছিলে। আর এখন আমি তোমার কোন কাজে আসবো না। যে সব লোকদের তুমি অপছন্দ করতে আমি এখন তাদের হয়ে গেলাম। তারা আমাকে তোমার কোন কৃতজ্ঞতা ছাড়া পেয়ে গেল"**। ঐ অবস্থায় সে তার চার দিকে তাকাবে এবং দেখবে সকল কিছু তার বিপরীত। তখন সে আরও ভেঙ্গে পড়বে। ঐ অবস্থায় শয়তান একটি পাত্র নিয়ে হাসতে হাসতে তার পাশে আসবে তার ইমানকে চুরি করার জন্য। সে ঐ পাত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা পানিকে ঝাকুনি দিয়ে তার পাশে আসবে। আর ঐ অবিশ্বাসী ব্যক্তি তাকে দেখতে পাবে কিন্তু কিছুই করার থাকবে না । শয়তান তখন হাসতে থাকবে। এটা হচ্ছে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত যা কিনা হঠাৎ করে ধনী হওয়া ব্যক্তির তার গরীব বন্দুর সাথে আচরণের মত। যদি ঐ ব্যক্তি সাদাত না হয় তাহলে সে শয়তান কে বলবে আমাকে একটু পানি পান করতে দাও। সে বলবে আল্লাহ্ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা নয় একথা বললে দিবো। মৃত ব্যক্তি যদি তখনও নিজেকে ঈমানের কাছাকাছি হওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে তাহলে হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর যদি শয়তানের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে তাহলে আগের মত অবস্থা বিরাজ করবে। যদি হিদায়াত আসে তাকে উদ্ধারের জন্য তাহলে সে অভিশপ্ত শয়তান কিংবা তার পানিকে প্রত্যাখ্যান করবে। যদি কোন ব্যক্তির সময় শেষ হয়ে যায়, এবং সে যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে জিবরাঈল (আঃ)

তার রহমতের ফেরেশতাদেরকে তার রুহ শরীর থেকে বাহির করার নির্দেশ দেন। তিনশত ষাট জন রহমতের ফেরেশতারা তার রুহকে জিবরাঈল (আঃ) এর হাত থেকে গ্রহণ করবে। তার এই রুহকে তারা জান্নাত পরিদর্শন করিয়ে পুনরায় আবার সেখানে নিয়ে আসবে যেখানে তাকে দাফন করানো হবে। আর যদি সে ঈমান ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তাহলে তিনশত ষাট জন ফেরেশতা তার রুহকে জাহান্নামের ঝাক্কুম নামক গাছ পরিদর্শন করাবে। যা কিনা আল কাতরার চেয়েও কাল। আর তার আত্মাকে মোড়িয়ে রাখা হবে। জাহান্নাম পরিদর্শন শেষে তাকে সেই স্থানে আনা হবে যেখানে তাকে সমাহিত করা হবে । যদি কোন ব্যক্তি বালেগ হওয়ার পর দুনিয়াতে দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন আদেশ পালন না করার পাশাপাশি তাওবাবিহীন মৃত্যুবরণ করল তাহলে তাকে সকল প্রকার শাস্তির মুখামুখি করানো হবে। এবং জাহান্নামে তার জীবন স্থায়ী হবে। একমাত্র রাসুল এর শাফাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা যদি তাকে হিদায়াত দান করেন তাহলে সে সেখান থেকে রক্ষা পাবে। অন্য কোনভাবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। এই বিষয়ে **ইন্দলেস ব্লিস** নামক গ্রন্থের পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

শিশু মৃত্যু সম্পর্কেঃ

যখন কোন মুসলিম শিশুর অসুস্থ হওয়ার পর মৃত্যু হয় তখন মাকামে ইলিইয়্যিনে তার বাসস্থান হয়। জান্নাত থেকে তিন শত ষাট জন ফেরেশতা এসে শিশুর সামনে লাইনের মধ্যে দাড়িয়ে থেকে বলে ওহে মাসুম মুসলিম, সুখবর তোমার জন্য। আজকের দিনটি হল তোমার অতীতে যাবতীয় হিসাব, তোমার মাতা পিতা, দাদা দাদি ও প্রতিবেশী সকলের জন্য তোমার রবের সাথে সাক্ষাতের দিন। অতঃপর এক শত ফেরেশতা শাফায়াতের একটি মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দিবে। অন্য একশত জন ফেরেশতা এটাকে ভালবাসার মুকুট হিসেবে পরিণত করবে ও বাকি একশত ফেরেশতা ঐ মুকুটকে চাড়ের পোশাক এবং শক্তিতে রূপান্তরিত করবে।অন্য ষাটজন ফেরেশতা তার চোখ থেকে পর্দা কিংবা বাধা জাতীয় যা আছে তাকে সরিয়ে দিবেন। আর এতে করে সকল প্রকার পর্দা কিংবা বাধা তার সামনে থেকে নিমিষেই চলে যাবে। যার ফলে সে এর মাধ্যমে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তার মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন ও সকল বিশ্বাসী এবং

অবিশ্বাসীসহ সবাইকে দেখতে পারবে। যখন সে তাদের অবস্থা এই যাবতীয় অবস্থা দেখতে পারবে তখন সে হাসবে ও কাঁদবে অর্থাৎ হাউমাউ করতে থাকবে। তাই মানুষের মধ্য থেকে যারা ভিতরের অবস্থাকে বুঝতে পারবে না তারা মৃত্যুর পরবর্তী আজাব কিংবা নিয়ামত সম্পর্কে কিছুই অনুধাবন করতে পারবে না। যখন ফেরেশতা তার রুহ নেওয়ার মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য আসবে তখন তারা তার মাথায় শাফায়াতের মুকুট দেখতে পেয়ে কিছুই বলার সাহস করবে না। বরং তারা এত টুকু বলবে, ওহে মুসলমান মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তোমার নিকট সালাম প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, আমি এটাকে সৃষ্টি করেছি ও আমার কাছে পুনরায় নিয়ে এসেছি । এজন্যে যে, আমি তাকে রুহ প্রদান করেছি ও পুনরায় তা আমার দিকে নিয়ে এসেছি। এখন আমি তার প্রাপ্য হিসেবে জান্নাতে প্রেরণ করব। যদি তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস না কর তাহলে তোমার চেহারাকে জাহান্নামের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন তুমি নিজেকে দেখতে পাবে। অতঃপর শিশু ফেরেশতা ও মহান আল্লাহ্ তায়ালার বিশাল ত্বকে দেখতে পাবে। তার চোখে ভয়ের ছাপ ও মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠবে। তারপর রুহ তার কাছে জানতে চাইবে হে মাসুম ফেরেশতারা, তোমার রুহ তোমাকে কেন সমর্পণ করছেনা । শিশু ফেরেশতাদেরকে বলবে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমার মাতা-পিতা ও আত্মীয় -স্বজনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করার জন্য আবেদন করো। ফেরেশতারা আল্লাহ্কে বলবে, হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আপনি জানেন আমরা শিশুটির সাথে কিরূপ আচরণ করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, আমি আমার ক্ষমতা বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।তখন ফেরেশতারা শিশুটির কাছে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার কামনা কবুল করেছেন এই বিষয়ে সংবাদ দিবে এবং বলবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে যাদের ঈমান ছিল তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। শিশুটি আনন্দের সাথে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে। আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাত থেকে তার জন্য দুইটি হুর পাঠাবেন। তারা তার মাতা-পিতার মত তাদের বাহু উন্মুক্ত করে তাকে আহ্বান করবে হে আমাদের সন্তান, আমাদের সাথে আসো, আমরা তোমাকে ছাড়া জান্নাতে বসবাস করতে পারব না। তারা জান্নাত থেকে তাদের হাতে করে একটি আপেল নিয়ে এসে বলবে তুমি এটি গ্রহণ করো। যখন শিশুটি আপেলের ঘ্রাণ নিতে তখন জিবরাঈল (আঃ) তার জান সেকেন্ডের মধ্যে কবজ করে নিবেন আর সে জান্নাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

আরেক বর্ণনায় আছে, শিশুকে একটি আপেল খেতে দেয়া হবে। যখন সে তা খেতে শুরু করবে তখন শিশুটির জীবন ঐ আপেলের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। জিবরাঈল (আঃ) ঐ আপেল থেকে তার রুহ কবজ করে নিবেন। উভয় বর্ণনার সত্যতা রয়েছে। অতঃপর ফেরেশতারা তার রুহকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রুহ জান্নাতে যাওয়ার সময় জাহান্নামও দেখতে পারবে। বিশাল আকারের একটি দেশ যা কিনা বিভিন্ন ধরণের সবুজ মনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যখন তারা সেখানে পৌছবে শিশুটি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে তোমরা আমকে এখানে কেন নিয়ে এসেছো । ফেরেশতারা বলবে, হে মাসুম, এটি হচ্ছে হাসরের ময়দান। এখানে প্রচুর গরম। যেখানে সত্তর হাজারেরও বেশী দয়া ধারণ করে আছে। রাসুল সেখানে দাড়িয়ে থাকবেন। তাকে বলা হবে নুরের গ্লাসের দিকে তাকাও, যখন তোমার মাতা পিতাকে কিয়ামতের দিন এখানে আনা হবে, তুমি গ্লাস গুলোকে পানি পূর্ণ করে তাদেরকে পান করার জন্য দিবে। তাদেরকে সেখানে পাকড়াও করে রাখা হবে সামনে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। সর্বশেষ তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নেওয়া হবে ও যাবতীয় পাপ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত করা হবে। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করবে তাদের জন্য যাতে করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এবং শুক্রবারের রাতে তুমি দুনিয়ার আকাশে আসবে। যখন তুমি সেখানে পোঁছবে মহান আল্লাহ্ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদের প্রদান করা সালাম গ্রহণ করবে। এবং তাদের কে নুর দিয়ে ভরিয়ে দিবেন ও আল্লাহ্ তায়ালার কৃতজ্ঞতায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ফেরেশতারা শিশুটির রুহকে এই সকল স্থানে ভ্রমন করানোর পর তাড়াতাড়ি তার মৃত দেহের কাছে নিয়ে আসবে। অতঃপর তার জানাজার নামায সম্পাদন করা হবে ও তাকে সমাহিত করা হবে এবং কবরে তাকে যাবতীয় প্রশ্ন করা হবে। আর শিশুটির আত্মা কবরের উপরে অবস্থান করবে। যদি তার মাতা পিতা ঈমান ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তাহলে শিশু ও তাদের মাঝ বরাবর একটি দেয়াল করে দেয়া হবে। তাই শিশুটি তাদেরকে দেখতে পারবে না ও কোনভাবে তাদের সাথে সাক্ষাৎও করতে পারবে না। কিন্তু তারা দূর থেকে একে অপরকে দেখতে পারবে। এই সকল বিষয় হচ্ছে মুসলিম শিশুর ক্ষেত্রে যারা বালেগ হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন।

মুসলিম নারীর মৃত্যু সম্পর্কে

যদি কোন নারী গর্ভাবস্থায়, প্লেগ, অভ্যন্তরীণ কোন রোগের কারণে অথবা কোন প্রকার রোগ ছাড়া মৃত্যু বরণ করে অথবা সাধারনভাবে তার মৃত্যু হয়, আর সে যদি তার দুনিয়ার জীবনে কোন প্রকার পর্দা লজ্ঘন করেনি কিংবা তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকে তাহলে ঐ অবস্থায় জান্নাত থেকে ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করার জন্য আসবে। প্রথমে তার থেকে অনুমতি নিয়ে তারা তাকে বলবে, ওহে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দী, প্রস্তুতি নাও। তুমি দুনিয়াতে এমন কি কাজ সম্পাদন করেছো যার জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। ও তোমার রোগের কারণে তোমার সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবং তিনি তোমাকে জান্নাতি হিসেবে কবুল করেছেন। প্রস্তুতি নাও ও আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ কর। তখন মহিলা দেখতে পাবে যে তার রূহ তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাই হোক সে তার আশেপাশে তাকাবে এবং সে বলতে থাকবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা দুনিয়াতে আমার প্রতি দয়া করেছে তাই আমি আমার রূহকে তার নিকট সোপর্দ করছি। উপস্থিত ফেরেশতারা তার এই আবদার আল্লাহ্‌র নিকট পোঁছিয়ে দিবে। অতঃপর স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজেই বলবে, আমার দয়া ও শক্তির বদৌলতে আমি এই বান্দীর সকল নামায আমার জন্য কবুল করলাম। ফেরেশতারা এই সুসংবাদ তাকে প্রদান করবে। তারপর জিবরাঈল (আঃ)সহ একশত বিশ জন রহমতের ফেরেশতা সেখানে উপস্থিত হবেন। তাদের চেহারায় আরশের নুর ও মাথায় স্বর্ণের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে। তাদের গায়ে সবুজ রঙয়ের ডানা থাকবে। তাদের হাতে জান্নাতের ফল ও সুগন্ধিসহকারে অবস্থান করবে। অতঃপর তারা তাকে সালাম প্রদান করে গভীর শ্রদ্ধা ও দয়ার সাথে বলবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমার কাছে তার সালাম প্রেরণ করেছেন, তোমাকে জান্নাত দান করেছেন ও আল্লাহ্‌র রাসুল ও হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রতিবেশী হিসেবে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। ইমানদার ঐ মহিলাটি তাকে যা বলা হয়েছে সবকিছু সে অবলোকন করেছে ও তার চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল। অতঃপর একজন ইমানদার মহিলাকে দেখার পাশাপাশি আরেকজন মহিলাকে তার পাপের জন্য শাস্তি দেয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। সে বলতে থাকবে দয়া করে তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও হে আমার প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে বানী আসবে হে আমার বান্দী, আমি তোমার সকল ইচ্ছাকে সত্যে

রূপান্তরিত করব। এখন তুমি তোমার রূহকে আত্মসমর্পণ কর। অতঃপর সে বানী শুনার সাথে সাথে তার রূহ বা জীবনকে সমর্পণ করার জন্য মনোনিবেশ করবে। তার রূহ কম্পন ও তার পা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এবং তার পুরো শরীর ঘাম চলে আসবে। তার রূহ সমর্পণের সময় দুইজন ফেরেশতা তার পাশে অবস্থান করবে। তাদের হাতে আগুনের লাঠি থাকবে। একজন তার ডানে ও অপর জন তার বামে অবস্থান করবে। অভিশপ্ত শয়তান ঐ সময় তা অবলোকন করতে থাকবে এবং বলবে আমি এর থেকে বেশী কিছু আশা করি না কিন্তু আমাকে তা দেখতে দাও। সে তার সামনে আসবে ও তার হাতে থাকা ঠাণ্ডা পানি পান করার জন্য লোভ দেখা বে। শয়তানের এ অবস্থা দেখে ফেরেশতারা তাদের লাঠি দিয়ে তাকে সেখান থেকে হটিয়ে দিবে। মুসলিম মহিলাটি তা দেখে হাসতে থাকবে। অতঃপর জান্নাত থেকে কুমারীরা হাউজে কাওছার থেকে সুস্বাদু পানি নিয়ে আসবে ও সে তা পান করবে। সে ঐ পানি পান করার সময় ফেরেশতারা তার রূহ কবজ করে ফেলবে। ফেরেশতারা ঘোষণা করতে থাকবে আরেকজন লোকের মৃত্যুর সংবাদ এবং বলতে থাকবে, **"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"**। অতঃপর ফেরেশতারা ঐ রূহকে জাহান্নামের অবস্থা দেখাবেন ও জান্নাতের স্থানগুলো পরিদর্শন করানোর পর তাকে আবার পূর্বের স্থানে নিয়ে আসবেন যেখানে তাকে রাখা করা হবে।

তারা যখন তাকে গোসল করানোর জন্য তার কাপড় খুলতে থাকবে তখন তার রূহ তার মাথার পাশে অবস্থান করে বলতে থাকবে, হে তুমি (যে তাকে গোসল করাচ্ছে) নম্রভাবে তা পরিষ্কার করো। আর যখন মুর্দাকে ধোয়ার জন্য খাটে রাখা হবে তখন তার রূহ পুনরায় এসে বলবে পানি খুব গরম করে দিওনা। কুসুম পানি দিয়ে গোসল করাবে। আমার চামড়া খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। তুমি তোমার ক্ষমতার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে করে আমাকে পরিষ্কার কর যাতে করে আমি নিজেকে স্বস্তি অনুভব করতে পারি।যখন মুর্দাকে পরিষ্কার ও দাফনের জন্য রাখা হবে তখন তার রূহ আবার বলবে এটাই আমার সর্বশেষ সময় আমি দুনিয়া, আমার আত্মীয় স্বজনদেরকে শেষ বারের মত দেখার ও তারা আমাকে সর্বশেষ দেখার সুযোগ করে দাও। যাতে করে আমি তাদেরকে সতর্ক করে দিতে পারি যে আমার মত তারা একদিন এই দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে আসতে হবে। তারা যেন আমাকে না ভুলে যায়, আমার জন্য না কাঁদে, সর্বদা আমাকে যেন স্বরণে রাখে, আমার জন্য কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া করে। তাদের ভাল কাজের সওয়াব

যেন আমার জন্য পাঠায় এ কথাগুলো বলার সুযোগ করে দাও। তারা যেন আমার রেখে আসা সম্পত্তি নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া না করে। আর যদি তারা তা করে তাহলে কবরে আমাকে তাদের ঐ আযাবের একটা অংশ ভোগ করতে হবে এই সব কথা বলার জন্য সর্বশেষ আমাকে একটু সুযোগ দাও। তারা যেন আমাকে শুক্রবার ও ঈদের দিনে স্মরণ করে। অতঃপর যখন মুর্দাকে খাটে করে দাফনের জন্য আনা হবে তখন মাটি তাদেরকে বলবে আস্তে করে শোয়াও। যাতে সে কোন প্রকার ব্যথা অনুভব না করে। হে আমার সন্তান ও আত্মীয় স্বজনেরা, কোন দিন আর পৃথকের হবে না আজকের মত। আমরা একে অপরকে মিস করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আবার পুনরায় মীলিত না হব। কিয়ামতের দিবস অতি সন্নিকটে। তোমাদের জন্য শুভ কামনা রইল যারা আমার পরে আগমন করবে। মুর্দাকে যখন কাঁধে করে বহন করা হবে তখন তার রূহ আবার বলবে আমাকে আস্তে আস্তে বহন কর। যদি তোমার উদ্দেশ্য সওয়াব হয়ে থাকে তা হলে আমার কোন প্রকার ক্ষতি কর না। আমাকে তোমার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করার সুযোগ হবে।

যখন মুর্দাকে কবরের পাশে রাখা হবে তখনও সে বলবে, আমার অবস্থা চিন্তা করো যা তোমাদের জন্য সতর্ক হওয়ার বার্তা বহন করে। আজ তুমি আমাকে অন্ধকারে রেখে চলে যাবে। আর আমি আমার আমলসহ একাকী হয়ে যাব। কিন্তু হতাশ সময় যেন তোমাকে চাকচিক্যময় দুনিয়ার অতোই গভীরে না নিয়ে যায় তাহলে তোমার অবস্থা কাফির ব্যক্তির মত হবে। কারণ তুমিও একদিন আমার মত এই ধ্বংসের দুনিয়া ছেড়ে চলে আসতে হবে। আর যখন মুর্দাকে কবর দেয়া হবে তখন তার রূহটি তার মাথার পাশে অবস্থান করে। মৃত ব্যক্তির কবরের উপর তালকিন করা ব্যতীত তার কবর ত্যাগ করা কোনভাবে উচিৎ হবে না। **ইন্দলেস ব্লিস** নামক গ্রন্থের ষোল নাম্বার অধ্যায়ে **তালকিন** সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। মুর্দা দাফন করার পর তার উপর তালকিন পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু ওয়াহাবিদের মতে মুর্দা দাফন করার পর তার উপর তালকিন পাঠ করা সুন্নত নয়। তাদের মতে এটা বেদআত। তারা বলে মৃত ব্যক্তি তা শুনতে পায় না। আহলে সুন্নতের মতে তালকিন করা সুন্নত। যাহা অধিকাংশ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুস্তাফা ইবনে ইবরাহীম সিয়ামি (রাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত **নুরুল ইয়াকিন ফিমাবহাসুল তালকিন** নামক গ্রন্থে ইমাম তিবরানি থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেখানে মৃত ব্যক্তির উপর তালকিন করতে বলা হয়েছে। উক্ত বইটি

১৩৪৫ হিজরিতে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যা পরবর্তীতে **১৩৯৬** হিজরিতে তুরস্কের ইস্তানবুলে দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে কবরের মধ্যে মুর্দা জীবিত হয়ে যাবে। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার মত। সে নিজেকে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাবে। সে তার গোলামকে আদেশ করবে যেভাবে সে দুনিয়াতে আদেশ করেছিল ঠিক সেভাবে। এবং বলবে আমাকে একটি ঝুলন্ত বাতি দাও। তার কথার কোন উত্তর দেওয়া হবে না। কোন শব্দ সে শুনতে পাবে না। তখন সে ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি সেখানে থাকবে না। অতঃপর সেখানে দুইজন ফেরেশতা আগমন করবে যাদেরকে মুনকার নাকির বলা হয়। তাদেরকে খুব ভয়ানক অবস্থায় দেখা যাবে। তাদের নাক দিয়ে ধোঁয়া ও মুখে ক্রোধের চাপ দেখা যাবে। তারা তার অতি নিকট হবে এবং তাকে নিম্নোক্ত প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবে। **"মান রাব্বুকা ওয়া মাদ্বিনুকা ওয়া মান নাবিয়্যুকা"?** অর্থাৎ তোমার প্রভুকে, তোমার ধর্ম কি ও এই ব্যক্তিটি কে? সে যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে তাহলে ফেরেশতারা তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে সুসংবাদ প্রদান করবে ও তারা স্থান ত্যাগ করবে। অতঃপর তার কবরের ডান পাশে একটি জানালা খুলে যাবে যেখানে সে সূর্যের মত উজ্জ্বল একজন ব্যক্তির চেহারা দেখতে পাবে। যদি মৃত্যু মহিলাটি ইমানদার হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে ঐ ব্যক্তিটি তার পাশে বসে আছে। তারপর সে তাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কে? সে বলবে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমার সহনশীলতা ও শুকরিয়া থেকে যাহা তুমি দুনিয়াতে সম্পাদন করেছিলে। আর আমি তোমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত তোমার সাথে অবস্থান করব।

গরীব এবং শহীদের মৃত্যু সম্পর্কে

রোগী, ভুলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু, গারীব ও শহীদের মৃত্যু একই। এগুলোর মধ্য থেকে আমরা একটির আলোচনা করব । অর্থাৎ একটির সম্পর্কে জানলে যথেষ্ট হবে আমাদের জন্য। গারীবকে (যিনি একা বসবাস করে) দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম প্রকার হল এমন ব্যক্তি যে সব কিছু ত্যাগ করে দূরে কোথাও বাস করে। যার কোন আত্মীয় স্বজন নেই বা তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় হল দরিদ্র ব্যক্তি, যদিও সে তার নিজস্ব বাড়িতে বাস করে। কারো সাথে তার সম্পর্ক নেই বা কেউ তাকে দেখতে যায় না। এদের উভয়কে ঈমানদার

গারীব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে শহীদ হবে। আবার কোন ব্যক্তি তার জীবনে কোন দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এক ওয়াক্ত ত্যাগ না করে তাহলে সেও শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন ব্যক্তি যদি হারাম কাজ সম্পাদন কালে মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন সে এলকোহল পান করার মাধ্যমে বিষ প্রক্রিয়ার কারণে মৃত্যু হয়। তাহলে সে শহীদ হবে না ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হলে। আবার কোন ব্যক্তি এলকোহলসহ অন্য কোন কারনে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদ হিসেবে তার মৃত্যু হবে। যদি সে এলকোহল বর্জন শুরু করে থাকে। একজন নারীর তার শরীরের মুখ ও হাতের তালু ব্যতীত পুরো শরীরকে আবৃত করতে হবে এমনকি তার হাত সহ । হাত ও আওরাতের অন্তর্ভুক্ত। যখন সেবা হিরে যাবে তখন নন মুহরিম পরুষের নিকট মুখ ও হাতের তালু ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করাতার জন্য ফরয। পক্ষান্তরে কোন মহিলা যদি শরীয়তের এই হুকুম অমান্য করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। আর এক প্রকারের নারী বা মহিলা শহীদ হল ঐ সকল নারী যারা নিজেদের কে বাড়ির বাহিরে যাওয়ার সময় সম্পূর্ণ ভাবে শরীয়তের পর্দা অনুসরণ করে চলে তারা ও মৃত্যুর পর শহীদি মর্যাদা পাবে। মহান আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ বা নিষেধাজ্ঞাকে মেনে চলার নাম হল **আহকামে ইসলামিয়্যাহ**। যেসব মাতা পিতা আহকামে ইসলামিয়্যাহ শিক্ষা করল ও তাদের সন্তানদের কে শিক্ষা দিল তাহলে তারা শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কোন ব্যক্তি যদি তার অনুসরণ না করে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করলেও। কোন মুসলমান যদি কাফিরের হাতে বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তাহলে সে শহীদ হবে। অপর দিকে কোন কাফির যদি অত্যাচারিত অবস্থায় ও তার মৃত্যু হয় তাহলে সে শহীদ হবে না। আবার কোন ব্যক্তির কাফির অবস্থায় মৃত্যু হলে সে জান্নাতে কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। শহীদ হওয়া ব্যক্তিকে যখন খাটিয়ার উপর রাখা হবে তখন জান্নাতের গেট গুলোকে খুলে দোয়া হবে। হাজার হাজার ফেরেশতা সেখান থেকে অবতরণ করবে যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা জানেন। তারা তাদের হাতে মুকুট ও নুরের পোশাক বহন করবে। অতঃপর তারা শহীদ হওয়া ব্যক্তিকে এমনভাবে রূহ সমর্পণ করার জন্য বলবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা সুরা ফাযেরের শেষ রুকুতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আর একজন ঈমানদার শহীদ, সে তার চেহারাকে

দারগাহে ইজ্জতের দিকে ফিরাবে এবং বলবে। হে আমার মাবূদ, আমি যত দিন জীবন যাপন করেছি প্রত্যেক দিন আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেছি। এবং কোন দিন কারো কাছে মাথা নত করি নাই একমাত্র তুমি ছাড়া। আমি দুনিয়াতে কখনো অসৎ উপায়ে কোন কিছু উপার্জন করিনি। হে আমার প্রভু, আমি আজ আপনার নিকট উম্মতে মুহাম্মদির যাবতীয় পাপ কাজের জন্য আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দেন। এ ব্যক্তিও শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফেরেশতারা তার রূহকে ঐ পোশাকের মধ্যে মড়িয়ে নিবে এমন সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে। বলা হচ্ছে, এ রূহটিকে জান্নাতে নিয়ে যাও। কারণ অন্যদের তুলনায় অধিক নামায আদায় করেছে, মানুষদেরকে মেহমানদারী করেছে, মানুষের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছে ও তাদেরকে ইস্তেগফার করতে বলেছে। সে আমার জন্য নিয়মিত যিকির করত, সে যখন বাড়ির বাহিরে যেত তখন শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী পর্দা করে যেত এবং সে হারাম কাজ পরিহার করত ও দুনিয়ার জীবনে সে ইসলাম, রাসুল (সাঃ) কে সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করত। এখন তার জন্য নিযুক্ত করা দুইজন ফেরেশতাও তার ভাল ও খারাপ আমল সংগ্রহের জন্য অপর দুই জন ফেরেশতা বলবে, হে আমাদের প্রভু, তুমি দুনিয়ার জীবনে এই লোকটির যাবতীয় কাজের দায় বার আমাদের উপর দিয়েছ। এখন আমাদেরকে এই লোকের রূহ কে জান্নাতে নেওয়ার অনুমতি প্রদান কর । অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে। বলা হচ্ছে, তোমরা ঐ ব্যক্তির কবরের পাশে অবস্থান কর ও তাসবিহ, তাকবীর ও সেজদাহ করতে থাক যাতে করে যাবতীয় আমলের সওয়াব তার অন্তরে পৌঁছে। তারপর ঐ সকল ফেরেশতারা কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে ঝিকির, তাকবীর ও তাসবিহ ইত্যাদি করতে থাকবে।

গুরুত্বপূর্ণ একটি নোটঃ মিশরেব মুনাফিকরা হযরত উসমান (রাঃ) উপর বিদ্রোহ করল ও মিশর থেকে হযরত উসমান (রাঃ) কে হত্যা করার জন্য মদিনায় আগমন করল। মদিনায় অবস্থানরত তাদের দোসররা মিথ্যা ও কপট তার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করল। তারা এই বলে মুসলিম সাহাবাদেরকে নিন্দা করতে লাগল যে, মদিনার মুসলমানরা খলীফাকে সহযোগিতা করতেছে না। যাই হোক, খলীফার ইচ্ছা ছিল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানটির মালিক হওয়া । তাই তিনি আল্লাহ্র কাছে সেটি পাওয়ার জন্য দোয়া করলেন। অন্যান্য সাহাবীরা তাকে সহযোগিতা করার জন্য আসলেন কিন্তু তিনি তাদেরকে ফিরে দিলেন এ বললেন এ বিষয়ে

তোমাদের কিছুই করার দরকার নেই। অতঃপর বিদ্রোহীরা খলীফাকে খুব সহজে শহীদ করল। আর এভাবে তিনি তার ইচ্ছা পূরণ করলেন। তার ইচ্ছা আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করলেন। শহীদরা মৃত্যুকালীন সময়ে কোন প্রকার ব্যাথা অনুভব করেন না। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে জান্নাত দেখানোর মাধমে তাদের রূহ উঠিয়ে নেন। আর এই কারণে তারা তাদের রূহকে আনন্দের সাথে সমর্পণ করে কেননা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় পুরষ্কার অপেক্ষা করছে।

কাফির বা অবিশ্বাসীদের মৃত্যু

যখন কোন অবিশ্বাসী, মুরতাদ বা এমন নির্বোধ যে কিনা ইসলামকে অবজ্ঞা আল কুরআনকে মরুভূমির আইন বলত এবং যে মুহাম্মদকে অসৎ ও মূর্খ বলে সম্বোধন করত, যিনি পৃথিবীর সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবী রাসুলগনের মধ্য থেকে ও সবচেয়ে উত্তম মর্যাদার অধিকারী তাকে নিয়ে এই বাজে মন্তব্য করত। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এই যাবতীয় পাপ কাজ থেকে মুক্ত দান কর। মানুষের জীবনে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে একটি প্রয়োজনহীন বিষয় বা যারা ইসলামকে নিয়ে কটূক্তি করে। অথচ ইসলাম হচ্ছে সকল প্রকার শান্তি, আদালত, পরিষ্কার, সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা সকল কিছুর অগ্রদূতের মুল ইসলাম ছাড়া যা কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ যে কিনা উল্লেখিত বিষয়ে অস্বীকার বা খারাপ মন্তব্য করে যার হাতে নিজেই নিজের নিঃশ্বাস নেওয়ার মত শক্তি পর্যন্ত নেই এই জাতীয় লোক যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন তার চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়। তার সামনে জান্নাতকে উপস্থাপন করা হয়। এবং একজন ফেরেশতা তাকে বলে ও হে তুমি অবিশ্বাসী, হে অপদার্থ ব্যক্তিকে তোমাকে মুসলানদেরকে অপদার্থ বলতে বলেছিল? যারা তোমাকে বলত দুনিয়ার জীবন হল একমাত্র জীবন তারা আজ কোথায়, মানুষ তখন বুঝতে পারবে যখন সে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তখন তা আর কোন কাজে আসবে না। তাকে বলা হবে দুনিয়ার জীবনে তুমি ভুলপথে ছিলে । তুমি ইসলামকে তুচ্ছ বলে তাচ্ছিল্য করতে অথচ ইসলাম ছিল একমাত্র সঠিক জীবন বিধান । মানুষের মধ্য থেকে যারা রাসুল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আনীত বিধানকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা এই জান্নাতে

থাকার সুযোগ পাবে। সে জান্নাতের অবস্থা অবলোকন করবে। জান্নাত তাকে সম্বোধন করে বলবে, মানুষের মধ্য থেকে যাদের ঈমান আছে তারা আল্লাহ্র করুণায় জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্ত হয়ে আমার কাছে আসবে। অতঃপর সেখানে তার সামনে ধর্ম যাজকের পোশাক পরে আবির্ভূত হবে এবং বলবে হে তুমি, তুমি নিজে অনেক কিছু, তোমার অনেক কিছু আছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা তোমার সাথে ছিল তারা সবাই মিথ্যাবাদী। এ সকল নিয়ামত একমাত্র তোমার জন্য। অতঃপর তাকে জাহান্নাম দেখানো হবে। যা বড় বড় আগুনের কুণ্ডলী, বিষাক্ত বিষাক্ত কিট পতঙ্গ ও শত পদবী ভয়ানক সাপ দ্বারা গঠিত। সে জাহান্নামের আজাব দেখতে পাবে যা হাদিস শরীফে উল্লেখ করা আছে। তারপর জাহান্নাম থেকে আজাবের ফেরেশতারা আসবে তার নাম জাবানিস। তার হাতে আগুনের লাঠি ও তাদের মুখ থেকে অগ্নি ঝরতে থাকবে। তারা মিনারের মত লম্বা হবে, তাদের দাঁত হবে ষাঁড়ের শিঙয়ের মত। তাদের আওয়াজ হবে বজ্রপাতের ন্যায়। তাদের আওয়াজ শুনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি শিহরিত হয়ে শয়তানের দিকে তাকাবে । শয়তান ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ফেরেশতারা তাকে ধরে ফেলবে ও আঘাত করে তাকে বসিয়ে রাখবে। অতঃপর ফেরেশতারা তাকে বলবে হে ইসলামের দুশমন, দুনিয়ার জীবনে তুমি আল্লাহ্র রাসুলের কথা অস্বীকার করেছ ও ফেরেশতাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছ। অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে বার বার প্রতারিত করেছে। তারা তার হাঁটুর সাথে চেন লাগিয়ে উপরের দিকে ঝুলিয়ে দিবে ও তার মাথা নিচের দিকে চলে যাবে। তার ডান হাতের মধ্যে বাম হাত ভেদ করে দিবে। আর এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে আল কুরআনে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সে কাদঁতে থাকবে ও সে তোষামোদকারীকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে থাকবে। জাবানিস তার পরিবর্তে উত্তর দিবে। হে তুমি অবিশ্বাসী, হে নির্বোধ, তুমি মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করেছ। ভিক্ষা করার জন্য সময়ের প্রয়োজন নেই। নামায কিংবা ঈমানকে কবুল হওয়ার জন্য দীর্ঘায়িত করা দরকার নেই। এখনই তোমার অবিশ্বাসের জন্য তোমাকে শাস্তি দেয়ার সময়। তারা তার জিহ্বাকে ভিতর থেকে টেনে বের করে ফেলবে। তার চক্ষুদ্বয়কে উপড়িয়ে তুলে ফেলবে। জাহান্নামের মধ্যে যত প্রকার শাস্তি আছে সকল প্রকার শাস্তি তাকে প্রদান করা হবে। আল্লাহ্ তায়ালার পাঠানো রাসুলের দেখানো পথে আমাদেরকে চলার তাওফিক দান করুক, আমীন। যাই হোক দুনিয়াতে তুমি যত দীর্ঘদিন বসবাস করো না কেন তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। রাসুল ইরশাদ করেন। **"যখন কোন ব্যক্তির রূহ**

তার শরীর ত্যাগ করে, একটি আওয়াজ বলে উঠে, হে মানব সন্তান তুমি কি দুনিয়াকে ত্যাগ করছো না, দুনিয়া তোমাকে ত্যাগ করল? তুমি কি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেনা দুনিয়া তোমার সাথে সম্পর্ক করল? তুমি কি দুনিয়াকে হত্যা করছো না দুনিয়া তোমাকে হত্যা করেছে? আর যখন মুর্দাকে গোসল করানো শুরু হবে তখন একটি আওয়াজ নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন করবে।

১। তোমার শক্তিশালী শরীর আজ কোথায়? কোন জিনিস যে তোমাকে দুর্বল করে দিল?

২। কোথায় তোমার সুন্দর সুন্দর বাক্য লিপি? কোন বস্তু যে তোমায় নিশ্চুপ করে দিল?

৩। তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধুরা আজ কোথায়? কেন তারা তোমাকে একাকী রেখে চলে গিয়েছে?

"যখন জানাযা নামাযের জন্য তাকে কফিনে তুলা হবে আরেকটি আওয়াজ আসবে এবং বলবে, বিধান ছাড়া সেট আউট করবে না। এই ভ্রমন আর ফিরে আসবে না। তুমি কখনো আর ফিরে আসতে পারবে না। তোমার ভ্রমণ ফেরেশতাদের প্রশ্ন আর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে। যখন মুর্দাকে কফিনে রাখাবে আরেকটি আওয়াজ আসবে ও বলবে, তুমি যদি আল্লাহকে খুশি করতে পারতে তাহলে আজ তোমার জন্য সু সংবাদ অপেক্ষা করত। তুমি যদি আল্লাহ্‌র ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কাজ করতে তাহলে তোমার আজ এ অবস্থা হত না। যখন জানাজার জন্য তাকে নিয়ে আসা হবে আরেকটি কণ্ঠ আওয়াজ করবে, হে মানব, তুমি কবরের জীবনের প্রস্তুতির জন্য দুনিয়াতে কি কাজ সম্পাদন করেছ? তুমি কবরের অন্ধকারের জন্য দুনিয়া থকে কি আলো নিয়ে এসেছ? তুমি তোমার দুনিয়ার সম্পদ থেকে কি নিয়ে এসেছ? তুমি অনুর্বর কবরকে সুসজ্জিত করার জন্য কি নিয়ে এসেছ? আর যখন জানাযা নামায শেষ হয়ে যাবে কবর বলতে শুরু করবে, তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ । তুমি আমার পেটে নিরব অবস্থায় ফিরে এলে। ধাপন কাজ শেষ হওয়ার পর মানুষ যে যার পথে চলে যাবে। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসবে। বলা হবে, হে আমার বান্দা, তুমি এখন একাকী অবস্থান করছ। তারা তোমাকে এ কাকী রেখে চলে গিয়েছে। এক সময়ে তারা তোমার ভাই, দোস্ত বা আত্মীয় ছিল। কিন্তু তাদের কেউ তোমাকে কোন উপকার করতে পারেনি। হে আমার বান্দা, তুমি আমার অ বাধ্যতা করেছ। তুমি আমার কোন আদেশের আনুগত্য করনি। এবং কখনো এ ইঅবস্থায় আসবে

বলে কখনো চিন্তা করনি। যদি মৃত্য ব্যক্তিটি ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে আজ সে তার প্রভু থেকে তার নিয়ামতরাজি শুনতে পেত। হে আমার বান্দা যে ঈমানসহকারে মৃত্যু বরণ করে সে কখনো একাকী মৃত্যুবরণ করে না। আর এটা আমার দয়ার মধ্যে পড়েনা। আমি আমার শক্তি ও দয়ার বলে আমি তোমার সাথে এমন আচরণ করব যা কিনা তোমার দোস্তরা তোমার সাথে করেছে। আমি তোমাকে এমনভাবে লালন পালন করব যা একজন মাতাপিতা তার সন্তানের সাথে করে থাকে। তিনি তার রহমত ও দয়ার মাধ্যমে তার বান্দার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যার আলোকে তার কবরকে জান্নাতের একটি বাগান বানিয়ে দেওয়া হবে। যেখানে তার আমোদ প্রমোদের জন্য সকল কিছু বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা অনেক দয়াবান যে তার বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তাই আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন ও তার নিষেধ করা যাবতীয় বস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে এবং আমলে সালিহ্‌ করার মাধ্যমে ভয়ানক নির্যাতন থেকে আমাদের নিজেদের কে মুক্ত করতে হবে"।

সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা কবরের প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। তাদেরকে নির্যাতন করা হবে যাদেরকে ক্ষমা করা হয়নি বা যারা অবিশ্বাসী। ঐ সকল মানুষ যারা মুসলমানের মাঝে গল্প করে বেড়ায় ও যারা প্রাকৃতিক কাজ করার পর পবিত্রতা অর্জন করেনা তাদেরকেও কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। কবরের আজাব শুধু রূহকে দেওয়া হবে না বরং পুরো শরীরকে দেয়া হবে। উপরের কাজগুলো রূহের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধতার জন্য আমাদেরকে যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিম্নক্ত কবিতাটি উসমানী খিলাফতের অন্যতম কবি **আবদুর রহমান শামী পাশা** (মৃত্যুঃ ১৮৭৮ ঈসায়ী) পাশার কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। ইংরেজি ভার্সন থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

হে মানব, পরিদর্শকের মত করে বসবাস কর। আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে তোমার অন্তরে স্থান দিও না। কেউ ইচ্ছা করলে দুনিয়া ত্যাগ করতে পারবেনা । কিন্তু আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করে তাই করতে পারেন। আল্লাহ্‌ তায়ালাই একমাত্র সবকিছুর অধিকারী। পৃথিবীতে সবার ভাল কিংবা খারাপ ভাবে দিন কাটায় তার অর্থ এই নয় যে প্রতিদ্বন্দ্বি তার জন্য পৃথিবী সবাইকে তার মুল্য দিবে। আমার ও এমন একটা সময় ছিল যখন আমি প্রেসিডেন্টের চেয়ে ভাল অবস্থানে ছিলাম। সার্বভৌমের চাবিকাঠি আমার হাতে ছিল। অথচ আজ এমন একস্থানে আসলাম

যেখানে তার কোন কিছু বিদ্যমান নেই। তখন আমার অন্তরতা অনুভব করল, আমার সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন আমার জান পাখি (রুহ) অনেক দূরে চলে গেল। অতঃপর আমার জীবন শেষ হয়ে গেল। আমার স্বাস্থ্য বাতির মত নিভে গেল। অন্ধকার আমার চারদিকে ঘিরে ফেলল। সূর্য গোলাপের মত হয়ে গেল। সকল কিছু আল্লাহর নুরের মাধ্যমে আলোকিত হয়ে গেল। এমন সময় আমি আমার রবকে স্বরণ করলাম । আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হল। আর যখন রবের কাছে ক্ষমার জন্য আবেদন করলাম তিনি তার অশেষ দয়ার মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। হে আমার রব, আমি হাজার প্রকারের গুনাহ সম্পাদন করলাম। আমি লজ্জিতও নিরুপায় হয়ে তোমার নিকট ক্ষমা পার্থনা করতেছি তুমি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তুমি তোমার গাফফার নামের দিকে তাকিয়ে আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া কারো কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ একমাত্র সবকিছুকে ধবংস ও পূর্বের অবস্থায় নিয়মিত করতে পারেন। এই জীবন হচ্ছে কষ্টের সহিত বেষ্টিত কিছু ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। অবঃশেষে আমরা কি মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই? আনন্দময় কয়েক ঘণ্টা পরে, সকল প্রকার আনন্দঘন সময় মাটি (নিঃশেষ) হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেক টি মুহূর্ত আনন্দের সহিত মৃত্যুর গভীরে অজ্ঞতার সাথে বাস করতেছি, পৃথিবী আমাদেরকে একজন ড্রাইভারের ভূমিকায় ধবংসের দিকে ধাবিত করছে।

কবর যিয়ারত ও কুরআন তেলাওয়াত

কবর যিয়ারত করা সুন্নত। সাপ্তাহ কিংবা ঈদের দিন কবর যিয়ারত করা উচিত। মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক লিখিত **শরিয়তুল ইসলাম** নামক গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, বৃহঃপতি, শুক্র ও শনিবারে কবর যিয়ারত করার দ্বারা অধিক সাওয়াব অর্জন করা যায়। এবং যাকে সুন্নতও বলা হয়েছে। কবর পরিদর্শক সে এমনভাবে ধ্যান করবে যে, কবরে মুর্দার কোন অস্তিস্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা তাকে এক প্রকারের ম্যাসেজ দিবে ভাল কাজ করার জন্য। যখন হযরত উসমান (রাঃ) কবরের পাশ দিয়ে হাঁটতেন তখন তিনি এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে

তার পুরো দাঁড়ি ভিজে যেত। মৃত্যব্যক্তি কবরের মধ্যে তাদের যাবতীয় দোয়া থেকে উপকৃত হয়। রাসুল (সাঃ) তার আত্মীয়-স্বজন ও সাহাবীদের কবর যিয়ারত করতেন। সালাম প্রদানের পরে তাদের জন্য দোয়া করতেন। কবর যিয়ারতকারীর সম্মুখভাগ কবরের দিকে ও তার পচ্ছদভাগ কিবলার দিকে রাখতে হবে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, **"যখন কোন ব্যক্তি তার কোন পরিচিত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করার জন্য এসে প্রথমে সালাম দেয় তাহলে কবরে থাকা তার আত্মীয়টি তার সালামের উত্তর ও স্বীকৃতি প্রদান করে"**। আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) বলেন, তুমি কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস ও সুরা ফাতিহা পাঠ করার মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব ঐ কবরে থাকা মৃত্য ব্যক্তিদের জন্য পাঠিয়ে দাও। সাওয়াব তাদের নিকট পোঁছে দেওয়া হবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে বলা হচ্ছে, **"যখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করে কবরে থাকা কোন মৃত্য ব্যক্তির জন্য পাঠানো হয় আল্লাহ্ তায়ালা তার সাওয়াব ঐ কবরে থাকা সকল মুর্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন"**। কাজি হিন্দি (রাঃ) কতৃক সম্পাদিত কিতাব খাযিনাতুর-রিবায়াত গ্রন্থে বলা হচ্ছে, কবর যিয়ারত করার ক্ষেত্রে নবী রাসুল কিংবা আলেম, ওলী -আওলীয়াদের মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য নেই শুধুমাত্র তাদের পদ, মর্যাদা ও সম্মানের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি কোন মুসলমান তার কোন প্রিয় ব্যক্তির নাম লিখে সাইন বোর্ড কিংবা বসবাসের রুমের দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে দেয় অথবা মৃত্য কোন ব্যক্তির নাম পাথর লিখে তার কবরের উপর ঝুলিয়ে রাখে এতে করে অন্য কোন মুসলামান যখন তার রুমে কিংবা ঐ কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা দেখে তার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ তায়লা লিখত ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। পাথর কিংবা অন্য কিছুর উপর তার নাম লিখার অর্থ এই নয় যে তাকে স্বরণ করা বরং তার জন্য সুরা ফাতিহাসহ অন্যান্য দোয়া পাঠ করে আল্লাহ্‌র কাছে পার্থনা করা। আর এই কারণে মুসলিম দেশগুলোতে দেয়াল কিংবা কবরের উপর পাথর দিয়ে নাম লিখে দেয়া একটা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যদি ওখানে অভিভাবকের নাম লিখা হয়, আর তুমি যদি এর মালিক সম্পর্কে জানতে চাও শাফায়াতের জন্য এবং দোয়া কর তার জন্য আর তা যদি ওয়ালী তা শুনে তাহলে সেও তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। তার এই পার্থনা আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করা হবে। নারীরাও কবর যিয়ারত করতে পারবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ছাড়া নারীদের কবর যিয়ারত করা উচিত নয়। না করলে ভাল।

হায়েজ ও নাফাস অবস্থায় কবর যিয়ারত করা জায়েজ। কিন্তু পবিত্রতার সহিত যিয়ারত করা সুন্নত। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, **যখন তুমি কোন মুমিনের কবর যিয়ারত করতে যাবে তখন এই দোয়াটি পাঠ করবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি-হাক্কি মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলী মুহাম্মাদিন অ্যানলাতউ –আজ্জি বাহা ঝালমাইয়্যেত", পাঠ করলে মৃত্য ব্যক্তি আযাব থেকে মুক্তি পাবে**। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, **"যদি কোন ব্যক্তি তার মাতা পিতার কবর যিয়ারত করে তাহলে তাদের মধ্য থেকে যে কেউ শুক্রবারের আযাব ক্ষমা করে দেয়া হয়"** । কবরের উপর চুমা দেয়া যাবে যদি তা তার মাতাপিতার কবর হয়। **কিফায়া** নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসুলকে জিজ্ঞেস করল, আমি জান্নাতে প্রবেশের দরজায় চুমা করার জন্য শপথ করেছি, আমি কিভাবে আমার শপথ পূর্ণ করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **"তুমি তোমার মায়ের পায়ে চুমা খাও"**। ঐ ব্যক্তি বলল, আমার মাতা পিতা কেউ জীবিত নেই। রাসুল বলেন, **"তুমি তোমার মাতা পিতার কবরে চুমা খাও। আর যদি তাদের কবর নির্দিষ্ট করা না যায় তাহলে মাটির মধ্যে দুইটি রেখা টেনে তাদের কবর মনে করে চুমা খাও তাহলে তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে"**। নিজের অবস্থান থেকে বহুদূরে অবস্থিত বড় বড় জ্ঞানী কিংবা আওলিয়াদের কবর যিয়ারত করা উচিত তাহলে এর মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করা যায়। কোন দূরস্থান থেকে রাসুল এর কবর যিয়ারত করার মাধ্যমে অনেক সাওয়াব হাসিল করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আওলিয়াদের কবর যিয়ারত করে তাদের থেকে ভালোবাসা পাওয়ার উদ্যেশ্যে তাহলে তার অন্তর তাদের দোয়া ও ভালোবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও সে অলিদের মাযারের ভিতর কোন অন্যায় সম্পাদন করে। যদি তাদের কবর কোন বেপর্দা নারী কর্তৃক যিয়ারত করা হয় তাহলে কোনভাবে ঠিক হবে না। আমাদের উচিত এই সকল পবিত্র স্থানে শরীয়ত বিপরীত কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করা। আর যদি আমরা তা প্রতিহত করতে না পারি তাহলে ঘৃনা করতে হবে। যদি কোন নারী শোক, কান্নাকাটি, বিলাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কবর জিয়াতর করে তাহলে তা করা হারাম। এরূপ করলে ঐ নারীর উপর দণ্ডাদেশের হুকুম প্রদান করতে হবে। যদিও বৃদ্ধা নারীর জন্য পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যতীত কবর জিয়ারত করা বৈধ। এই শর্তের মধ্যে যুবতী নারীর জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরুহ। অনুরূপভাবে একই হুকুম নারীদের জানা নামাযে অংশ গ্রহন করার ক্ষেত্রে। যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে

আলী বিরগিবী কর্তৃক রচিত জযবু**ল কুলুব** গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে কোন ব্যক্তি কবর স্থানে প্রবেশ করে দাড়িয়ে বলে, **"আস সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদারি লকা ও বিল মুমিনীন"**। তারপর সে বিসমিল্লাহ বলে সুরা ফাতিহা ও সুরা ইখলাস পাঠ করে। অতঃপর এই দোয়াটি পাঠ করে, **"আল্লাহুম্মা রাব্বিল এজছাদিল বালিয়াহ, অয়াল-ইজামিন না- হিরাতিল্লাতী হারাজাত মিনাদ্দুনিয়া ওয়া হিয়াবিকা মুমিনাতুন, ওয়ায়দ্দিল আলাইহা- রা ও হাম-মিনইনদিকা ওসালামান মিন্নী"**। সে মৃত্য ব্যক্তির পায়ের পাশে দাড়িয়ে কিবলাকে সামনে রেখে উপরোক্ত দুয়া পাঠ করবে। প্রথমে সালাম দিয়ে নামায শেষ করার পর সুরা বাকারার শেষাংশ তারপর সুরা ইয়াসীন, তাবারাকা, তাকাসুর, সুরা ইখলাস ও সুরা ফাতিহা পাঠ করবে। এবং এর মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব মৃত্য ব্যক্তির নাজাতের জন্য প্রেরণ করবে।

গুরুত্বপূর্ণ নোটঃ আমাদের স্কলাররা এই বলে ফতয়া দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির হয়ে হজ্জ পালন করতে পারবেন। যার মাধ্যমে তার নিকট ঐ সওয়াব পোঁছে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য ফরজ কি নফল ইবাদত অথবা কোন ভাল কাজ যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, রাসুল কিংবা আওলীয়াদের কবর যিয়ারত, কুরআন শরীফ পাঠ, যিকির সম্পাদন করা বৈধ। আর এর মাধ্যমে যার জন্য এই কাজগুলো করা হয়েছে তার কাছে সাওয়াব পোঁছে যাবে। আর এরূপ করলে আল্লাহ্ তায়ালা উভয়কে একই সাওয়াব প্রদান করবেন। আর এরুপভাবে কুরআন তিলাওয়াত কবর যিয়ারত করার সময়ে পাঠ করতে হবে যার মাধ্যমে মৃত্য ব্যক্তির কাছে সওয়াব তখনই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্যও সমান সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় সেখানে আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও বরকত অবতরণ হয়ে থাকে। সেখানে যাহা প্রার্থনা করা হয় সবকিছু আল্লাহ্ কর্তৃক কবুল করা হয়ে থাকে। আর যখন তাহা কবরের সামনে পাঠ করা হয় তখন ঐ কবরকে আল্লাহ্ তায়ালা রহমত ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। হানাফী মাযহাবের মতে, যখন কোন ব্যক্তি নফল রোজা, নামায, সাদাকা তথা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তারপর আল্লাহ্‌র

এ কি বিষয় ঘটবে। যা কিনা রক্ত দিয়ে পরিষদ করা সম্ভব নয়। আর তা হল, জৈবনও মুসলিম ভাই" ।কাছে জীবিত কিংবা মৃত্য সবার জন্য দোয়া করে আল্লাহ্ তায়ালা তার দোয়া কবুল করে ও সকলের কাছে তার সাওয়াব ভাগ করে দেয়। কোন কোন স্কলার বলেছেন যে, ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে ও সমান সাওয়াব

প্রদান করা হবে। তবে এখানে কোন নির্দিষ্ট মৃত্য ব্যক্তির জন্য সাওয়াব দেয়া হবেনা বরং সকল সাওয়াব প্রত্যেক মৃত্য দেরকে প্রদান করা হবে। শাফী ও মালেকী মাঝহাবের মতে, শারীরিক ভাবে যে ইবাদত সম্পাদন (কুরআন তিলাওয়াত) করা হবে তার সাওয়াব অন্য কোন মুসলমান কে প্রদান করা হবেনা। শুধুমাত্র যারা একা জ করবে তাদের কে তা হা প্রদান করা হবে অন্য দের কে প্রদান করা হবেনা। **কিতাবুল ফিকহ আলাল-মাঝাহিবুল আরবা** নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, পরুষ কতৃক কবর যিয়ারত করা সুন্নত এই কারনে যে, তারা এর মাধ্যমে কবর কিংবা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সতর্ক তা অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎনিজেদেরকেসঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। হানাফী ও মালেকী মঝহাবের মতে বৃহঃ প্রতি, শুক্র ও শনিবারে কবর যিয়ারত করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা । শাফী মাঝহাবের মতে, বৃহঃ প্রতিবারের বিকালেও শনিবারের সকাল বেলায় কবর যিয়ারত করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কবর যিয়ারত কারীকে অবশ্যই কুরআন তিলাওয়াত ও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। যাহা মৃত্য ব্যক্তি দের জন্য উপকার হবে। যখন তুমি কবর স্থানে প্রবেশ করবে তখন এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত।**"আস সালামু আলাইকুম, ইয়া আহলা দারিল- কাওমিল মুমিনীন! ইন্নাইন শা- আল্লাহু আন –কারী বিন বিকুমলা হিকুন"** । দূরে কিংবা কাছে সকল কবর স্থান যিয়ারত করা । এমনি ভাবে দূরে কোথাও অবস্থিত কোনসালিহ কিংবা আওলিয়া দের কবর যিয়ারত করতে যাওয়া অধিক সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। যাকে সুন্নত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) এর কবর যিয়ারত করতে যাওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বলা হয়েছে। বয়স্ক নারী রাতাদের শরীরকে পরিপূর্ণ আবরণ করে কবর যিয়ারত করতে পারবে । যদি সেখানে কোন প্রকার ফিতনা কিংবা পাপ কাজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে কবর জিয়ারতকরা হারাম ।কবর যিয়ারত করা কালীন কবরের চার পাশে তাওয়াফ, তার উপর চুমো খাওয়া কিংবামৃত্য ব্যক্তির কাছে কোন কিছু চাওয়া কে হারাম করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যস্থ তায়ওলি কিংবা আওলিয়াদের কাছে শাফায়াত করা যাবে।**"এমন দুইটি বিষয় আছে, যে তাহারা বে সব কিছুকে পুড়ে ছাইকরে ফেলবে। আর যারা এই দুইটি বিষয়ে অমনোযোগী হবে তাদের ক্ষেত্রে একি বিষয় ঘটবে। যা কিনা রক্ত দিয়ে পরিষদ করা সম্ভব নয়। আর তাহল, জৈব নওমুসলিম ভাই"** ।

তৃতীয় খণ্ড নবম চিঠি

মাকতুবাত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের নবমতম চিঠিটি ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আহমদ ফারুকী (রাঃ) কর্তৃক মুহাম্মদ নুমানের জন্য লিখা হয়েছে। কুরআনুল কারিমে এর সারমর্ম এভাবে বলা হয়েছে, "রাসুল যাহা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধর" । চিঠি আরবী ভাষায় লিখা ছিল। পরে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। নিম্নে বাংলায় অনুবাদ করা হল।- বিসমিল্লাহির –রাহমানির রাহিম! সূরা হাশরের সপ্তম আয়াতের সারমর্ম হল, **"রাসুল যা কিছু নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর, আর যাহা তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাক ও আল্লাহ্কে ভয় কর"**। তার নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে অবস্থান করো বলার পর, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর এই বাক্যটি তিনি যোগ করেছেন। তার অর্থ হল, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা আমাদের কর্তব্য। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করা। তাক্বওয়া, যার অর্থ হল নিষেধ করা বস্তু (হারাম) থেকে দূরে অবস্থান করা। তাক্বওয়া হল ইসলামের ভিত্তি। যাকে **ওয়ারা** বলা হয়, সন্দেহমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা। রাসুল ইরশাদ করেন, **"ওয়ারা হল আমাদের ধর্মের প্রধান বস্তু"**। তিনি অপর এক হাদিসে বলেন, **ওয়ারার মত কোন কাজ সম্পাদন করনা**। ইসলাম ধর্মে হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যার অর্থ হল, হারাম কাজগুলোকে পরিহার করতে বলা হয়েছে। যখন কোন আদেশ পালন করা হয় তখন তার আনন্দ নফস বা অন্তর শেয়ার করে নেয়। প্রশ্রয় দেয়া মানে আত্মা বা নফসকে কোন কাজ করতে সহায়তা করা। যা হারাম কাজের ক্ষেত্রে না করা উত্তম, আর হালাল কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকরা। অন্যভাবে বলা যায়, এটা তোমাকে দ্রুতগতিতে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করতে সহায়ক হবে। ইসলামী আহকামের মতে, ইসলামের আদেশ বা নিষেধসমূহ নফসের উপর এক ধরণের নির্যাতন করার মত। নফস হল আল্লাহ্ তায়লার শত্রু। হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে, **"নফসের বিপরীত দিকে অবস্থান কর, কেননা সে আমার শত্রু"**। এই জন্যে সকল তরীকায়ে আলিয়্যার মতে, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে নফসকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আর তা হল নফসের বিপরীতে অবস্থান করা। আর এই পথকে আমাদের নাজাতের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এটা এই কারণ যে, আমাদের পূর্ববর্তী পথ প্রদর্শক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন বাহাউদ্দিন বুখারী বলেন, আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার একমাত্র সহজ মাধ্যম বা

পথ হল নফসের উপর প্রধান্য বিস্তার করা। আর এই পথের উপর বিজয়ী হতে পারলেই ইসলামের সঠিক অনুগত হওয়া সম্ভব। এটা ঐ সকল বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী লোকদের পক্ষে অনেক সহজতর হবে যারা আমাদের তরীকার আলোকে লিখিত বইগুলো অধ্যয়ন করবে। ঐ সকল ব্যক্তিরা সঠিক বিষয় কি তা ভালভাবে দেখতে ও বুঝতে পারবে। এটাই তার প্রকৃত স্বরূপ। আমি এ সকল বিষয়ে আমার চিঠিপত্রে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা সকল কিছুর বিষয়ে ভাল জানেন। তার সহযোগিতা আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি হচ্ছে একমাত্র অভিভাবক। সালাত এবং সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবীদের এবং যারা সঠিক পথে আছে তাদের উপর।

তৃতীয় খণ্ড চুরাশিতম চিঠি

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য ও সালাম প্রেরিত হোক ঐ বান্দার জন্য যাকে তিনি পছন্দ ও ভালো বেসেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিজের জীবন পরিচালিত করতে চায়, প্রথমত তার ধর্মীয় বিশ্বাসকে আহলে সুন্নতের দেখানো পথ অনুযায়ী গঠন করে নিতে হবে। কেননা এই ধরণের স্কলার রা আসহাবে কিরামদের থেকে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা নিয়েছেন। তারা তাদের কোন ব্যক্তিগত মত দ্বীন ইসলামের উপর চাপিয়ে দেন নি কিংবা কোন প্রকার ভুল করেন নি। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এই মহান উৎসর্গকে কবুল করুক। তাদের এই কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান দান করুক। ঐ সকল ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যই ফিকহের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। যা সে শিখেছে তদানুযায়ী আমল করতে হবে। অতঃপর সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করবে। অর্থাৎ তার মাধ্যমে সে সর্বদা আল্লাহ্ সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করবে যাকে সিফাতে জাতিয়্যা বলা হয়েছে। যাই হোক, যিকির কিভাবে করতে হবে তা কামিল (যে কিনা অন্য কোন আল্লাহ্ওয়ালা থেকে তা অর্জন করেছেন) ও মুকাম্মিল (যে কিনা তার উস্তাদ কর্তৃক স্বীকৃত ও অন্য যে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সনদ প্রদান করা হয়েছে) উভয় ব্যক্তি থেকে আগে শিক্ষা নিতে হবে। আর যদি সে কোন মূর্খলোক থেকে তা শিখে, তাহলে সে কখনো পূর্ণভাবে তা শিখতে পারবে না। শুরুর দিকে তাকে প্রচুর যিকির করতে হবে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও সেগুলোর সুন্নত আদায়ের পর যিকির করা ব্যতীত অন্য কোন ইবাদত করা যাবে না। এমন কি নফল নামায কিংবা কুরআন তিলাওয়াতের মত অন্যান্য ইবাদতগুলো অন্য সময়ের জন্য রেখে দিতে হবে কিন্তু যিকির করতে হবে। যিকির ওযু কিংবা ওযু ব্যতীত করা যাবে। আর এই ইবাদত নিয়মিতভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ চলতে, ফিরতে, উঠতে ও বসতে সর্বাবস্থায় তা পালন করতে হবে। রাস্তায় হাটার সময়, খাওয়া কিংবা ঘুমানোর সময় কোন একটি মুহূর্ত যিকির ব্যতীত কাটান যাবে না। পারস্য কবির ভাষায়। **সর্বদা, সকল অবস্থায় ও যতদিন তুমি বাঁচবে যিকিরের সাথে থাক, একমাত্র যিকিরের মাধ্যমে অন্তর পরিষ্কার হয়, অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়।** অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা বা ইচ্ছা পোষণ করা যাবে না। তার নাম ব্যতীত কারো নাম কিংবা কারো পদচিহ্ন অন্তরে স্থান দেয়া যাবে না। সে যদি তাকে ব্যতীত কাউকে সেখানে স্থান দিতে শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে সে কখনো আল্লাহ্কে তার অন্তরে স্থান দিতে

পারবে না। আর যদি সে তার অন্তরে আল্লাহকে স্থান দেয় তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দোয়া ও ভালবাসা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর কিছু তার প্রয়োজন হবে না দুনিয়া ও আখিরাতে। আরবি শ্লোকের ভাষায়। **কিভাবে আমরা সেই সুয়াদ অর্জন করব? বড় পাহাড় ও গভীর উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে তা জয় করতে হবে**। সুয়াদ বলা হয় মাশুকাকে। যার অর্থ সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ্ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় । তিনি মানুষকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সালাম ঐ ব্যক্তির উপর যিনি সত্য পথে ছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের সত্তরতম পত্রে বলা হয়েছে যে, স্বধীন কিংবা মুক্ত মন নিয়ে যিকির করলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। অনুরাগ বা ভালোবাসা হল অন্তরের এক ধরণের ব্যাধি। যদি অন্তর এ ধরণের অসুস্থ তার মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ঈমান কিংবা আহকামে ইসলামিয়্যাকে অর্জন করা অসম্ভব হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহ্র যিকির করা যাবে কিন্তু তার মাধ্যমে কোন উপকার আসবে না। অন্তরের অসুস্থতা নফসকে অনুসরণ করে। আর নফস হল আল্লাহ্ তায়ালার শত্রু। এটা তাকে অনুসরণ করতে দিবে না। অনুরূপভাবে ইহা নিজে নিজের শত্রু। ইহা অন্তরকে হারাম কিংবা ক্ষতিকর কাজ সম্পাদন করতে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এটা ইমানহীন বা ধর্মহীনমূলক কাজ করতে সাহস যোগায়, যার মাধ্যমে সে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। ইহা অন্তরকে এমনভাবে অসুস্থ করে ফেলে যার মাধ্যমে সে ইমানহীন, মাযহাবকে অনুসরণ করে না এমন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে ও তাদের বই, সংবাদ পত্র, তাদের রেডিও শুনা এমন কি তাদের ক্ষতিকারক টেলিভিশন দেখার মাধ্যমে নিজেকে ধবংস করে ফেলে। তার এ অসুস্থ অন্তর নিয়ে সে ইসলামের অনুসরণ করে। এগুলোর মাধ্যমে সে তার অন্তরকে অসুস্থ করে তুলে। সে মনে করে যে, সে এগুলোর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতেছে কিন্তু বাস্তবে সে অন্তরের ক্ষতি স্বাধন করছে।

একশ চৌদ্দ তম চিঠি

ভারতের বিশিষ্ট লেখক আব্দুল্লাহ দেহলভী কর্তৃক রচিত মাকাতীবুশ শারীফা নামক গ্রন্থে একশত পঁচিশটিরও বেশী চিঠি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত একশত চৌদ্দতম পত্রটি হাজী আবদুল্লাহ বুখারী কর্তৃক লিখা হয়েছে। যা বাংলায় অনুবাদ করে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন কিছুর কমতি নেই। তিনি সবসময় বান্দাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আমাদের সালাত সালাম মানবতার মুক্তির একমাত্র দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবাদের উপর বর্ষিত হোক। দিল্লীতে মানুষ তরীকা অনুযায়ী বসবাস করে, তাদের ইচ্ছাও আকাঙ্খাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আসমা পাঠ করাসহ তাবিজ লিখে থাকে। আর এর মাধ্যমে তারা মানুষকে অন্যদের থেকে নিজেদেরকে আকৃষ্ট করে থাকে। তারা আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (রাঃ) কে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তিনজন সাহাবী থেকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এদেরকে **শিয়া** বলা হয়। মানুষদের মধ্য থেকে যারা ঐ তিনজন বিশিষ্ট সাহাবীসহ সকল সাহাবীদেরকে অস্বীকার করে তাদেরকে **রাফেদী** বলা হয়। **আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের** স্কলাররা তাদের লিখিত বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত আবু বকর, ওমর ও উসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর উপর প্রাধান্য পাবে। এটি তারা কোরআন শরীফের আয়াত, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও সাহাবী এবং আলেমদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঐ তিনজন সাহাবীকে তাদের উপর প্রধান্য দেয়া হয়েছে। হযরত মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী কর্তৃক লিখিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব **ইজালাতুল খাফাইন খিলাফাতুল খুলাফা এবং কুররাতুল আইনাইন ফী তাফদীলী শায়খাইন।** দুইটি কিতাবই আরবী ও ফরাসি ভাষায় লিখিত হয়েছে। প্রথমটি উর্দু ভাষায় অনূদিত এবং দুইটি সংস্করণে পাকিস্তানে **১৯৬২** সালে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি তুর্কি ভাষায় ওপরে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজিতে চূড়ান্তভাবে সংস্করণ হওয়ার পর সেখানে সাহাবীদের সম্পর্কে ভালভাবে লিখা হয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে হাকিকত। যা তুরুস্কের ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ডকুমেন্টস অফ দ্যা রাইট ওয়ার্ল্ড নামক কিতাবেও এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার ইবনে হাজার

মাক্কী কর্তৃক লিখিত আরবী কিতাব**উশ শাওয়াকিল মুহরীকা** যা তুরুস্কের ইস্তানবুল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উপরোক্ত কিতাবগুলো পাঠ করলে জানতে পারবে লামাযহাবিরা ভুল পথে আছে। আজকের দিনে কিছু কিছু মানুষ তাদেরকে জাফারী বলে থাকে। তারা যুবকদেরকে মিথ্যা দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। তাদের বারজন ইমাম রয়েছে, যাদেরকে তারা অনুসরণ করে। যারা এই বারজন ইমামের আনুগত্য করবে তাদেরকে **আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের** সঠিক অনুসারী হিসেবে গণ্য করা হবে। এমন কি তারা মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। যদি ঐ বারজনকে আনুগত্য করা হয়। তারা দাওর পালন করার উদ্দেশ্যে শোকাবহ অনুষ্ঠান কিংবা খাওয়ার জন্য একাত্রিত হয়ে থাকে। তারা মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করেনা। জন্ম বার্ষিকীতে একসাথে হয়ে গ্রুপ করে ইলাহী গান ও গীত পরিবেশন করে থাকে। তারা মিউজিক্যাল যন্ত্র ব্যবহৃত গান শ্রবণ করে। তারা এই ধরণের বিদআত কাজ সম্পাদন করে ও তরিকতের নামে অনেক প্রকার বিদআত সম্পাদন করে। এই ধরণের লোকেরা তরীকত পালনের নামে ঝুকিজম কিংবা ব্রাহমানিজম থেকে কু সংস্কারমূলক ধর্মীয় প্রথা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা দুনিয়াতে ধনী ও পাপী এমন লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। তারা জামাতে নামায আদায় কিংবা শুক্রবারের নামায থেকেও তাদের সহবত ও জলসাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদের সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সব কিছু ইসলামের বাহিরে অবস্থিত। ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সাফীরাও তাদের বাহিরে না। তারাও একই গ্রুপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। **আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের** স্কলাররা তাদের এই দেখানো পথ ও বিদআতকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ্‌র নিকট হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, এই ধরণের বিদআতমূলক কাজ আমরা সাহাবীদের মাঝে দেখতে পাই নি। অর্থাৎ তারা এই সকল কাজ করেন নি। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত মুসলিম বানাতে চায় অবশ্যই সালফে সালেহীনদের দেখানো পথকে অনুসরণ করার পাশাপাশি অন্যদের দেখানো তরীকতের পথ পরিহার করতে হবে। তারা মানুষের ইমানকে চুরি করে। তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের ঈমান ও ধর্মের প্রতি ভালবাসাকে ধবংস করে দিচ্ছে। তারা তাদের অন্তরের মধ্যে এক ধরণের বিষয় এমনভাবে গেঁথে নিয়েছে যা থেকে তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই পরিত্রাণ করতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে ইসলামের মধ্যে কাশফ কারামতের কোন স্থান নেই। অবিশ্বাসীরা তাদের মত এই ধরণের কাজ

করে থাকে। মানুষকে অবশ্যই সত্য থেকে মিথ্যার পার্থক্য করার মত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। একজন মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও দুনিয়ার প্রতি মায়া মহব্বত কখনো একসাথে হতে পারে না। দুনিয়াবী ছোট কোন বিষয়কে ইসলামের সাথে তুলনা করা কোনভাবে মুসলিমের পক্ষে শোভা পায় না। অর্থাৎ দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য ছোট কোন বিষয়কে ইসলামের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। বুখারা শহরের স্কলার ও শায়েখরা সবসময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতেন। তারা দুনিয়াবী ভোগ বিলাসে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেন নি। খাবারের জন্য কোথায় একসাথে হওয়া কিংবা দুনিয়াবী কোন স্বার্থে মানুষদেরকে একসাথে করা এটা এক প্রকারের অজ্ঞতার শামিল। ঐ সমস্ত বিজ্ঞ আলেমরা এ ধরণের কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছেন। তারা ঐ সকল খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন যা সালফে সালেহীন ও রাসুল করেছেন অর্থাৎ ইসলামে যার অনুমতি প্রদান করেছেন সে সকল পদ্ধতিতে খাবার কিংবা দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করেছেন । তারা সকল বিষয়ে **আজমতকে** অনুসরণ করেছেন। তারা বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে সকল কাজ হারাম কিংবা মাকরুহ পন্থায় সম্পাদিত হয়েছে তারা সেগুলোকে পরিহার করেছেন । যখন কোন মুবাহ কাজের মাধ্যমে হাতাম হওয়ার আশংকা থাকে তারা তাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। **যিকিরে খাফী** (গোপনে ঝিকির) করা **যিকিরে জাহেরী** (প্রকাশ্যে যিকির) থেকে উত্তম। এই ধরণের লোকেরা যিকিরে খাফী করে। তারা ইহসানের মাধ্যমে যাবতীয় আমল সম্পাদন করে যে সম্পর্কে হাদিসে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অন্তর সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যাকুল থাকে। যদি কোন সুফী ব্যক্তির অন্তর, যাবতীয় আমল ও বিশ্বাস ভালোবাসা সব কিছু তার জন্য হয়ে থাকে ও তার অন্তর একনিষ্ঠ তার সাথে তার দিকে ঝুকে থাকে তাহলে তার অন্তরে আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ তখন বুঝা যাবে যে, সে প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি।যাকে **মুসাহাবা** বলা হয়। আর জাযবার মাধ্যমে যা করা হয় তাকে **ওয়ারিদাত** বলা হয়। ওয়ারিদাতের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় স্থানে নুর জলতে থাকে। ফায়েজ কিংবা দর্শন পূজারী তার মুরশিদের অন্তর থেকে অর্জন করে থাকে। যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালাকে সে তার অন্তরের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। তার শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্নত ও আজমতের সহিত আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকে। এই সকল কাজের মাধ্যমে কতই না শান্তি পাওয়া যায়। হে প্রতিপালক, তোমার প্রিয় রাসুল ও ওলামা মাশায়েখের

(যারা তোমার রাসুলের সঠিক ভাবে আনুগত্য করে) দয়া ও করুণার বদৌলতে এই কঠিন কাজকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও যাতে করে প্রতিদিন আমরা তা সম্পাদন করতে পারি। ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী মানুষদেরকে নিয়ে প্রতিদিন একই নিয়মে ফায়েজ করতেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত **ইন্দলেস ব্লিস** নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা

জীবিত ও মৃত সকল কিছুই একটা নিয়মানুযায়ী শৃঙ্খলার মধ্য থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে তা আমরা স্বীকার করি। এই পৃথিবীতে সকল প্রকার পদার্থ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একটা অপরিবর্তনীয় বিন্যাস ও কিছু গানিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে তা আমরা বুঝে নিয়েছি। অর্থাৎ সবকিছু একটা নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। আমরা এই বিন্যাসকে কয়েকভাবে ভাগ করেছি যা আবার একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। যেমন, পদার্থ, রসায়ণ, জোতির্বিদ্যা ও জীববিদ্যা ইত্যাদি। আর এই সকল অপরিবর্তনীয় বস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের শিল্প কারখানার উন্নতি, বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ উৎপাদন, চাঁদে ভ্রমণ এমন কি তারকা থেকে শুরু করে গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক মতো বস্তু তৈরি করেছি। এর অর্থ এই নয় যে, সকল কিছু এলোমেলো অবস্থায় বিরাজমান। এমনকি এগুলোকে আমরাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না। বরং এগুলো একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। যদি তারা একটির থেকে অন্যটি পৃথক হয়ে যায় তাহলে তা ধবংস হয়ে যাবে। আর এ সকল কিছুর অস্তিত্ব একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই সকল বস্তু ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিক সংঘবদ্ধভাবে একটিকে অন্যটির অনুকরণ, অনুসরণ ও তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে যে, এগুলো কোন অঘটন কিংবা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে নি। এর পিছনে কোন চালিকা শক্তি আছে যে সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ যা কিছু দেখা ও শুনা হয় সকল কিছু এমন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সে তার নিজের ইচ্ছাও আকাঙ্খার আলোকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করে থাকেন তার পিছনে কোন না কোন কারণ বা অর্থ বিদ্যমান আছে। অনর্থক কোন কিছু তিনি সৃষ্টি করেন না। আর যিনি এই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন তার অস্তিত্ব প্রকাশ করার কোন চিহ্ন বা প্রমান বিদ্যমান নেই। তর্কাতর্কিতে সভ্যতা কিংবা বিজ্ঞানের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি এ সকল বস্তু সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে সেভাবে উল্লেখ না করলেও বান্দার প্রতি তার দয়া, ভালোবাসা, রহমত ও ক্ষমা ইত্যাদিকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে

পারলে তার বিশালত্ব ও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই তিনি প্রত্যেক জাতি কিংবা গোত্রের নিকট তার এক পছন্দনীয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। তার কাছে তাদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, নাম, রহমত, দয়া ও তার যাবতীয় গুণাবলী এমন কি দুনিয়াতে মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে, কোন কাজ তাদের জন্য মঙ্গলকর ও কল্যাণকর এবং কোন কাজ করলে তারা দুনিয়াতে সুখে- শান্তিতে বসবাস করতে পারবে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এই সকল কিছু তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তার আলোকে তিনি তার গোত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এই পছন্দনীয় সর্বোত্তম ব্যক্তিকে **রাসুল** বলা হয়। আর যে সকল আদেশ কিংবা নিষেধের মাধ্যমে মানুষদেরকে পরিচালিত করে থাকেন তার নাম হল **দ্বীন** বা **আহকামে দীনিয়্যাহ** (ধর্মীয় নিয়ম কানন)। কেননা মানুষের ফিতরাত হল অতীতকে ভুলে যাওয়া । মানুষদের মধ্যে শয়তানের প্ররোচনায় দুষ্ট লোকেরা রাসুল কর্তৃক আনীত কিতাবকে বিকৃত করে উপস্থাপন এবং পূর্ববর্তী দ্বীন বা ধর্মকে ভুলে যায়। খারাপ মন মানসিকতার লোকদের মাধ্যমে ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা কতইনা নিকৃষ্টতম কাজ। কারণ মহান আল্লাহ্ তায়ালা সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, বিশেষ করে মানব জাতির নিকট নতুন ধর্ম নিয়ে রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে তিনি সকল কিছু থেকে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তিনি তাদেরকে এই বলে সুসংবাদ দিয়েছেন যে পৃথিবী ধবংস হওয়া পর্যন্ত এবং মানুষরূপী শয়তানদের দ্বীন ধবংসকারী যাবতীয় কার্যক্রম ও নানাবিধ সমস্যাবলী থেকে তিনি এই দ্বীনকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের উচিৎ মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করা কেননা শিশু অবস্থায় আমরা আমাদের সৃষ্টি কর্তার নাম আল্লাহ্ তায়ালা ও তার একান্ত প্রিয় বান্দা রাসুলকে আমাদের নিকট সর্বশেষ রাসুল হিসেবে প্রেরণও **ইসলামকে** আমাদের ধর্ম হিসেবে কবুল করেছেন। যাহা আমরা শিশু থাকা অবস্থায় মুখস্ত করেছি কিন্তু তার অস্তিত্ব বুঝতে পারি নাই। আজ আমরা যে দিকে তাকাই শুধুই তার দয়া ও রহমত ব্যতীত কিছুই দেখতে পাই না। তাই আমাদের উচিৎ ইসলাম ধর্মকে ভাল করে অর্জন করা। আর এটি আমাদেরকে স্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করতে হবে। কিন্তু দুঃখের সাথে দেখতে হচ্ছে যে, আমাদের যুবক ভাইয়েরা ইসলাম শিক্ষার পরিবর্তেতে তারা আজ কমিউনিস্ট ও নাস্তিক্যবাদের দেখানো পথকে অনুসরণ ও তাদের দেয়া মতামতকে সর্বশ্রেষ্ঠ মত হিসেবে গ্রহণ করছে । এবং সে অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালিত করছে। এরা ব্যতীত ওহাবীরাও (যারা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে

অনুসরণ করে না) বিভিন্ন প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদরা পর্দার আড়াল থেকে এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে যে তাদের প্রভাবে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থের আশায় তাদের ঈমান বিক্রি করে দিচ্ছে । পরবর্তীতে তাদের এই পথ থেকে বাহির হওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ বা করুনা ব্যতীত তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনেক রহম ও দয়াশীল যাহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের স্কলারবৃন্দ তাদের কিতাবসমুহের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই ধরণের বিজ্ঞানীদেরকে **মিথ্যুক বিজ্ঞানী** ও কুরআন অনুবাদকারীকে ধর্মের মধ্যে **ভণ্ড আলেম** বলে আখ্যায়িত করি, যারা নিজেরদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলাম ধর্মকে তার স্থান থেকে অন্যত্র বিকৃত সাধন করে থাকে। আমরা আমাদের অন্তর স্থল থেকে এই জাতীয় মানুষদেরকে ঘৃনা করি। আমরা আল্লাহ্র নিকট বিকৃত কারীদের থেকে সতর্কতামূলক অবস্থান ও সত্যিকারে ইসলামের জন্য যারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে (আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত) তাদের পথ অনুসরণ করতে পারি তার নিকট সেই প্রার্থনা করব। তাহলে আমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব। আমরা তখন বুঝতে পারব যে আমাদের অন্তর এক ধরণের ভয়ানক বিষ দ্বারা সংপৃক্ত হয়ে আছে। কেননা আমরা জ্ঞানকে বাদ দিয়ে তাদের দেখানো চমকপ্রদ আলোতে নিজেরদেরকে অন্ধকারে বিলিয়ে দিয়েছি। কারণ আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লিখিত বইয়ের অনুসরণ করি নাই। যার ফলে বন্ধু ও শত্রুর মাঝে পার্থক্য করতে আমরা অক্ষম। আমরা আমাদের নফসের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও ধর্মের শত্রুদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে বা তাদেরকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে প্রতারিত করেছি। এমন কি সভ্যতাকে অনুসরণ কিংবা অনুকরণের নাম দিয়ে নিজেদেরকে ব্যাভিচার ও ধর্মহীনতার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি, যার থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারছি না। আমরা আমাদের মাতাপিতাদেরকে সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করার পাশাপাশি নিজেদের জীবনকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করব। রাসুল ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, **"তুমি তোমার ইসলাম বা ঈমানকে রিজালদের থেকে অর্জন কর"**। রিজাল হল ঐ সকল ব্যক্তি যারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে। যদি আমরা কোন রিজাল ব্যক্তিকে খুঁজে না পাই তাহলে তাদের লিখা

কিতাব কিংবা ইসলামী স্কলারদের থেকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করব। কোন মাযহাবকে অনুসরণ করে না, বিদআতকারী কিংবা মূর্খ এমন কোন ব্যক্তিদের লিখিত বই থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানা অবিশ্বাসীদের লিখা কোন বই থেকে শিক্ষা নেয়া সমান কথা। নন মুহরিমদের উপস্থিতিতে কোন মহিলা কিংবা নারী তার মাথা, চুল, বাহু কিংবা পা দর্শন করা বা পুরুষের নাভী থেকে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোন আওরাত বা গোপনাঙ্গ প্রকাশ করা হারাম। অন্যভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর আদেশ কিংবা নিষেধের সম্পর্কে বিস্তারিত চারটি মাযহাব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সামনে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার আওরাতকে অপর ব্যক্তির নিকট অবশ্যই লুকিয়ে রাখতে হবে। যাহা মাযহাবগুলোর মধ্যে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার গোপনাঙ্গ প্রকাশ করে তাহলে তার দিকে তাকানো কোন ব্যক্তির পক্ষে জায়েজ হবে না। **কিমিয়ায়ে সায়াদাত** নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, নারী কিংবা মহিলা শুধু তাদের মাথা, চুল বা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবৃত করলে চলবে না বরং তাদেরকে অবশ্যই টাইট জামা সেলোয়ার, পাতলা কাপড় পরিধান কিংবা নিজেকে জাঁকজমকভাবে উপস্থাপন করে বাহিরে যাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। যদি তাদের মাতাপিতা বা স্বামীরা তাদেরকে এ সকল কাজ থেকে বারণ না করে কিংবা তাদেরকে এ সকল কাজ করতে সহযোগিতা করে তাহলে তাদেরকেও পাপের একটা অংশ দেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন এর জন্য তাদেরকে কঠিন আযাব প্রদান করা হবে। অন্যভাবে বলা যায়, জাহান্নামে তাদেরকে এক সাথে নির্যাতন করা হবে। কিন্তু তারা যদি তাওবা করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে ও তাদেরকে নির্যাতন করা হবে না। আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে ভালবাসেন যারা গুনাহ করার পর তাওবা করেন। কোন মেয়ে যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখন তাকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। নন মুহরিম এমন কোন পুরুষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হিজরীর তৃতীয় সনে এই হুকুম আরোপিত হয়। ইদানীং কিছু কিছু স্কলাররা নারীদেরকে তাদের পুরো শরীর আবৃতকরাকে সেকেলে হিসেবে বলে থাকে আমাদেরকে এই ধরনের কোন ফতোয়া বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। এটি হচ্ছে মুলত ব্রিটিশ ও কিছু অশিক্ষিত লোকদের এক ধরণের ফাঁদ, যার মাধ্যমে তারা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে বাড়ির বাহিরে এনে ইসলাম ও মুসলিমদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রথাকে

পুরোপুরি ভাবে ধবংস করে দিতে চায়। তারা পর্দা না করাকে নারী জাতির স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু ইসলামে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর হিজাব বা পর্দা না করাকে কঠিনভাবে হারাম করেছে। আমরা বলে থাকি, যখন কোন বাচ্চা ছেলে আকিল বা বালেগ হয়, যখন সে ভাল কিংবা খারাপের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখে এমন কিসে বিয়ের বয়সে পোঁছে তাহলে তার উপর ঈমানের ছয়টি মৌলিক শাখা এবং **আহকামে ইসলামিয়্যাহ** গুলো শিক্ষা করা ফরজ হয়। অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে হালাল, হারাম ও ফরজ সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে তার আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। সাধারণত একজন মেয়ে নয় বছর ও একজন ছেলে বার বছর বয়সে বালিগ বা আকিল হয়। আর এই সময়ের মধ্যে তারা তাদের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যদেরকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান, আদেশ নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত শিক্ষা করা ফরয। অনুরুপভাবে যখন কোন মুরতাদ কিংবা অবিশ্বাসী পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে তাকেও সমান বিষয় অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে তাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিজ্ঞ কোন আলেম বা কোন বিখ্যাত মুফতির কাছে গিয়ে ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে তাদের লিখিত কিতাব পড়ার মাধ্যমে তা অর্জন করে নিবে। উভয় পক্ষের জন্য যার যার দায়িত্ব সম্পাদন করা ফরয। নতুন মুসলমান হওয়া কোন ব্যক্তি যেমন ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা ফরয, তেমনিভাবে যার কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তাকে ও ঐ ব্যক্তিকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেয়া ফরয করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষ যদি বলে ভাল হয়েছে কিন্তু তাকে শিক্ষা কিংবা ইসলামী বই প্রদানের মাধ্যমে কোন প্রকার সাহায্য বা সহযোগিতা করেনি তাহলে সে ফরজ অমান্য করার কারণে সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন ফরজ বিষয় পালনে অবাধ্য হল তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পুড়ানো হবে। অপরপক্ষে যে কিনা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে সে কোন ইসলামী আলেম কিংবা ইসলামী বই না পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য ওজর সাব্যস্ত হবে, কিন্তু ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ওজর কবুল করা হবে না। সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। ওজর হল এক ধরণের ওযুহাত যা কোন মুসলমান ব্যক্তিকে ইসলামের কোন আদেশ পালন কিংবা কোন হারাম বা নিষেধ কাজ করার জন্য সাময়িক অনুমতি প্রদান করেছে। অর্থাৎ ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের আদেশ বা নিষেধ থেকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে। এই সকল আদেশ বা নিষেধ পালনের

জন্য ইসলামই হুকুম প্রদান করেছে। আবার কোন কোন ওজর বা সমস্যার কারণে ইসলাম তা পালন করা থেকে সাময়িক অব্যহতি দিয়েছে। যাকে ইসলামের পরিভাষায় ওজর বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই ইসলামের যাবতীয় আদেশ বা নিষেধ যেমনিভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের স্কলার কর্তৃক লিখিত কোন বই থেকে শিখতে হবে, তেমনিভাবে ইসলামের আদেশ বা নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে ওজর থাকলে তাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বই থেকে অর্জন করতে হবে। হাকীকত কিতাব নামে তুরস্কের ইস্তানবুলে অবস্থিত গ্রন্থাগর, যেখানে ইসলামের সকল বিষয়ের সকল বিভাগের বই পাওয়া যায়। যাহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক লিখত ও পরিচালিত হয়। যেখানে বর্তমান সময়ে ইসলাম সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন ভাষায় সকল বিভাগে সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পাওয়া যায়। তরুন প্রজন্মকে ইসলামের সঠিক আদর্শ বা জ্ঞান শিক্ষা দানের উদ্দেশে পৃথিবীব্যাপী সকল স্থানে আমরা বিভিন্নভাবে আলেম কিংবা ইসলামী কিতাব সরবরাহের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে ইসলামের অনুসরণ করার কার্যক্রম পরিচালনা করছি। যাতে করে তারা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সুখ শান্তি ভোগ করতে পারে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ ও সরবরাহের মাধ্যমে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। যেকোন ধরণের ইচ্ছা বা আকাঙ্খা অর্জনের জন্য আমাদের **সালাতু-নজিনা** পাঠ করা উচিত। তাহলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদীনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা-আলী সায়্যিদিনা মহাম্মাদিন সালাতান তুঞ্জী নাবীহা মিনজামীউল- আহওয়াল ওয়াল আফাত ওয়া তাকদীলা নাবিহা জামীউল হাজাত ওয়া তুতাহহিরুনা ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহামিন জামীউস সাইয়্যেঅ্যাত ওয়া তারফাউনা বিহা আলাদ দারাজাত ওয়া তুবাল্লিগু নাবিহা আকসাল- গায়া তমিনজামি উল খায় রাতি ফিল হায়াতি-ওয়া বাদাল মামাত। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন কঠিন বিপদ, শত্রুর ভয় কিংবা এ জাতীয় কোন সমস্যা থেকে নিজেকে প্রতিরক্ষার জন্য উল্লেখিত দোয়াটি ইস্তেগফার হিসেবে পাঠ করে আল্লাহ্‌ তায়ালাতাকে ঐ কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি দিবে। **আমি জন্ম নিয়েছি কিন্তু বাতাসের গতির মত অতিক্রম হয়ে গিয়েছে আমার এই জীবন। আমার কাছে এটি শুধুমাত্র চোখের ফলক ছাড়া আর কিছুই নয়। হক সাক্ষী বহন করছে যা শরীরের মধ্যে বাস করছে আর তা হল অন্তর। আর এমন একদিন আসবে যেদিন আমি খাঁচা থেকে পাখির মত করে উড়াল দিব।**

একশ তেইশতম চিঠি

এ পত্রটি তাহির বাদশাহকে হযরত ইমাম রাব্বানী (রাঃ) লিখেছেন। তিনি বলেন, নফল হজ পালনে কোন উপকার আসবে না যদি ইহা পালন করার সময় অন্যান্য ফরয ইবাদত ছুটে যায় ।

হে আমার বিজ্ঞ ভ্রাতা, এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি মোল্লা তাহিরের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। যিনি তার নিজের নামের মত পূত পবিত্র। আমার স্নেহের ভাই, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়ে, **"আল্লাহ্‌ তায়ালা তার ঐ বান্দাকে অপছন্দ করেন যে কিনা অনর্থক সময় নষ্ট করে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় নিজেকে অমনোযোগী রাখে "**। কোন ফরয ইবাদতকে বাদ দিয়ে নফল ইবাদত করার অর্থ হল অনর্থ সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে আমরা আমাদের সময়গুলো কোথায় ব্যয় করছি। আমাদেরকে এটাও জানা উচিত আমরা কিসের সাথে ব্যস্ত সময় পার করছি। অর্থাৎ আমরা ফরয না কি নফল ইবাদত করছি ? তা আমাদেরকে ভাল করে জানা উচিত। নফল হজ পালন করার সময় অনেক ধরণের হারাম কিংবা পাপ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে যা তোমাকে ভাল করে জানতে হবে। ক্ষুদ্র কোন ইঙ্গিত একজন মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। সালাম তোমার ও তোমার বন্ধুদের প্রতি। উল্লেখিত হাদিস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করার সময় তাদের সাথে সুন্নতগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। আর ফযরের নামায ছুটে গেলে তার ক্বাযা আদায় করার সময় সুন্নতসহ নিয়্যত সহকারে আদায় করতে হবে।

একশ চব্বিশতম চিঠি

এই পত্রটিও তাহির বাদশাহকে লেখা হয়। হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাতায়াতের খরচ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক । অন্যান্য ইবাদত বাদ দিয়ে অর্থ ছাড়া হজ করতে যাওয়া হল অনর্থক সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উল্লেখিত চিঠির বিস্তারিত নিম্নে আলোকপাত করা হল ।

এ গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি আমার ভাই খাজা মুহাম্মদ তাহির বাদশাহকে পাঠানো হয়েছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সে মনিব মহান আল্লাহ্‌র নিকট গরীবের প্রতি যার ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ অফুরন্ত অপরিসীম। মানুষের মৃত্যুর যখন সময় হয়ে যাবে তখন কেউ তাকে জড়িয়ে রাখতে পারবে না । অর্থাৎ সময় হলে অবশ্যই তাকে এ পৃথিবীর মায়া মহব্বত ছেড়ে চলে যেতে হবে । তোমার এ অগ্রগতির অবস্থা তোমাকে অনেক আনন্দ দিবে। হে আমার ভাই, কে আমাদেরকে ভালবাসে! তুমি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছো ও আমাদের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছো। আমরা তোমার সহকর্মী হওয়ার কারণে রহমতের কিছু অংশের সাথে শরীক হওয়ার জন্য তোমার পথে আমাদের যোগ দেয়া উচিৎ বলে চিন্তা করছি। যা হোক, ইস্তেখারা করার পর তার থেকে আমরা কোন সবুজ সংকেত পাইনি। যদিও তা চূড়ান্ত ফলাফল ছিল না তার পরেও তোমার এ ভ্রমণ অনুমোদন যোগ্য। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। তোমার এ ভ্রমণ অনুমোদন যোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি প্রবল উদ্যমের সাথে পালন করতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ না কর। আর এই ভ্রমনের জন্য শর্ত হল পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বিদ্যমান থাকা। কোন ব্যক্তি যদি এ শর্ত পরিপূর্ণ করতে না পারে তাহলে সে তার হজ যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। হজ করতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ মওজুদ থাকা। অন্যভাবে বলা যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য হজ ফরয হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে হজ গমনে যাবতীয় খরচের টাকা বিদ্যমান থাকা। অন্যথায় তার উপর হজ ফরয হবে না। কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকার পরে সে যদি হজ গমন করে তাহলে সে নফল হজ আদায় করে নিবে। কারণ তার উপর হজ পালন করা ফরয ছিল না। অনুরূপভাবে ওমরা পালন

করাও কোন ফরয কিংবা ওয়াজিব ইবাদত নয়। এটা হল নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে একটি। যখন কোন ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফল ইবাদত করা হয় তখন সেখানে অনেক ধরণের হারাম কাজ সম্পাদিত হয়। যেমন, সময় নষ্টের পাশাপাশি প্রচুর অর্থ সম্পদও অপচয় হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল ফরয ইবাদতের উপর নফলকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কোনভাবে বৈধ নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত উনত্রিশতম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামে ফরয নয় এমন কোন ইবাদতকে অন্য কোন ফরয ইবাদতের স্থানে তাকে অবজ্ঞা করে পালন করা কোনভাবে ঠিক হবে না। এ সকল বিষয় আমি নিজেই তোমার নিকট লিখেছি। এই চিঠি তুমি তাদের থেকে গ্রহণ করেছো মাত্র। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। তুমি বুঝতে পারছো যে দায়িত্ব বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে। ওয়াস সালাম।